রামমোহন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের গুপ্ত রচনা সমেত

রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের ধর্ম দূষণ

রামমোহন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের গুপ্ত রচনা সমেত

রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

Unish Shataker Dharma Dushan
Rammohan Theke Swami Vivekananda
By Rudrapratap Chattopadhyaya

প্রকাশক ঃ
গীতিকা মাইতি
তুহিনা প্রকাশনী, ৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬

অক্ষর বিন্যাস ঃ লেখক

প্রকাশকাল ঃ কলকাতা বইমেলা, ২০১৪

মুদ্রক ঃ
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং, ২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান ঃ

তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

দে বুক স্টোর, ১৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০৭৩

বাংলাদেশের পুস্তকালয়রা বইয়ের জন্য খোঁজ করবেন
'বুক সেন্টার', ৭৬, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২

মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা (দুইশত টাকা মাত্র)

উৎসর্গ

দেবজ্যোতি রায়ের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভের হাতে বাঙ্গলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে ভারতে মধ্যযুগের অবসান হয়, ইউরোপীয় সভ্যতার আলোর কিরণে দীপ্ত হতে শুরু করে ভারতের আকাশ। পরিবর্তিত এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সারা দেশ জুড়ে নানা হিন্দু সাধুসন্তের আবির্ভাব ঘটে। অন্যদিকে কিছু চিন্তক চিন্তা করতে থাকেন প্রতিমাপূজাভিত্তিক হিন্দুধর্মই ভারতের কয়েক শো বছরের পরাধীনতার কারণ কিনা। কারণ, তাঁরা দেখছিলেন, খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপীয়রা বিশ্বের এক বিশাল অংশ দখল করে বসেছে।

যে সব চিন্তক প্রতিমাপূজাকে হীন ধারণা করেছিলেন তাঁরা অবশ্যই ইতিহাস-অচেতন। কারণ, মুগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে মারাঠারাই ছিলেন ভারতের নিয়ামক শক্তি। এই মারাঠারা ছিলেন ঘোর প্রতিমাপূজক। সুতরাং, কোনও জাতির শক্তি কখনই তাদের আরাধ্য দেবতার উপর নির্ভরশীল নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা শ্রীরামপুরে তাঁদের কেন্দ্র স্থাপন করে ভারতের মানুষদের খ্রিষ্টান করার জন্য এক বিশাল কর্মকাণ্ড শুরু করে দেন। তাঁরা ভারতের সব মানুষের কাছে খ্রিষ্টধর্মের বাণী পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে একদিকে ছাপাখানা তৈরী করেন, অন্যদিকে বিভিন্ন ভাষার অক্ষর নির্মাণ করেন। কেরীর সহযোগী ওয়ার্ড ছিলেন দক্ষ ঢালাই মিস্ত্রী। অর্থের বিনিময়ে এই মিশনারীদের কর্মকাণ্ডে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন কিছু হিন্দু পণ্ডিত। এঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী রাম রাম বসু।

আবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের এদেশীয় ভাষা জানা অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনা করে তাদের ভাষা শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করা হয়। একাজেও এগিয়ে আসেন বেশ কিছু হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিত। এদের মধ্যে ছিলেন পূর্বোক্ত রাম রাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

দীর্ঘ মুসলিম শাসনকালে বেশ কিছু হিন্দু মুসলিম শাসকদের অধীনে কাজ করে নিজেদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি করেন। রামমোহন রায়ের পরিবার তেমনই একটি পরিবার। ১৭৭৪

খ্রিষ্টাব্দে জন্ম হওয়া রামমোহন রায় তৎকালীন রীতি অনুযায়ী ফার্সী ও সংস্কৃত অধ্যায়ন করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক ধুরন্ধর বিষয়ী মানুষ। ছোটখাটো জমিদারী কেনা ছাড়াও অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি তেজারতি ব্যবসাও করতেন। পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের সূত্রে তিনি কলকাতার জোড়াসাঁকোয় একটি ছোট বাড়ীর মালিক হন এবং কলকাতাতেই বাস করতে থাকেন। তাঁর নজর ছিল নতুন যুগের ইংরেজ রাজপুরুষদের উপর। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যাতাযাত করতেন। সেখানেই জন ডিগবী সমেত অন্যান্য রাজপুরুষদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় এবং এইসব রাজপুরুষদের দেওয়ানীর চাকরী তিনি হস্তগত করেন। তখনকার দিনে দেওয়ানীর চাকরী বা সেরেস্তাদারের চাকরী ছিল সোনার ডিম পাড়া হাঁসের মতো। যেহেতু ইংরেজ রাজপুরুষরা দেশের লোকের ভাষা বুঝতো না, সমস্ত ক্ষমতা ছিল দেওয়ান ও সেরেস্তাদারের। এই সুযোগে তাঁরা বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করতেন। তবে রামমোহন শুধু অর্থ উপার্জ্জন করেন নি; ইংরেজদের সঙ্গে মিশে তিনি সমাজ, রাজনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি ইংরেজসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীও অর্জন করেন। তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টি পরিবর্তনের মূলে ছিল কেরী সাহেবের মুন্সি রাম রাম বসু। তিনি খ্রিষ্টধর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ না করলেও মনেপ্রাণে খ্রিষ্টান ছিলেন। তিনিই 'পৌত্তলিকতা' শব্দটি বাঙ্গলা ভাষায় প্রবিষ্ট করেন এবং ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে 'পৌত্তলিকতার' বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এইসব পড়ে রামমোহনের মনে এই 'পৌত্তলিকতা' বিদ্বেষ বেশ দৃঢ় হয়ে বসেছিল। প্রতিমাপূজা বিরোধিতার উৎস ইহুদী পয়গম্বর মোজেসকে প্রদত্ত সেমীয় বিধাতা যিহোভার দশটি প্রত্যাদেশ। তার মধ্যে ছিল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে আছে এমন কিছুর প্রতীক প্রতিকৃতি তারা নির্মাণ করবে না, তাদের পূজা করবে না। প্রত্যাদেশ মানলে যিহোভার 'আপনজন' ইহুদীদের জন্য বরাদ্দ 'প্রতিশ্রুতভূমি' কানান প্রদেশ—যা দুধ ও মধুতে ভরা। তবে কানান প্রদেশ দখল করতে হবে 'তরবারীর তীক্ষ্ণতায়'। সুতরাং সেমীয় প্রতিমাপূজা বিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত জমি দখলের রাজনীতি।

'পৌত্তলিকতাবিদ্বেষ' গ্রহণ করলেও রামমোহন কিন্তু বাইবেলের সবকিছু গ্রহণ করলেন না;বিশেষ করে একেশ্বর যিহোভা। তিনি একেশ্বরকে আবিষ্কার করলেন উপনিষদের নির্গুণ ব্রহ্মের মধ্যে;নির্গুণ ব্রহ্ম নিরাকার। কিন্তু যে ব্রহ্ম নিরাকার সেই ব্রহ্ম বিকারহীন,অনন্ত ও অচিন্ত্যও বটে। সুতরাং তিনি সৃষ্টিকর্তা হতে পারেন না। সৃষ্টিকর্তা সগুণ ব্রহ্ম। আবার এই সগুণ ব্রহ্ম প্রয়োজনে রূপ ধারণ করতে পারেন। সুতরাং, তিনি নিরাকার নন। এইভাবে ব্রহ্মের একটা জগাখিচুড়ি তত্ত্ব বানালেন তিনি। তাঁর মোসায়েবরা সেই ব্রহ্মতত্ত্ব মেনেও নিলেন। কিন্তু রামমোহন কোনও পৃথক ধর্মীয় সম্প্রদায় নির্মাণ করেন নি। তিনি একজন ব্রাহ্মণ হিসাবেই জীবন-যাপন করেছিলেন।

রামমোহনের বন্ধুপুত্র দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর জুতার মধ্যেই পা গলালেন। তিনিও গ্রহণ করলেন বাইবেল-ভিত্তিক একেশ্বরবাদ। তিনি একটি দ্বৈতবাদী ধর্মতত্ত্ব সৃষ্টি করলেন উপনিষদের বিভিন্ন তত্ত্ব খেয়াল-খুশি অনুযায়ী গ্রহণ-বর্জন করে। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের লক্ষ্যের মধ্যে রইল কিছু সমাজ-সংস্কারও। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কোনও বিপ্লবী সংস্কারক ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যের পদে বৈদ্যনন্দন কেশবচন্দ্রকে বৃত করলেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ বরদাস্ত করতে পারেন নি। কিন্তু কেশবচন্দ্র শুধু যে ব্যাপক সংস্কারে বিশ্বাস করতেন তাই নয়, তিনি যিশুখ্রিষ্টের এক নিষ্ঠ পূজারী ছিলেন। যদিও তাঁর যিশু ঠিক বাইবেলের যিশু নয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ খ্রিষ্টধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন এবং মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার করতেন।

দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের ফলে একসময় দুজন পৃথক হয়ে গেলেন এবং কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের। কেশবচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্বে বিভিন্ন ধর্মকে স্বীকৃতি দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, সব ধর্মের মধ্যেই সত্য আছে। অবশ্য 'সত্য'টা যে কি তা তিনি পরিষ্কার করে বললেন না। সেমীয় ধর্মের মধ্যে 'সত্য' দর্শন এক ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ সৃষ্টি হওয়ার ফলে কেশবচন্দ্র একরকম একঘরেই হয়ে য়ান। তাঁর সমর্থক সংখ্যা ছিল নগণ্য। এই অবস্থায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকেই আঁকড়ে ধরেন। এই সময় তিনি 'নববিধান' নাম দিয়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের যে মতবাদ প্রচার করেন কার্যত তা-ই শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা 'যত মত তত পথ' রূপে ঘোষিত হয়।

ব্যক্তিগত কারণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গঠিত হল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মতত্ত্ব ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের থেকে পৃথক নয়, কিন্তু নবগঠিত ব্রাহ্ম সমাজ ছিল ব্যাপক সংস্কারের পক্ষপাতী।

দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তঃসারহীন ব্রাহ্ম ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ব্রাহ্ম ধর্মের অসারত্ব বুঝতো না। তিনি ব্রাহ্ম দের বলতেন 'অরূপের থাক'। তাঁর 'লোকশিক্ষে' দেবার প্রচুর আগ্রহ ছিল। কলকাতায় এসে সমাজের বড় বড় মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করতেন। কেশবচন্দ্রকে দেখেই মনে তাঁর হয়েছিল, কেশবের ফাৎনা ডুবেছে। আসলে বৈষ্ণব পরিবারের কেশবচন্দ্র তাঁর চতুর্দশ পুরুষকে খ্রিষ্টধর্মের পুকুরে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তিনি গায়ে পড়ে আলাপ করেন। মূলত কেশবচন্দ্রের পত্রিকার দৌলতে তাঁর কথা শিক্ষিত মানুষরা জানতে পারেন। ফলে দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে দেখার জন্য ভিড় হতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য হলো ঈশ্বর দর্শন করা। কিন্তু হিন্দুধর্ম সংসারী হিন্দুদের চতুরাশ্রম পালনের কথা বলে। হিন্দুধর্ম মানে ন্যায়, ত্যাগ, ব্রহ্ম চর্য্য। ঈশ্বরলাভের চিন্তা পরে। আর, বৈরাগী মানুষের জন্য মোক্ষলাভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি ধর্মের মধ্যে পার্থক্য বুঝতেন না। সব ধর্মের মানুষদের ঈশ্বর দর্শন করিয়ে ছাড়তেন। যদিও ঈশ্বর দর্শন সব ধর্মের লক্ষ্য নয়। শুধুমাত্র জল দিয়ে তিনি পৃথিবীর তাবৎ ধর্মতত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন;সবকিছু জলবৎ তরল। হিন্দুধর্ম যা ইসলাম ধর্ম বা খ্রিষ্টধর্মও তাই। এইভাবে তিনি কোনও শাস্ত্র না পড়েই ধ্বংসাত্মক 'যত মত তত পথ' প্রচার করে হিন্দুধর্ম দূষণ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত হলেও পরবর্তীকালের ব্যাপক প্রচারের ফলে মানুষ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যুবক সদস্য নরেন্দ্রনাথ দত্তকেই তাঁর প্রধান শিষ্যরূপে গণ্য করেন। নরেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ নাম পরিগ্রহণ করেন এবং একজন হিন্দু সন্ন্যাসীরূপে অংশগ্রহণ করেন চিকাগো বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে। তিনি ছিলেন সুপুরুষ, সুবক্তা; ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল ভাষণ দিতে পারতেন। ভালো বিতর্কবাগীশও ছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হলেও অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে বরাবরই আগ্রহী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। প্রতিটি জীবের মধ্যেই ব্রহ্ম আছেন—বেদান্তের এই বাণীই তিনি জীবনে প্রচার করে গেছেন সর্বত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনিও বহুসময় সেই ভালোবাসায় সাড়া দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গেরুয়া বস্ত্র দান করেছিলেন। কিন্তু তিনি সারাজীবন দোলাচলে ছিলেন সন্ন্যাস জীবন নিয়ে। পরিব্রাজক হয়ে গাজীপুরে গিয়ে পওয়ারী বাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য ধন্না দিয়েছিলেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের করুণ মুখ মনে পড়ে যাওয়ায় বিরতহন।

ধর্মীয় চেতনার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী। তিনি ছিলেন প্রবল খ্রিষ্টভক্ত। তবে অবশ্যই তাঁর খ্রিষ্ট বাইবেলের খ্রিষ্ট নয়। তাঁর কল্পিত খ্রিষ্ট। স্যালভেশন আর্মি, সোসাইটি অফ্ জেসাস প্রভৃতি মৌলবাদী মিশনারী সংস্থার পূজারী ছিলেন তিনি। আবার এই খ্রিষ্টভক্তিই ছিল বিদেশে তাঁর সাফল্যের চাবিকাটি। যিশুর প্রতি ভক্তি দেখিয়েই তিনি বিদেশের গীর্জায় গীর্জায় অবাধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছিলেন। মিশনারীরা ভাবতো, যিশুভক্ত একদিন না একদিন অবশ্যই যিশুর স্মরণ নেবেন। তিনি ধর্মমহাসভায় একবারও মিশনারী বিরোধিতা করেন নি। কিন্তু ভারতের অপর একজন হিন্দু প্রতিনিধি নরসিংহাচার্য ভারতে মিশনারী কার্য কলাপের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন।

শুধু বিবেকানন্দ নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক সন্ন্যাসী শিষ্যও তাঁর অবতারত্ব সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় ছিলেন না। কিন্তু বিদেশে বসে বিবেকানন্দ স্থির করলেন শ্রীরামকৃষ্ণকেই সেকুলার অবতার করে ছাড়বেন তাঁর কুৎসিত 'যত মত তত পথ' সমেত। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে রামকৃষ্ণানন্দের কাছে লেখা চিঠিতে (উদ্বোধনের বিবেকানন্দে রচনাবলী ২৪৯ নং চিঠি) তিনি সেইমতো নির্দেশ দেন এবং তুষ্টিপত্র দেন, অক্ষয় চন্দ্র সেনের 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' ই আদর্শ রামকৃষ্ণ জীবনী। ঐ কুৎসিত রামকৃষ্ণ জীবনীতে বর্ণনা করা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব কুকুর হয়ে নদীতে ভেসে যাওয়া মরা গরু আহার করেন!

একটা নিরঙ্কুশবাদী মানসিকতাও প্রদর্শন করেন তিনি। অন্য অবতারদের নাকচ করেন 'কেষ্ট-বিষ্টু' বলে তাচ্ছিল্য করে। নির্দেশ দেন শ্রীরামকৃষ্ণই একমাত্র অবতাররূপে পূজিত হবেন। এর দ্বারা তিনি তাঁর অনুগামীদের পরম্পরাগত হিন্দুধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেন। বিবেকানন্দের এই সব কার্যকলাপের ফলে বাঙ্গালীরা বিভ্রান্ত হয়ে 'যত মত তত পথ' এর আত্মধ্বংসী তত্ত্বে গ্রস্ত হয়ে পড়ে। ভুলে যায় তারা হিন্দু। হিন্দু গোষ্ঠীচেতনা থেকেদূরে গিয়ে নিজেদের অহিন্দু বলে ঘোষণা করে তারা। হিন্দুরা মনে করতে থাকে, নিজেদের হিন্দু বলাটা সাম্প্রদায়িকতা। ফলে হিন্দু বাঙ্গালীদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। হিন্দু নামধারী কিছু ক্রীতদাস ছাড়া নিজস্ব সংস্কৃতিযুক্ত একটি বাঙ্গালীও বঙ্গদেশে থাকবে না।এই সমূহ সর্বনাশে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান অস্বীকার করা যাবে না। যদিও ১৮৯৭ থেকে বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় কিছু কিছু পরিবর্তন আসছিল।

এই পুস্তক রচনায় রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের রচনা প্রচুর ব্যবহার করা হয়েছে। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। ব্যবহার করা হয়েছে 'কোরক' পত্রিকার শ্রীরামকৃষ্ণ সংখ্যাও। আলাপ আলোচনা ও অন্য নানা ব্যাপারে কৃতজ্ঞ সুমিত চক্রবর্তীর নিকট। বাঙ্গলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা দেবজ্যোতি রায় আমৃত্যু যুদ্ধ করে গেছেন 'যত মত তত পথ' এর বিরুদ্ধে। ভ্রাতৃপ্রতিম এই লড়াকু মানুষটির স্মরণে উৎসর্গ করা হলো এই পুস্তকটি।

নবপল্লী, বারাসাত — ইতি

জানুয়ারী ২০১৪ — রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

এক :

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের পটভূমি : ব্রাহ্ম হুজুগ

হিন্দুধর্মের ইতিহাসে ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ একটি অশুভ বছর। এই বছর কুলাঙ্গার একটি পুত্রের মাতা-পিতা হয়েছিলেন হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামের তারিণী দেবী ও রামকান্ত রায়। বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণের কাজ শিক্ষকতা, শাস্ত্র আলোচনা ও পূজাপাঠ। কিন্তু দীর্ঘ মুসলিম শাসনকালে দেখা গেছে উত্তর ভারতের বেশ কিছু ব্রাহ্মণ রাজভাষা ফার্সী শিখে মুসলিম রাজ দরবারে নানাবিধ চাকরী করেছে। রামকান্ত রায়ের পরিবার এমনই এক শাণ্ডিল্য গোত্রের ব্রাহ্মণ পরিবার। আর এই কুলাঙ্গার পুত্রের নাম রামমোহন।

রামকান্ত রায় অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিলেন; পুত্রের কালোচিত শিক্ষাও দিয়েছিলেন যাতে সে বৈষয়িক ক্রিয়াকর্ম ও রাজদ্বারে চাকরী করতে পারে। তখন মুগল আমল চলছে, যদিও পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশের দেওয়ানী লাভ করেছে, কিন্তু সরকারী ভাষা তখনও ছিল ফার্সী। সুতরাং রামমোহনকে ফার্সী ভাষা শেখানো হয়েছিল। একজন মানুষ নামজাদা হলে তাঁর নামে নানারকম গল্প তৈরী হয়। গল্প হচ্ছে রামমোহনকে আর্বী শিক্ষার জন্য পাটনা ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বারাণসীতে পাঠানো হয়েছিল।

ব্যাপারটা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন। তখন রেললাইন হয়নি। পাটনা-বারাণসী যেতে হলে নৌকা যোগে যেতে হতো। আর আর্বী শিক্ষার কানাকড়ি অর্থমূল্য ছিল না। একজন বিষয়ী লোক খামোকা আর্বী শেখানোর জন্য কেন ছেলেকে দূরদেশে পাঠাবেন? মুসলমানরা আর্বী শিখতো কুরআন-হাদিশ পড়ার জন্য। আর সংস্কৃত শিক্ষা বঙ্গদেশেই সম্ভব ছিল, বাস্তবে রামমোহন বঙ্গদেশে বসেই সংস্কৃত শিখেছিলেন। আর, আর্বী শিখেছিলেন অনেক পরে, কলকাতাতেই বসে।

রামকান্ত ছেলেদের ভালোই বিষয়কর্ম শিখিয়েছিলেন। রামমোহনও পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেন। কিন্তু ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দের পয়লা ডিসেম্বর রামকান্ত একটি দানপত্র করে নিজের জন্য কিছু সম্পত্তি রেখে বাকি সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দিলেন। এই

সম্পত্তি ভাগাভাগির ফলে অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে কলকাতার জোড়াসাঁকোর একটি ছোট বাড়িরও মালিকানা পেলেন রামমোহন। সম্পত্তি ভাগের ন মাসের মধ্যে রামমোহন কলকাতায় বাস করতে চলে যান। এই সময় থেকে রামমোহন তেজারতি ব্যবসাও শুরু করেন। ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক সাহেব অ্যান্ড্রু র‍্যামজেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা ধার দেন। এই সময় তিনি দুটি লাভজনক তালুকও কেনেন।

রামকান্ত ছেলেদের সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে নিজে বর্দ্ধমানের রাণী বিষ্ণুকুমারীর মোক্তারী করার জন্য বর্দ্ধমানে একটি ছোট বাড়িতে বাস করতেন। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিষ্ণুকুমারীর মৃত্যু হয়। ফলে বর্দ্ধমানে অবসান হয় রামকান্তের প্রভাব-প্রতিপত্তির। অন্যদিকে বিভিন্ন তালুক ও জমিদারী থেকে আশানুরূপ খাজনা না আদায় হওয়ার ফলে সরকারের ঘরে খাজনা বাকি পড়ে। খাজনা বাবদ বর্দ্ধমানের মহারাজাও রামকান্তের কাছে আশি হাজার টাকা পেতেন। এই সমস্ত ঋণ শোধ করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোম্পানী সরকার বাকী খাজনার দায়ে তাঁকে হুগলীর দেওয়ানী জেলে পোরে। এই টাকার কিছুটা রামকান্ত নিজে শোধ করলেন, বাকিটা তাঁর পুত্র ও জামীনদার জগমোহন নিজের কিছু সম্পত্তি বিক্রী করে শোধ দিলেন। ফলে ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে জেল থেকে মুক্তি পেলেন রামকান্ত। কিন্তু বর্দ্ধমানের রাজার প্রাপ্য টাকার জন্য তখনই আবার তাঁকে দেওয়ানী জেলে কারারুদ্ধ করা হলো। এইবারে রামকান্তকে প্রথমে হুগলী ও পরে বর্দ্ধমানের জেলে রাখা হয়। পরে বর্দ্ধমানের রাজাকে নগদ পাঁচশো টাকা ও বাকি টাকা কিস্তিবন্দী করে এগারো বৎসরে শোধ করার আশ্বাসে দলিল লিখে দিলে দেওয়ানী জেল থেকে মুক্ত হন তিনি। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে জগমোহনও গবর্ণমেন্টের ৪৩৫৮ টাকা খাজনা বাকি ফেললেন এবং তাঁকেও মেদিনীপুরের জেলে আবদ্ধরাখা হলো। এই জেল থেকে তিনি মুক্তি পেলেন ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে।

রায় পরিবারের এই ভাগ্যবিপর্যয় থেকে একমাত্র রামমোহনই মুক্ত ছিলেন। জগমোহন তাঁর দুরবস্থার কথা ধনী ভাইকে বার বার জানালেন। কিন্তু বিস্তর চিঠি চালাচালির পর রামমোহন মাত্র একহাজার টাকা সুদে ধার দিতে রাজী হলেন। রামমোহন তেজারতি ব্যবসা করতেন ঠিক আছে। কিন্তু তাবলে নিজের দাদাকে সুদে টাকা ধার দেওয়া? চিন্তা করতে কষ্ট হয়!

১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে রামমোহন "পাটনা, কাশী ও কলকাতা থেকে দূরবর্তী প্রদেশে" যাবার জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজীবলোচন রায়ের সঙ্গে নিজের সম্পত্তি বিলিব্যবস্থা করতে আরম্ভ করলেন। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি পুত্র রাধাপ্রসাদ জন্মাবার আগেই রামমোহন পশ্চিমে যাত্রা করলেন। এই যাত্রার উদ্দেশ্য চাকরী বা অন্য সূত্রে অর্থ উপার্জ্জন। যে র‍্যামজেকে তিনি বছর তিনেক আগে টাকা ধার দিয়েছিলেন, তিনি তখন ছিলেন কাশীতে। কিন্তু রামমোহন পরের বছরেই আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। এর পরে বছর দুই তিনি কলকাতাতেই ছিলেন বলে মনে হয়—কারণ অন্য কোথাও যাবার সংবাদ নেই। কয়েক বছর

পরে বড়লাটের কাছে লেখা এক দরখাস্তে রামমোহন লেখেন যে তাঁর বংশ ও শিক্ষা সম্বন্ধে সদর দেওয়ানী আদালত ও কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারীদের কাছ থেকে জানা যাবে। তাঁহাকে রংপুরের দেওয়ানীর সুপারিশ করবার সময় কালেক্টর ডিগবীও লেখেন (৩১ শে জানুয়ারী ১৮১০) যে, সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান কাজী ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ফার্সী মুন্সি রামমোহন রায়ের চরিত্র ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারবেন।

এই জন ডিগবী সিবিলিয়ান হিসাবে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে এ দেশে আসেন এবং নিয়ম অনুযায়ী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এই দেশের ভাষা শিক্ষা করেন। ঐ সময়, সম্ভবত ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তখন রামমোহনের বয়স সাতাশ। এবং ঐ আলাপ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চত্বরেই ঘটেছিল, এবং সেখানেই তাঁর সঙ্গে রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারেরও আলাপ হয়।

এই সময় থেকেই রামমোহন কলকাতার মৌলভীদের কাছে আর্বী ভাষা শিক্ষা করেন এবং হিন্দুদের মধ্যে প্রথম কুরআন পড়েন। কারণ, ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'অ্যান অ্যাপিল টু দ্য খ্রিষ্টিয়ান পাবলিক' পুস্তকের ভূমিকাতে তিনি নিজে বেনামে লিখেছেন, "ব্রাহ্মণ রূপে জন্মগ্রহণ করলেও রামমোহন রায় অতি অল্প বয়সে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেছিলেন, সেই সময়েই আর্বী ও ফার্সী ভাষায় লিখেছিলেন ঐ প্রথার বিরুদ্ধে।" এই আর্বী ও ফার্সী ভাষার বই '*তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীন*' ছাড়া অন্য কিছু নয়, এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৩-৪ খ্রিষ্টাব্দে। তখনকার দিনে রেওয়াজ ছিল ফার্সী বইয়ের নাম আর্বীতে লেখা।

ওদিকে বর্দ্ধমানে এই সময় ১২১০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে (মে-জুন ১৮০৩) আর্থিক দুশ্চিন্তা ও দুর্দ্দশার মধ্যে রামকান্ত রায়ের জীবনাবসান হলো। মৃত্যুশয্যায় শুধুমাত্র রামলোচন রায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আর জগমোহন ছিলেন জেলে। রামমোহন সম্ভবত কলকাতায় বা, জালালপুর থেকে কলকাতার পথে। রামকান্তের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করা নিয়ে রামমোহনের সঙ্গে বাকী সবার একটা গণ্ডগোল হলো। রামমোহন নিজে কলকাতায় আলাদা করে শ্রাদ্ধ করলেন। তারিণী দেবী দৌহিত্রের অলঙ্কার বন্ধক রেখে লাঙ্গুলপাড়ার বাড়িতে শ্রাদ্ধের আয়োজন করলেন এবং সেই শ্রাদ্ধ করলেন রামলোচন রায়। জগমোহন জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে মেদিনীপুর জেলের মধ্যেই আর একটি শ্রাদ্ধ করলেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, তিন ভাইয়ের তিন ঠাঁই এ শ্রাদ্ধকরার জন্য রামমোহনের ধর্মচিন্তা মোটেই দায়ী নয়; রামমোহনের মনের মধ্যে ধর্ম নিয়ে যে চিন্তাই ঘুরপাক খাক না কেন, বাপের শ্রাদ্ধ তিনি বিধিমতেই করেছিলেন। সমস্যাটি অবশ্যই তাঁর স্বার্থপরতা; শ্রাদ্ধেতিনি মোটেই অন্য ভাইদের তুলনায় বেশী টাকা পয়সা খরচ করতে রাজী হন নি। অন্যদিকে রামকান্ত একটি পয়সাও রেখে যেতে পারেন নি। সম্পত্তির মধ্যে ছিল সাত-আট হাজার টাকা দামের একটি বাড়ি ও পঞ্চাশ যাট বিঘা নিষ্কর ও ব্রহ্মোত্তর জমি।

বাড়িটি বর্ধমানের মহারাজা ঋণের দায়ে দখল করে নিলেন আর ব্রহ্মোত্তর জমি রামকান্তের নির্দেশ অনুসারে তারিণী দেবী দেবসেবায় নিয়োগ করলেন।

পরিবারের এই দুরবস্থার সময় রামমোহনের অবস্থা বেশ ভালো। ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে লাঙ্গুলপাড়ায় একটি জমিদারী কিনতে দেখি। সুতরাং রামমোহন একজন স্বার্থপর নীচ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলে সিদ্ধান্ত নিলে খুব অসঙ্গত হয় না।

জন ডিগবী ও রামমোহন রায়

রামমোহন রায়ের উর্দ্ধতন কর্মচারী, মনিব ও বন্ধু হিসেবে জন ডিগবীর নাম সুপরিচিত। যেসব রাজকর্মচারীদের রামমোহনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়, তাদের মধ্যে প্রথম জন হলেন অ্যান্ড্রু র‍্যামজে ও দ্বিতীয় জন জন ডিগবী। এর পরে অবশ্য রামমোহনের সঙ্গে উডফোর্ড সাহেবের হৃদ্যতা হয় এবং রামমোহন তাঁর অধীনে জালালপুরে ও মুর্শিদাবাদে কাজ করেন। মুর্শিদাবাদের কাজ করার সময় উডফোর্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে ফিরে যান স্বদেশে। এই ঘটনার পরেই রামমোহন ডিগবীর অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত রামমোহন ডিগবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। এই সুদীর্ঘ সময়কালে রামমোহন প্রথমে ডিগবীর সঙ্গে প্রথমে রামগড়, পরে রামগড় থেকে যশোহর, যশোহর থেকে ভাগলপুর, এবং সবশেষে রংপুরে ডিগবীর অধীনে কাজ করেন। এই কাজ করার সুবাদে রামমোহন ডিগবীর কাছে অল্পদিনেই খুব ভালো ইংরেজী শেখেন।

রামমোহন মোট ন' বছর চাকরীর জন্য কলকাতার বাইরে ছিলেন। এর সব সময়টাই তিনি সরকারী চাকরী করেছিলেন এমন নয়; বস্তুত তাঁর সরকারী চাকরী করার মেয়াদ খুবই কম। তিনি জন ডিগবীর অধীনে রামগড়ে চাকরী করেছিলেন। এর পরে যখন দেওয়ানের চাকরী পাকা করার প্রস্তাব গেল জন ডিগবীর কাছ থেকে তখন বোর্ড অফ রেভিনিউয়ের প্রেসিডেন্ট ক্রিম্প ফাইলে নোট দিলেন, 'রামগড়ে চাকরী করার সময় তার কাজকর্ম সম্পর্কে খারাপ কথা আমার কানে এসেছে।' ফলে রামমোহনের সরকারী চাকরী বহাল থাকলো না। জন ডিগবীর কাছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেওয়ানের কাজ করতে লাগলেন। ডিগবী পরে বার বার বোর্ড অফ রেভিনিউকে রামমোহনের জন্য পেড়াপেড়ি করলে বোর্ড ডিগবীর উপরেই চটে যায়। তারা লিখিতভাবে জানায়, "ভবিষ্যতে ডিগবী যদি বোর্ডের প্রতি এমন অসম্মানসূচক ব্যবহার করেন তা হলে তাঁরা সমুচিৎ জবাব দিতে বাধ্য থাকবেন।"

বেসরকারীভাবে কাজ করলেও এই সময় রামমোহনের আয় খুব ভালোই ছিল; আয় ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য দুজন বেতনভুক কর্মচারী ছিল তাঁর। রংপুরের কর্মচারীর নাম ভবানী ঘোষ এবং কলকাতার কর্মচারীর নাম গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়। রংপুর থেকে তিনি কলকাতায় টাকা পাঠাতেন। ঐ টাকায় তিনি তিনটি তালুক কেনেন। জাহানাবাদ পরগণায় বীরলুক ও কৃষ্ণনগর, ভুরসুট পরগনায় শ্রীরামপুর। তাঁর এই বিপুল আয়ের সূত্র কী ছিল?

তাঁর ভক্তরা বলছেন, তিনি কোম্পানীর কাগজের কেনা বেচা করতেন। অর্থাৎ এখন যাকে এন এস সি বা কৃষাণ বিকাশ পত্র বলে সেই জাতীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গৃহীত ঋণপত্রকে সাধারণ মানুষ 'কোম্পানীর কাগজ' বলতো। এর দালালীতে আজও যেমন তেমন কিছু অর্থ পাওয়া যায় না, তখনও তেমন কিছু পাওয়া যেত না যে তার হিসাব রাখার জন্য বেতনভুক কর্মচারী রাখতে হবে। আসল ব্যাপার অন্য। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন সে সময়ে যারা দেওয়ান বা সেরেস্তাদারের কাজ করতো তাদের মূল আয় ছিল উৎকোচ। উৎকোচ গ্রহণ করেই তারা প্রচুর ধনী হতেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন যে, শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ দেব রবার্ট ক্লাইভের মুন্সি ছিলেন এবং মাসিক ষাট টাকা বেতন পেতেন। তিনিই নিজের মায়ের শ্রাদ্ধেন'লাখ টাকা খরচ করেন। পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। এইভাবেই তিনি প্রচুর বিত্ত অর্জন করেন এবং পূর্বকার জমিদারদের উৎখাত করে নতুন নতুন জমিদারী কিনে নেন। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা এ দেশের ভাষা ভালোভাবে না জানার জন্য সেরেস্তাদার, দেওয়ান, পেস্কার ইত্যাদি দেশীয় কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এই সুযোগে নীতিহীন দেশজ কর্মচারীরা স্বজাতিকে শোষণ করে ধনী হয়ে উঠতো।

সুতরাং, দেওয়ানগিরির পথেই অবৈধভাবে রামমোহনের হাতে টাকা এসেছিল—এই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনও ভুল নেই।

রামমোহনের ধর্মীয় চিন্তাবলী

প্রতিমাপূজার প্রতি রামমোহনের বিতৃষ্ণা জন্মায় রামরাম বসুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পর থেকে। কিন্তু গোটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের আরম্ভ করতে হবে একেশ্বরবাদের সৃষ্টি থেকে। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসের তুলনায় একেশ্বরবাদের ইতিহাস অনেক নবীন। আদিম পৃথিবীতে বিভিন্ন শক্তির নররূপারোপ করে সেইগুলিকে পূজা করা হতো। মিশরে সূর্যদেবতা আমন ছিলেন এমনই এক নররূপারোপিত দেবতা। একেশ্বরবাদের আদি প্রবর্তক মিশরের ফ্যারাও (রাজা) চতুর্থ অ্যামেনথ্রপ। চতুর্থ অ্যামেনথ্রপ তাঁর রাজত্বেকালের পঞ্চম বছরে নিজের নাম পরিবর্তন করে 'আখেনাতন' রাখেন। কথাটির অর্থ যে 'অ্যাটনের' পক্ষে প্রয়োজনীয়। অ্যাটন হচ্ছে সূর্যের চক্রাকার রূপ। তিনি সূর্যদেবতার এই জ্ঞানগর্ভ নাম দেন। এই নাম একজোড়া পাথরের ফ্রেমের মধ্যে লেখা থাকতো—যেমন রাজাদের নাম লেখা থাকে পাথরের ফলকে। রাজা তাঁর ধর্মীয় আনুগত্যের পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করে পরিবর্তিত উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, 'সূর্য দেবতার প্রধান পুরোহিত'। অ্যাটন শব্দটি নতুন নয়। কিন্তু চতুর্থ থুতমোজের আমলে অ্যাটনকে দেবতা বলে গণ্য করা হয়। অ্যামেনথ্রপ তৃতীয়ের আমলে এই নামের উল্লেখ বার বার হতে থাকে। সুতরাং আখেনাতন নতুন কোনও দেবতা সৃষ্টি করেন নি। তিনি এই দেবতাকে অন্যদেবতাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে শুধুমাত্র তাঁকেই গ্রহণ করেছিলেন

মাত্র। তিনি আরও কিছু অভূতপূর্ব কাজ করলেন। সূর্যদেবতা থেকে সমস্ত পৌরাণিক গল্প ছেঁটে ফেললেন। এবং ঘোষণা করলেন অ্যাটন পৃথিবীর একমাত্র কল্যাণকামী দেবতা। অ্যাটনের সঙ্গে রাজার দিব্যত্বও ঘোষিত হলো; অ্যাটন তাঁর পিতা, তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে। তাঁর ও তাঁর দেবতার জন্মদিন একই সঙ্গে পালিত হতে লাগলো।

তাঁর রাজত্বের প্রথম পাঁচ বছরে আখেনাতন প্রচুর মন্দির গড়ে তুললেন। তার মধ্যে প্রধান হলো কারনাকে সূর্যদেবতার আমন-রে'র মন্দিরের চত্বরে। এই সমস্ত খোলা স্থাপত্যকর্মে উচ্চমানের রিলিফ ও মূর্তি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু অ্যাটনের কোনও মানুষের মতো মূর্তি নির্মাণ করা হলো না। তার পরিবর্তে সূর্যের চক্র থেকে কিরণরূপে বেরিয়ে এলো হাত। সেই হাত হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে লেখা 'জীবন' পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। ঐ হাত আবার রাজা আর তাঁর পরিবারের দিকে প্রলম্বিত। এই সমস্ত স্থাপত্য নির্মাণের কালে আমন ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। আমন কারনাকের মন্দিরে একাই পড়ে রইলেন অন্ধকারে। রাজমহিষী নেফারতিতি যথেষ্ট প্রাধান্য পেলেন এইসব স্থাপত্য নির্মাণে। তিনি একাই স্থান পেলেন একটি মন্দিরে। সেখানে রাজার কোনও মূর্তি রইল না। আখেনাতন আমার্না বলে মধ্য মিশরের একটি নতুন জায়গায় নির্মিত করলেন তাঁর নব রাজধানী। সেখানে মন্দির রইল, প্রাসাদ রইল, রইলো যাবতীয় বাড়ি ঘর।

রাজত্বের নবম বছরে আখেনাতনের একেশ্বরবাদী তত্ত্ব নতুন মাত্রা পেল। তখন ছুড়ে ফেলা হলো অন্য দেবতাদের। পুরাণো স্মৃতিস্তম্ভগুলিতে যেখানে যেখানে আমনের নাম ছিল সেগুলি মুছে ফেলা হলো। যেখানে যেখানে 'দেবতারা' বহুবচনটি ছিল, মুছে ফেলা হলো সেগুলি। কারণ, দেবতা একটাই। এইভাবে আখেনাতন পুরোপুরি মূর্তিবিহীন একেশ্বরবাদ দ্বারা গ্রস্ত হলেন।

আখেনাতন মোট সতেরো বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে তাঁর একেশ্বরবাদেরও বিলোপ ঘটে। মিশরবাসীরা ফিরে যায় তাদের পুরাতন নররূপারোপিত দেবদেবীর পূজায়।

কিন্তু এই ঘটনার প্রায় দু শো বছর পরে আখেনাতনের উদাহরণ মনে দাগ কাটলো আর এক মিশরীয়র। তাঁর নাম মোজেস। তিনি ভাবনা-চিন্তা করে দেখলেন, আখেনাতনের দেবতা ছিলেন শান্তিপ্রিয়। দেবতা শান্তিপ্রিয় হলে চলে না। তিনি অ্যাটনের সঙ্গে মিশ্রিত করলেন মিডিয়াবাসীদের আগ্নেয়গিরির হিংস্র দেবতা ভলকানের। কিন্তু কারা এই হিংস্র একদেবতার উপাসক হবে? নিশ্চয় মিশরীয়রা নয়। সেই সময় ইস্রায়েলীরা মিশরে ক্রীতদাসত্ব করছিল। মোজেস একদিন ইস্রায়েলীদের নিয়ে মিশর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। সমুদ্র পার হয়ে পৌছলেন আজকের ইস্রায়েলে। সিনাই উপদ্বীপে তাঁর একদেবতা আগুনের শিখা হয়ে দেখা দিলেন তাঁকে। নাম যিহোভা। যিহোভা তাঁকে বললেন, আমি তোমাদের প্রভু বিধাতা। আমি তোমাদের দশটি প্রত্যাদেশ দিচ্ছি। সেই প্রত্যাদেশগুলি হলো :

* আমাকে ছাড়া অন্য কোনও দেবতার পূজা করবে না।

* স্বর্গে-মর্ত্যে-পাতালে আছে এমন কোনও কিছুর প্রতিমা বা ছবি নির্মাণ করবে না।

* তোমরা অন্য কোনও বিধাতার পদতলে নত হবে না বা তাদের সেবা করবে না। কারণ, আমি তোমাদের প্রভু দেবতা, একজন ঈর্ষাপরায়ণ দেবতা। আমি কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করি না। আমাকে যারা ঘৃণা করে তাদের তৃতীয় পুরুষ, চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত শাস্তি দিই। আবার যারা আমাকে ভালোবাসে এবং আমার নিয়ম মেনে চলে তাদের হাজার পুরুষ পর্যন্ত ভালোবাসি।

* আমার নাম কুকাজে ব্যবহার করবে না; তাহলে আমি শাস্তি দেব।

* সপ্তাহের সপ্তম দিন পবিত্র বিশ্রামদিবস হিসাবে পালন করবে। ঐ দিন কেউ কাজ করবে না। এমনকি তোমাদের ক্রীতদাসদেরও ঐ দিন কাজ করতে দেবে না। পিতামাতাকে সম্মান করবে, যাতে তোমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং যে ভূমি তোমাদের দিচ্ছি তাতে তোমরা ভালোভাবে বাস করো।

* খুন করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না। কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করবে না।

* অন্য লোকের স্ত্রী ও সম্পত্তির উপর লোভ করবে না।

একটু পরেই প্রতিমাপূজকদের হত্যা করতে বললেন যিহোভা।

এর পর প্রভু যিহোভা ইহুদীদের বললেন, তোমরা আমার *মনোনীত জন* (Chosen People)। তোমাদের জন্য *প্রতিশ্রুতভূমি* (Promised Land) কানান প্রদেশ বরাদ্দ করেছি। দুগ্ধ ও মধুতে পরিপূর্ণ ঐ প্রদেশ তোমাদের জয় করতে হবে তরবারীর তীক্ষ্ণতায়।

যিহোভা কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যাদেশের মধ্যেই নিহিত সেমীয় একেশ্বরবাদের প্রতিমাপূজা বিরোধিতার তত্ত্ব। একেশ্বরবাদ ও বহুদেবতাবাদের মধ্যে বিভাজনরেখাও স্পষ্ট ঐ প্রত্যাদেশের মধ্যে। কিন্তু এই বিভাজনরেখা কখনও ভালো বনাম মন্দ, ভয়ানক বনাম শান্তিপ্রিয়, কামুক বনাম চরিত্রবান, বা ধার্মিক বনাম অধার্মিকের মতো পার্থক্যযুক্ত নয়।

সুতরাং প্রতিমাপূজা বিরোধিতার উৎস প্রতিমাপূজার অর্ন্তভুক্ত কোনও ত্রুটি নয়। সেমীয় মহাদেবতার ঈর্ষাকাতর মানসিকতা ও মানুষের অন্তরের পূজার বেদী অধিকারের প্রসারণকামী মানসিকতাই প্রতিমাপূজা বিরোধিতার উৎস।

যিহোভার এই দশটি প্রত্যাদেশ সত্ত্বেও প্রতিমাপূজার অবসান ঘটলো না ইহুদী সমাজে। যিহোভাই পূজিত হতে লাগলেন বৃষ বা সোনার বাছুর হিসাবে। এমনকি সাপরূপেও পূজিত হচ্ছিলেন যিহোভা। হৈজেকিয়া ধ্বংস করেছিলেন সেই সাপকে।

ফ্রয়েডের মতে এই ভয়ানক একেশ্বরবাদ ইহুদীদের তৎকালীন আগ্রাসী মানসিকতাকে বৃদ্ধি করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। বিশেষতঃ ইহুদীরা যখন নিজেদের জন্য একটি বাসভূমি

অধিকার করার জন্য ব্যস্ত। ওল্ড টেস্টামেন্টে আমরা দেখি, কীভাবে মোজেস ও তাঁর উত্তরসুরী জোসুয়া যিহোভার আদেশ পেয়ে প্রতিশ্রুতভূমি কানান প্রদেশের যাবতীয় নরনারী গবাদি পশু সমেত ধ্বংস করেছিলেন। এবং অন্যান্য যে সব প্রদেশে প্রতিমাপূজা প্রচলিত ছিল, সেই সমস্ত প্রদেশের শহরগুলিকে ধ্বংস করেছিলেন নির্মমতার সঙ্গে। কানান প্রদেশের বহিস্থ নগরগুলিকে আক্রমণ করে তাঁরা সমস্ত পুরুষ অধিবাসীদের হত্যা করেছিলেন। লুণ্ঠন করেছিলেন যাবতীয় সম্পদ ও নারী। যিহোভার আদেশে মিডিয়াবাসীদের কুমারী নারী ব্যতীত শিশুপুত্র সমেত যাবতীয় অধিবাসীদের হত্যা করা হয়েছিল। কুমারীদের উপভোগ করার জন্য বিতরণ করা হয়েছিল ইহুদীদের মধ্যে। কিন্তু প্রতিশ্রুতভূমি কানান প্রদেশের মধ্যে ইহুদীদের কোনও রকম বিচার বিবেচনার অবকাশ ছিল না। বাইবেলের জোসুয়া খণ্ডে বর্ণনা করা আছে কীভাবে জেরিকো, আই, ম্যাকেডা, লিবনা, ল্যাকিস, এগলন, হেব্রন, ডেবির ও অন্যান্য উপনগরগুলিতে ব্যাপক হত্যালীলা চালিয়ে অধিবাসীদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। এইভাবে যিহোভার সাহায্যে জোসুয়া যিহোভার *আপনজন* ইহুদীদের জন্য এক বিশাল *প্রতিশ্রুতভূমি* দখল করেছিলেন। সুতরাং ইহুদীদের ধর্ম আসলে জমি দখলের ধর্ম। এটা ধর্মের পোযাকে রাজনীতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাইবেলের আধুনিক গবেষকদের মতে হিব্রু বাইবেলের এই অংশ অতিবর্ণনা। হিব্রু বাইবেল সম্পাদিত হওয়ার প্রায় সাতশো বছর আগে ইহুদীরা কানান প্রদেশ দখল করেছিল। বাইবেল সম্পাদনার সমকালে ইহুদী জনগণের ও পুরোহিতদের আদর্শগত প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছিল এই ধরণের অতিবর্ণনা। সম্ভবতঃ অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে সহাবস্থান করেই মোজেসকে তাঁর দলবল সমেত কানান প্রদেশে বাস করতে হয়েছিল। পরে ধীরে ধীরে কানান প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রসারলাভ করেছিল যিহোভা উপাসনা। এইভাবে হিব্রু বাইবেল তার যাবতীয় উচ্চ নীতিকথা ও ধর্মীয় দূরদৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হয়েও যে মানবিকতাবিরোধী যিহোভার *আপনজন* ও *প্রতিশ্রুতভূমির* জমি দখলের হিংস্র ধারণাযুগলের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছিল তা বিশ্বের যাবতীয় মানবসম্পদকে বারংবার দুটি বিবদমান শিবিরে ভাগ করেছে। *আপনজনরা* বারবার গণহত্যায় প্ররোচিত হয়েছে *প্রতিশ্রুতভূমি* দখলের উন্মাদনায়।

হিব্রু বাইবেল ইহুদীদের সম্মানীয় গ্রন্থ হলেও বর্তমান পৃথিবীর ইহুদীরা কখনও মোজেস ও জোসুয়ার উদাহরণ দ্বারা উৎসাহিত হন না। তাঁরা ওল্ড টেস্টামেন্টের ভাষ্য রচনা করেছেন। সেই ভাষ্যের নাম তালমুদ। তালমুদ ওল্ড টেস্টামেন্টের বহুত্ববাদী ব্যাখ্যা। এই একাধিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও স্বীকার করা হয়েছে, বিধাতার মহিমা উপলব্ধির জন্য কোনও ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয়। এই ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে আছে, আক্ষরিক, রূপক, রহস্যবাহী ইত্যাদি। তালমুদের মধ্য দিয়ে ইহুদী ধর্ম তার সংকীর্ণ পরাকরণমনস্কতা ত্যাগ করে ঔদার্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে বিশ্বমানবতার সঙ্গে। ফলে ইহুদীদের দ্বারা মানব সভ্যতা উপকৃত হয়েছে বহুভাবে। ইহুদীরা চিরকালই বসবাসের দেশের আর্থিক ও বৌদ্ধিক প্রগতির ধারক ও বাহক। পৃথিবীর জনসংখ্যার অতি সামান্য অংশ হলেও সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ইহুদীরাই। ফ্রয়েড, স্পিনোজা, কার্ল মার্কস, আইনস্টাইন

প্রভৃতি বিশ্বশ্রেষ্ঠ মনীষীরা ইহুদী ছিলেন। এতৎসত্ত্বেই অন্যান্য সেমীয় ধর্মাবলী মানুষদের চক্রান্তে ব্যবসাকুশল এই জাতি চিরকালই সাইলক দ্য জু হিসাবেই নিন্দিত।

ইহুদীরা পরাকরণমনস্কতা ত্যাগ করলেও ঈশ্বরের *মনোনীতজন* ও *প্রতিশ্রুতভূমির* মানবিকতা-বিরোধী ধারণাযুগল আত্মস্থ করে পরবর্তী সেমীয় ধর্মদ্বয়—খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম। আরও পরবর্তীকালে ঐ ধারণাযুগলই রূপান্তরিত হয় উপনিবেশবাদ, ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদ ও মার্কসীয় সাম্যবাদে। এই আধুনিক মতবাদগুলির কেন্দ্রে কোনও বিধাতা না থাকলেও সেমীয় ধর্মগুলির মতো এই অর্বাচীন মতবাদগুলিতে পৃথিবীর মানুষদের দুটি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত করার নীতি বর্তমান। বর্তমান এক শিবিরের পুষ্টির বিনিময়ে অন্য শিবিরকে ধ্বংস করার ধারণাও। ফলে ইতিহাসের প্রভাতে সংঘটিত কানান প্রদেশের গণহত্যা বিস্তার লাভ করেছে একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগ পর্যন্ত।

ইহুদীধর্ম অন্তর্ভুক্ত ছিল ইহুদীদের বংশের কতকগুলি শাখার মধ্যে। কিন্তু ইহুদী যিশুর ধর্ম সন্ত পৌলের দ্বারা বিস্তারলাভ করলো অ-ইহুদীদের মধ্যেও। পৌল বললেন, তোমরা যদি খ্রিষ্টের হও, তাহলে তোমরা আব্রাহামের বংশধর—প্রতিশ্রুতিঅনুযায়ী তাঁর উত্তরাধিকারী। ফলে সম্প্রসারণশীল হয়ে উঠলো সেমীয় খ্রিষ্টধর্ম। খ্রিষ্টধর্মের চরম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ালো গোটা বিশ্ব জুড়ে যিহোভার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রতিমাপূজা বিরোধিতা নতুন মাত্র পেল খ্রিষ্টধর্মের নিউ টেস্টামেন্টে। ওল্ড টেস্টামেন্ট ধর্মগ্রন্থ হিসাবে যথারীতি বজায় রইল খ্রিষ্টধর্মে। যাবতীয় পাপ ও অপরাধের সঙ্গে একই বন্ধনীভুক্ত করা হলো প্রতিমাপূজাকে। যদিও ঐ সময়ে সেমীয় একেশ্বরবাদীদের মধ্যেও নানা অনৈতিক কাজকর্ম প্রচলিত ছিল। প্রচলিত ছিল বিমাতার সঙ্গে অজাচারও। বাইবেলে বিরোধিতা করা হলো শক্তি ও প্রকৃতিপূজাও। খ্রিষ্টধর্ম প্রসারের জন্য পেশীর ব্যবহার করার কথাও বলা হলো নিউ টেস্টামেন্টে। লুকের মঙ্গলবাণীতে 'মহাভোজের রূপক' এ এক ভোজে যোগদানের জন্য জোর করে লোক ধরে আনার কথা হলো। ভোজসভায় যোগদানের অর্থ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করা। সেই বিচারে এটিও একটি জেহাদী তত্ত্ব।

সুতরাং খ্রিষ্টানী প্রসারের জন্য গ্রীক বাইবেলে বলপ্রয়োগেরও বিধান দেওয়া হয়েছে। এই বিধানেরই ব্যাপক প্রয়োগ করেছে পরবর্তীকালের খ্রিষ্টান মৌলবাদীরা। এ ছাড়া হিব্রু বাইবেলের যাবতীয় বলপ্রয়োগের বিধান তো ছিলই। খ্রিষ্টধর্ম প্রসারের জন্য রাজশক্তির অনুগ্রহ লাভের কথা বলা হলো প্রচারকদের। রাজার শক্তি তরবারীর তীক্ষ্ণতার উপরই নির্ভরশীল। এমনকি ধর্ম প্রচারের জন্য প্রতারণা করারও ইঙ্গিত দেওয়া হলো। বলা হলো যেন তেন প্রকারেণ মানুষকে 'উদ্ধার' করাই ধর্মপ্রচারকদের কাজ। এথেন্সে ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে সন্ত পৌল দেখলেন, এথেন্সবাসীরা অত্যন্ত প্রতিমাপূজক। তিনি তাদের প্রতিমাপূজার মানসিকতাকেই কৌশলে কাজে লাগিয়ে খ্রিষ্টানী প্রচার করতে মনস্থ করলেন। একস্থলে অনেকগুলি বেদীতে বেশ কিছু মূর্তি ছিল। কিন্তু একটি বেদী ছিল খালি। তাতে লেখা ছিল

এক অজানা দেবতাব বেদী। তখন সন্ত পৌল এথেন্সবাসীদের প্রতারণা করে বললেন, "তোমাদের সেই অজানা দেবতাই আমার বর্ণিত ঈশ্বর।"

নিউ টেস্টামেন্টের 'গসপেল' বা মঙ্গলবাণীই খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের কাছে যিশুর একমাত্র জীবনী বলে চিহ্নিত। কিন্তু ম্যাথু, লুক, জন ও মার্কের চারটি মঙ্গলবাণী নিষ্ঠ ভাবে পাঠ করলে বোঝা যায় বিভিন্ন মঙ্গলবাণীতে যিশুর যে জীবনী পাওয়া যায় তা সর্বতোভাবে এক নয়। তাঁদের বর্ণনাসমূহের মধ্য দিয়ে যিশুর যে ছবি ফুটে উঠেছে, সেগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আর, মঙ্গলবাণীগুলিতে যিশুর যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা সবই যে যিশুর উচ্চারিত, এমন চিন্তা করলে প্রচণ্ড ভুল হবে।'

এখন মঙ্গলবাণীগুলি পৃথিবীর মানুষের কাছে কতটা মঙ্গলদায়ক তা দেখা যাক। নিউ টেস্টামেন্ট থেকে এই উদ্ধৃতিটা ধরা যাক :

'তখন যিশু কাছে এসে তাদের বললেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। তাই তোমরা যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে ব্যাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যেসব আদেশ দিয়েছি, সেসব তাদের পালন করতে শেখাও আর দেখ যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।'—মথি : ২৮ : ১৮-২০

উপরোক্ত যিশুবাক্যাবলী থেকে পরিষ্কার যিশু তাঁর অনুগামীদের পৃথিবীর সকল জাতির কাছে খ্রিষ্টধর্ম প্রসার করতে বলেছিলেন। নিছক মানব সেবার কথা বলেন নি।

এখন ওল্ড টেস্টামেন্ট সম্পর্কে যিশুর বক্তব্য শোনা যাক :

"ভেবো না যে আমি মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষা ধ্বংস করতেই এসেছি। আমি তা ধ্বংস করতে আসিনি বরং তা পূর্ণ করতেই এসেছি। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আকাশ ও পৃথিবীর লোপ না হওয়া পর্যন্ত বিধি-ব্যবস্থার বিন্দু-বিসর্গেরও লোপ হবে না, বিধি-ব্যবস্থার সবই পূর্ণ হবে। তাই কেউ যদি এই সব আদেশের মধ্যে অতি সামান্য আদেশও অমান্য করে আর অপরকে তা করতে দেয়, তবে সে স্বর্গরাজ্যে সবচেয়ে তুচ্ছ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যারা বিধিব্যবস্থা পালন করে এবং অপরকে তা করতে শিক্ষা দেয়, তারা স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য হবে।"

এই 'মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষা' ওল্ড টেস্টামেন্টের বিষয়বস্তু।

তবুও মঙ্গলবাণীতে অন্য যা যা আছে যা তার মধ্যেও আপত্তি করার মতো বহু কিছু আছে। প্রথমে মথি লিখিত সুসমাচার। প্রথমেই ভণ্ড ভাববাদীদের (prophets) থেকে অনুসারীদের সাবধান করেছেন যিশু।

"ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সাবধান। তারা তোমাদের কাছে নিরীহ মেষশাবকের ছদ্মবেশে আসে অথচ ভেতরে তারা হিংস্র নেকড়ে।" অর্থাৎ, আমিই আসল মানুষ, নকল থেকে সাবধান।

ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সাবধান করার ব্যাপারটা বার বার আছে বাইবেলে।

বাইবেলে খ্রিষ্টের পরাকরণমনস্কতার কথাও আছে : "এরপর যিশু সেই জায়গা ছেড়ে সোর ও সিদোন অঞ্চলে গেলেন। একজন কনান দেশীয় স্ত্রীলোক সেই অঞ্চল থেকে এসে চিৎকার করে বলতে লাগলো, "হে প্রভু, দায়ুদের পুত্র, আমাকে দয়া করুন। একটা ভূত আমার মেয়ের উপর ভর করেছে, তাতে সে ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছে।"

যিশু তাকে একটা কথাও বললেন না। তখন তাঁর শিষ্যরা এসে যিশুকে অনুরোধ করে বললেন, "ওকে চলে যেতে বলুন, কারণ, ও চিৎকার করতে করতে আমাদের পিছন পিছন আসছে।"

এর উত্তরে যিশু বললেন, "সকলের কাছে নয়, কেবল ইস্রায়েলের হারানো মেষদের কাছেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।"

এই ইস্রায়েলের হারানো মেষ হচ্ছে ইহুদীরা। সুতরাং খ্রিষ্ট সবার পরিত্রাতা নয়, সমস্ত মানবজাতির নয়। এই পরাকরণমনস্কতার কথা মার্ক লিখিত সুসমাচারেও আছে: "যিশুর আসার কথা শুনে একটি স্ত্রীলোক যার মেয়ের উপর অশুচি আত্মা ভর করেছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে এসে যিশুর পায়ে লুটিয়ে পড়লো। স্ত্রীলোকটি ছিল জাতিতে গ্রীক, সুরফৈনীকি। সে মিনতি করে যিশুকে বললো যেন তিনি তার মেয়ের ভেতর থেকে ভূতকে তাড়িয়ে দেন।

তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "প্রথমে ছেলেমেয়েরা তৃপ্ত হোক, কারণ, ছেলেমেয়েদের খাবার নিয়ে কুকুরকে খাওয়ানো ঠিক নয়।"

যিশু আরও বলেছেন, "যারা আমার আগে এসেছে, তারা সব চোর ও ডাকাত।"

খ্রিষ্টধর্ম অন্য ধর্মকে স্বীকার করে না; বলে, যিশুকে ত্রাণকর্তা হিসাবে না মানলে পাপের মধ্যেই মরতে হবে: খ্রিষ্টবলেছেন, "তোমরা যদি বিশ্বাস না করো আমিই তিনি, তবে তোমরা তোমাদের পাপে থেকেই মরবে।" বলেছেন, "যদি কেউ আমাতে না থাকে তবে তাকে শুকিয়ে যাওয়া শাখার মতো ছুঁড়ে ফেলা হয়; তারপর সেই শুকনো শাখাকে জড়ো করে তা আগুনে ছুঁড়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়।"

এটি অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করার ইঙ্গিত।

যোহনের সুসমাচারে আছে, "যে কেউ পুত্রের উপর বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়; কিন্তু যে পুত্রকে অমান্য করে সে সেই জীবন কখনও লাভ করে না, বরং তার উপর ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে থাকে।"

যিশুর মধ্যে প্রতিহিংসা পরায়ণতাও ছিল। তিনি বাহাত্তর জন অনুসারীকে মনোনীত করে তাদের বাণী প্রচার করতে পাঠালেন। বললেন, "তোমরা কোনও নগরে প্রবেশ করলে যদি সেই নগরের লোকেরা তোমাদের স্বাগত না জানায়, তবে সেখানকার রাস্তায় বেরিয়ে এসে তোমরা বোলো, এমনকি তোমাদের নগরের যে ধূলো আমাদের পায়ে লেগেছে, তা আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঝেড়ে ফেললাম; তবে একথা জেনে রেখো, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে গেছে। আমি তোমাদের বলছি, সেই দিন এই নগরের থেকে সদোমের লোকদের অবস্থা অনেক বেশি সহনীয় হবে।"

কি সাংঘাতিক প্রতিহিংসাত্মক মনোভাব! সদোমের লোকেরা পায়ুরমণের পাপ দ্বারা গ্রস্ত;তাদের থেকেও খারাপ হবে যিশুর মনোনীত মানুষদের কথা না শুনলে!

সুতরাং, খ্রিষ্টধর্মের ঈশ্বর সর্বজনীন ঈশ্বর নন। এই ঈশ্বর শুধুমাত্র খ্রিষ্টানদের ঈশ্বর এবং ক্রোধী ও প্রতিহিংসা পরায়ণ।

এছাড়া মনে রাখতে হবে বাইবেল অনুসারে যিশুর নিজস্ব কোনও ভূমিকা নেই। "আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না। আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে যেমন শুনি তেমনি বিচার করি। আর আমি যা বিচার করি তা ন্যায্য, কারণ আমি আমার ইচ্ছামতো কাজ করি না। বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছাপূরণ করার চেষ্টা করি।"

দেখা যাচ্ছে, যিশুর জীবনের সমস্ত ঘটনাই পূর্বনির্ধারিত। এমনকি মৃত্যুও। সুতরাং যিশুচরিত নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। বাইবেলের সুসমাচারগুলিপড়লে দেখা যায় ঈশ্বর নিজের মহিমা প্রদর্শন করার জন্য নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটাচ্ছেন যিশুকে দিয়ে। এখন যিশুর 'শৈলোপদেশ' নিয়ে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ, এই শৈলোপদেশেই বলা আছে, "আমি তোমাদের বলছি দুষ্ট লোকদের প্রতিরোধ কোরো না, বরং কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, তবে তার দিকে অপর গালটিও বাড়িয়ে দিও।"

শৈলোপদেশের এই বক্তব্য নিছক কাপুরুষতা ছাড়া কিছু নয়। ভারতীয় নৈতিকতা মোটেই এই ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতাতে আততায়ী বধের কথা আছে। তবে প্রতিহিংসার বশে নয়, সমাজ রক্ষা করার জন্য নৈতিক কর্তব্য হিসাবে। আগেই দেখেছি, লুক লিখিত সুসমাচারে রূপক গল্পের মাধ্যমে বলপূর্বক ধর্মপ্রসারের নির্দেশ আছে; মথি লিখিত সুসমাচারে ঈশ্বরে জন্য মানুষ ধরার কথাও আছে : "যিশু যখন গালীলে হ্রদের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দুই ভাইকে দেখতে পেলেন, শিমোন যার অন্য নাম পিতর ও তার ভাই আন্দ্রিয়। তাঁরা তখন হ্রদে জাল ফেলছিলেন। যিশু তাদের বললেন, "আমার সঙ্গে চলো, মাছ নয়, কেমন করে মানুষ ধরতে হয় আমি তোমাদের শেখাবো।" এছাড়া যিশুর অন্তিম উপদেশ তো আছেই, যা আমরা প্রথমেই উৎকলিত করেছি। এছাড়া সেমীয় ধর্মসমূহে ঈশ্বরকে ভয় করার একটা ব্যাপার আছে। এ সব না থাকলে সেমীয় ধর্মগুলি কেউ মানতো-ই না।

বলা হয়েছে :

(১) ঈশ্বরকে ভয় করো এবং তাঁর প্রত্যাদেশ মেনে চলো।

(২) যারা প্রভুকে ভয় করে তারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত।

(৩) তোমাদের মেরে ফেলার পর নরকে পাঠাবার ক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁকেই ভয় করো। (লুক,১২/৫)

(৪) তৃতীয় শতকের পাদ্রী টারটুলিয়ান বলেছিলেন, "ভয় না করে তোমরা কি করে ভালোবাসবে ঈশ্বরকে। (এই রকম ঈশ্বর) সুনিশ্চিতভাবে তোমার পিতা নয়, কর্তব্যের জন্য যাঁকে তোমরা ভালোবাসবে। তিনি শক্তিশালী বলেই তোমরা তাঁকে ভয় করবে।"

সুতরাং উপরে বর্ণিত 'মানুষ ধরার' নির্দেশ পেয়েই 'একমাত্র ঈশ্বর ও একমাত্র ত্রাণকর্তার' তত্ত্বে বিশ্বাসী সন্ত পৌলের দ্বারা খ্রিষ্টধর্ম ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশলাভ করে। প্রাচীন রোমক সম্রাটরা ছিলেন প্রতিমাপূজক। রোমক সম্রাট কন্সটান্টাইনের আমলেই খ্রিষ্টধর্মের প্রচারকেরা সর্বপ্রথম রাজানুগ্রহ লাভ করেন। পিতা কন্সটান্টসিয়াসের মৃত্যুর পর কন্সটান্টাইন এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ওই যুদ্ধে খ্রিষ্টানরা তাঁকে প্রচুর সাহায্য করে। ফলে কনস্টান্টাইন খ্রিষ্টানদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে আরোপিত নানা নিষেধ রদ করে দেন তিনি। ৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে লিসিনিয়াসের বিরুদ্ধে সংঘটিত এক যুদ্ধে কনস্টানটাইনের ধ্বজা ছিল ক্রুশ চিহ্নিত। আর লিসিনিয়াসের ধ্বজাতে ছিল প্রতিমাপূজকদের চিহ্ন। ওই যুদ্ধকেই ইউরোপে প্রতিমাপূজক ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে অস্তিত্বের লড়াই বলে চিহ্নিত করা হয়। লিসিনিয়াসের পরাজয়ের ফলে প্রতিমাপূজকেরা চিরকালের জন্য বঞ্চিত হয় রাজানুগ্রহ থেকে। খ্রিষ্টীয় ধর্মমণ্ডলীর হাতে চলে যায় রোমক সাম্রাজ্যের ধর্মীয় ব্যবস্থা।

বর্তমানে পৃথিবীর খ্রিষ্টানরা বহুধাবিভক্ত। প্রতিটি ধর্মমণ্ডলীর আচার-বিচার ও বিধান ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মের মূল যে বিশ্বাস (Dogma) সবাই সত্য বলে মনে করেন, সেগুলি হলো :

(১) **যিহোভার বচন** : ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট হলো যিহোভার বচন। ওল্ড টেস্টামেন্টে বিভিন্ন পয়গম্বরের মাধ্যমে ঈশ্বর যিহোভা তাঁর মনোনীত মানুষ ইহুদীদের বচন দান করেছিলেন। কিন্তু নিউ টেস্টামেন্টের বচন সমগ্র মানবজাতির জন্য। এখানে ঈশ্বরের মুখপাত্র তাঁর পুত্র যিশু এবং তাঁর প্রধান শিষ্যগণ। সুতরাং খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সমস্ত বচন আদতে ঈশ্বর যিহোভার। ঈশ্বরের বচন স্বাভাবিকভাবেই ত্রুটিশূন্য, সে কারণে প্রশ্নযোগ্য নয়। দুটি টেস্টামেন্ট সম্বলিত বাইবেল খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস ও ধর্মকর্মের জন্য পৃথিবীতে তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

(২) **আদিম পাপ** : ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী মানুষের আদি পিতা ও মাতা হলেন আদম ও ঈভ। তাঁরা দুজনেই স্বচ্ছন্দে স্বর্গোদ্যানে বাস করছিলেন। কিন্তু সর্পরূপী শয়তানের প্রলোভনে পড়ে তাঁরা যিহোভার নির্দেশ অমান্য করে নিষিদ্ধবৃক্ষের ফল পেড়ে খেয়েছিলেন। এর ফলে তাঁরা যিহোভার বিদ্বেষের পাত্র হন; কিন্তু সৃষ্টি করেন মানবজাতির। যেহেতু যিহোভার আদেশ অমান্য করার ফলেই মানবজাতির সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ মাত্রই জন্মগতভাবে পাপী। এই পাপ থেকে উদ্ধার পাবার ক্ষমতা মানুষের নেই।

(৩) **পাপীদের উদ্ধার** : নিউ টেস্টামেন্ট অনুযায়ী যিহোভা অশেষ কৃপাপরবশ হয়ে পাপীদের উদ্ধারের জন্য তাঁর সৃষ্ট সন্তান যিশুকে ধরাধামে অবতীর্ণ করেছেন। মানুষের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যিহোভার বিদ্বেষ প্রশমিত করার জন্য যিশু মানবজাতির হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন ক্রুশকাঠে।

(৪) **পুনরুত্থান** : ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার তৃতীয় দিনে যিশু স্বশরীরে কবর থেকে উত্থিত হলেন এবং উপস্থিত হলেন জেরুজালেমে তাঁর প্রধান শিষ্যদের কাছে। তাঁদের কাছে নানা চিহ্ন দেখিয়ে প্রমাণ করলেন তিনি যিশুই; রক্তের বিনিময়ে মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

(৫) **স্বর্গারোহণ** : কিছুক্ষণ পরে একই দেহে যিশু স্বর্গারোহণ করলেন এবং উপস্থিত হলেন যিহোবার সামনে; যাঁরা তাঁকে একমাত্র উদ্ধারকারী হিসাবে মান্য করে তাঁদের মুখপাত্র হয়ে যিহোভার কাছে বক্তব্য রাখার জন্য।

(৬) **পরিত্রাণ** : সেই থেকে যেসব মানুষরা যিশুকে একমাত্র পরিত্রাতা বলে মানে এবং যিশুর জন্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ইত্যাদি ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকার করে, তাদের জন্য যিহোবার উপহার হলো পরিত্রাণ। মানুষ যতই জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিমান ও সৎ হোক না কেন, যিশুর ধর্মতে বিশ্বাস বিনা তার পরিত্রাণ নেই।

(৭) **চার্চ বা ধর্মমণ্ডলী** : চার্চ বলতে খ্রিষ্টানীতে শুধু একটা ইমারত বোঝায় না। যারা যিশুখ্রিষ্টকে একমাত্র পরিত্রাতা বলে মনে করে তাদের সংগঠনই হলো চার্চ। চার্চের কাজ ভজনা, প্রার্থনা, শিক্ষাদান, দীক্ষাদান, অবিশ্বাসীদের খ্রিষ্টায়িতকরণ ইত্যাদি।

(৮) **আজ্ঞা** : যিশু সমস্ত বিশ্বাসীদের উপর চার্চের কর্মভার অর্পণ করেছেন। চার্চের অধীন করেছেন গোটা পৃথিবী। সেই সঙ্গে তিনি যাবতীয় অবিশ্বাসীদের জান-মান-সম্পত্তি অর্পণ করেছেন বিশ্বাসীদের কাছে।

(৯) **মিশন বা প্রচার সমিতি** : যেন তেন প্রকারেণ যে কোনও স্থানে এবং যে কোনও সময়ে অবিশ্বাসীদের খ্রিষ্টানীর অধীনে আনাই চার্চ বা খ্রিষ্টমণ্ডলীর কর্তব্য। এইভাবে পৃথিবীতে যিশুর পুনরাগমনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে — যা অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সঠিক সময়টি অপ্রকাশিত। যিশু শেষ পর্যন্ত সমস্ত অবিশ্বাসীদের জয় করবেন এবং হাজার বছরের জন্য পৃথিবীতে তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

(১০) **শেষ বিচার** : যিশুর পুনরুত্থানের হাজার বছর পরে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষ জন্মেছে তাদের উত্থিত করা হবে স্বশরীরে। তারা শেষ বিচারের জন্য যিহোভার সামনে এসে দাঁড়াবে। সে সময় যারা যিশুকে একমাত্র পরিত্রাতা হিসাবে মান্য করেছে, তাদের হয়ে ওকালতি করবেন যিশু। ফলে স্বর্গে গিয়ে তারা সুখে বাস করবে। কিন্তু যারা যিশুকে পরিত্রাতা হিসাবে স্বীকার করেনি, তারা নিক্ষিপ্ত হবে নরকে এবং তারা অনন্তকাল ধরে নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে।

যিশুর ঐতিহাসিকতা

মঙ্গলবাণীসমূহে জেমস একটি গৌণ চরিত্র—যে যিশুর ভ্রাতা মাত্র। আর যিশু 'পবিত্রভূমি'তে বিচরণ করছেন বিশালকায় পুরুষ রূপে। কিন্তু ইতিহাসের প্রাথমিক সূত্রে যে ছবি পাওয়া যায়

তাতে জেমস হচ্ছেন সঠিক বিচারধারার মানুষ। তিনি ইহুদী নীতিশাস্ত্র বা আইনের কঠোর অনুসারী, এবং প্রথম দিককার অ-খ্রিষ্টান সূত্রগুলিতে যিশুর নামটুকুও পাওয়া যায় না। প্রথম দিককার খ্রিষ্টান লেখক অরিজেন (Origen) এবং ইউসেবিয়াস (Eusebius)যে ছবি এঁকেছেন, তাতে বিশ্বাস স্থাপনের চেয়ে সন্দেহ করার সম্ভাবনা প্রবল। প্রথম শতাব্দীর প্যালেস্টাইনের ইতিহাসকার জোসেফাসের লেখা খ্রিষ্টানদের দ্বারা অনেক পরিবর্তিত করা হলেও সে সবে জেমস যে একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তা অস্বীকার করা হয় নি। যদিও এই ইতিহাসে যিশুকে একজন ঐতিহাসিক পুরুষের মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। এইসব আলোচনার সূত্রে একটি কথা পাঠকদের বলে দেওয়া প্রয়োজন যে যিশুখ্রিষ্ট এই নামটির দুটি অংশ—যিশু ও খ্রিষ্ট। যিশু মানুষটির আসল নাম আর খ্রিষ্ট তাঁর উপাধি (পদবী নয়)। 'খ্রিষ্ট' শব্দের অর্থ 'ত্রাণকর্ত্তা'।

জোসেফাস যিশুর ঐতিহাসিকতার সূত্রে সত্য সত্যই কি লিখেছিলেন তা জানা প্রয়োজন। জোসেফাসের 'অ্যান্টিকুইটিস অফ দি জুস' (Antiquities of the Jews) পুস্তকের আধুনিক সংস্করণে লেখা হয়েছে: "এখন এই সময় যিশু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, তাঁকে মানুষ বলা যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, কারণ, তিনি বিস্ময়কর কর্ম করেছিলেন। ......তিনি ত্রাণকর্ত্তা, এবং যখন পিলেত, আমাদের মধ্যে (অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্যে) বহু গণ্যমান্য মানুষের প্রস্তাবে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেন (৩৩ অব্দের ৩রা এপ্রিল) তাঁকে যারা প্রথম থেকে ভালোবেসেছিল, তারা তাঁকে ত্যাগ করে নি, কারণ, তিনি জীবন্ত অবস্থায় তাদের দেখা দিয়েছিলেন ক্রুশবিদ্ধহওয়ার তৃতীয় দিনে (৩৩ অব্দের ৫ ই এপ্রিল)।

আধুনিক খ্রিষ্টীয় ধর্মমণ্ডলী যে দিনগুলিকে জানেন ও বিশ্বাস করেন, সেই দিনগুলিই এই আধুনিক সংস্করণে দেওয়া হয়েছে। এগুলি আদতে জোসেফাস দেন নি।

যিশু সম্পর্কে জোসেফাসের বিবৃতি যথেষ্ট সন্দেহজনক। এই কথাগুলি সব পাণ্ডুলিপিকে পাওয়া যায়; কিন্তু কোনওটাই একাদশ শতাব্দীর চেয়ে পুরানো নয়। কিন্তু এটা চতুর্থ শতাব্দীর ইউসেবিয়াসের জানা ছিল। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীর অরিজেন এটা পড়েন নি। অন্তত এটার বর্ত্তমান আকারে। যেহেতু জোসেফাস যিশুকে খ্রিষ্ট বলে বিশ্বাস করতেন না।

অরিজেনের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে তাঁর সময়ে যিশু খ্রিষ্ট হন নি। কিন্তু পরের শতাব্দীতে ইউসেবিয়াস যিশুর এই খ্রিস্টত্বের কথা জানতেন। এর অর্থ একটাই—ইউসেবিয়াসই যিশুর খ্রিষ্টত্বের কথা বাইবেলে ঢুকিয়েছেন যে যিশু আবার ইহুদীদের দ্বারা তাড়িত হয়েছিল। ইউসেবিয়াস ছিলেন সিকারিয়ার বিশপ, তাঁর পক্ষে এটা করা খুবই সঙ্গত। কারণ, তিনি রোমক সম্রাট কনস্টানটাইনের অনুগ্রহ লাভের জন্য উন্মুখ, যাতে খ্রিষ্ট ধর্ম রোমক সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করে।

রোমক সম্রাট তাদের ধর্মের পৃষ্ঠপোষণা করছেন এ ব্যাপারটা খ্রিষ্টান ধর্মকর্ত্তাদের বেশ স্বস্তি দিল। নাইসিয়াতে ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টানদের যে বিশ্ব সম্মেলন হলো, তাতে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইনকে খুশিমত খ্রিষ্টান ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করতে দিল খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা।

সম্মেলনে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ধর্মীয় প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হলো। কনস্টানটাইন বললেন যে যে বিশপ এই সব প্রস্তাব প্রসঙ্গে একমত হবেন না তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এই বিশ্বসম্মেলনেই যিশুকে ঈশ্বর বানানো হলো; যিশু একই সঙ্গে পিতা, পুত্র ও পবিত্র প্রেত, এই ত্রিমূর্ত্তি। এই সম্মেলনেই যিশুকে একমাত্র খ্রিষ্ট বা ত্রাণকর্ত্তা বলে স্বীকার করা হলো, যার ফলে অন্য সব ধর্ম প্রতিপন্ন হলো মিথ্যা বলে। দুজন বিশপ এই সম্মেলনের প্রতিবেদনের সঙ্গে একমত হলেন না। নির্বাসনে পাঠানো হলো তাঁদের।

বিশ্বসম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি হলো :

"আমরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি—সর্বশক্তিমান পিতা, দর্শনীয় ও অদর্শনীয় যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং এক প্রভু যিশুখ্রিষ্টতে, যিনি ঈশ্বরের পুত্র, ঔরসজাত—সৃষ্টি করা নয়; পিতার সঙ্গে একই, যিনি আমাদের মতো একই, যার মধ্য দিয়ে আমাদের ত্রাণ নেমে এসেছে, তিনি আমাদের জন্য কষ্ট ভোগ করেছেন, তৃতীয় দিনে উঠে এসেছেন, তারপর স্বর্গে উঠে গেছেন। এবং আমাদের বিচার করার জন্য নেমে আসবেন।...."

বাইবেল সম্পর্কে ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া স্বীকার করেছে, "সব ধরনের জালিয়াতি ও অতিকথন এবং অজ্ঞানতা একটা বৃহদাকার গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন বিদ্বানরা দেখিয়েছেন, চারটি মঙ্গলবাণীই বিভিন্নভাবে বিকৃত করা হয়েছে, নতুনভাবে লেখা হয়েছে, যদিও খ্রিষ্টীয় ধর্মমণ্ডলী দাবী করে যে সবই আদি, অকৃত্রিম ও অবিকৃত আছে।"

ইসলাম

ইসলাম হলো তৃতীয় সেমীয় ধর্ম। অন্য দুটি সেমীয় ধর্মের মতো ইসলামও জমি দখলের ধর্ম। এই ধর্মে বিধাতার নাম আল্লাহ্। আল্লাহ্র *আপনজন* হচ্ছে মুসলমান বা মুমিন। পরজন হচ্ছে কাফের বা অবিশ্বাসী। কুরআন অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সলা করে না তারা কাফের বা অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা নানা দেবদেবীর পূজা করে সেই সব দেবদেবী আল্লাহ্র অংশীদার বলে গণ্য হয়। সেই জন্য দেবদেবীর পূজারীদের বলে মুশরিক। মুশরিকরা হচ্ছে বিশেষ ধরনের কাফের, যারা সবচেয়ে ঘৃণ্য। ভারতবর্ষে হিন্দুরা মুসলমানদের চোখে সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রাণী। ইসলামের চোখে গোটা পৃথিবীই মুসলমানদের *প্রতিশ্রুতভূমি*। কুরআন আল্লাহ্র বাণীর সংকলন। হাদিশ হচ্ছে ইসলামের প্রবর্তক ও নবী হজরত মুহাম্মদের কর্ম ও বাণীর সংকলন। কুরআন ও হাদিশ দুটিই মুসলমানদের অবশ্য-মান্য গ্রন্থ। ইসলাম অনুসারে পৃথিবীর প্রথম মুসলমান হলেন আব্রাহাম বা ইব্রাহিম।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে যখন হর্ষবর্ধন রাজত্ব করছেন(৬০৬-৬৪৭) তখন আরব উপদ্বীপের হেজাজের মক্কা শহরে হজরত মুহাম্মদ (৫৭১-৬৩২) আরবী ইসলামের প্রবর্তন করেন। খ্রিষ্টানীর মত সেমীয় ইসলামেরও উৎস ওল্ড টেস্টামেন্টবা হিব্রু বাইবেল। কুরআনের বহু প্রত্যাদেশ বাক্য বা আয়াতে তা বিধৃত। যেমন :

তোমরা বলো, "আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি, এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, এবং যা তাঁদের প্রতিপালকদের নিকট থেকে ঈসা, মুসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হয়েছে, আমরা তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী।"

আরবী ভাষায় 'ইসলাম' কথাটির অর্থ আত্মসমর্পণ —সুরা আল-ই ইমরাণের ১৯ ও ২০ নং আয়াত অনুযায়ী অবিশ্বাসীদের সঙ্গে হিসাব চোকানোর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পিত মানুষটির নাম মুসলিম এবং তার বিশ্বাস এবং আচরণীয় কর্ম সমুচ্চয়ের নাম ইসলাম। জাতি গোত্র ভাষা যাই হোক না কেন, আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণকারী মাত্রই মুসলিম, এই তত্ত্বের ভিত্তিতে ইসলাম বিশ্বজুড়ে উম্মা বা সঙ্ঘ সৃষ্টি করেছে। মিল্লত বা ইসলামী জাতি সৃষ্টি করেছে আল্লাহ্ ও তাঁর দূত হজরত মুহাম্মদকে প্রেরিত আল্লাহ্‌র বাণীকে কেন্দ্র করে।

ইসলাম বিশ্বাসীদের নিম্নলিখিত তত্ত্বে বিশ্বাসী হতে হয় :

(১) ঈশ্বরের একত্ব

(২) দেবদূতগণের অস্তিত্ব

(৩) অনুপ্রাণিত ধর্মপুস্তকসমূহ

(৪) অনুপ্রাণিত পয়গম্বরসমূহ

(৫) শেষ বিচারের দিন

(৬) আল্লাহ্‌র বিচারদান

পয়গম্বর, রসুল বা নবী (আল্লাহ্‌র দূত) হজরত মুহাম্মদের জন্ম মক্কায় ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে এপ্রিল। মাতা আমিনা বিন্ত ওয়াহাব, পিতা কোরেশ বণিক উপজাতির হাসিমী গোষ্ঠির আবদুল্লা। মক্কা ঐ সময় পশ্চিম আরবের একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ও তীর্থনগরী, জন সংখ্যা পাঁচ হাজারের মত। তীর্থনগরীর কেন্দ্রবিন্দু একটি কালো ঘনাকৃতি মন্দির 'কাবা' ও তার বাহিরের দেওয়ালস্থিত একটি কালো পাথর — যেটি সম্ভবতঃ একটি উল্কাপিণ্ড। এছাড়া ঐ তীর্থক্ষেত্রে ছিল ৩৬০ টি ছোটবড় দেবদেবীর মূর্তি। বহুশতাব্দী ধরেই যাবাবর বেদুইনরা সর্বাস্তিবাদী ছিল। বড় বড় গাছ ও পাথরকে পবিত্র জ্ঞান করে সেটিকে কেন্দ্র করে দেবস্থান প্রতিষ্ঠা করতো তারা। কাবা ছিল এমনই এক তীর্থস্থান।

মুহাম্মদ প্রায়ই মক্কার নিকটবর্তী হেরা পর্বতের এক গুহার মধ্যে ধ্যানে বসতেন। এইরকমই এক ধ্যানের মধ্যে চল্লিশ বছর সাত মাস বয়সে তিনি শুনলেন দেবদূত জিব্রাইলের মারফৎ প্রেরিত দৈববাণী — মুহাম্মদ তুমি আল্লাহ্‌র দূত। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ শে জুলাই রাতে তিনি ঐ 'ওহী' বা প্রত্যাদেশ লাভ করেন। এরপর থেকে দীর্ঘ কুড়ি বছরেরও বেশী সময় ধরে তিনি জিব্রাইলের মারফৎ সুললিত ছন্দোবদ্ধ গদ্যে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ লাভ করতে থাকেন। শেষ প্রত্যাদেশ আসে তাঁর মৃত্যুর ন দিন আগে। এই সমস্ত প্রত্যাদেশ তাঁর অনুচরেরা

সর্বদা লিখে রাখতে থাকেন তাল পাতা, উটের হাড়, চামড়ার ফালি ইত্যাদিতে। এগুলি সংকলিত হয় ১১৪ টি সুরা বা অধ্যায়ে, ৬৬৬৬ টি বচন বা আয়াতে। এই সংকলিত মহাগ্রন্থই কুরআন। ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মুহাম্মদ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন সমস্ত প্রতিমাপূজা ত্যাগ করে সর্বব্যাপী বিশ্বজগতের প্রতিপালক পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করতে। ধনী ব্যক্তিদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, তঞ্চকতা ও কৃপণতার সাহায্যে সঞ্চিত ধনরাশি শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

যেহেতু মুহাম্মদের প্রচারিত একেশ্বরবাদের অবস্থান প্রচলিত সর্বাস্তিবাদের বিরুদ্ধেএবং মক্কার বহু বণিকের ব্যবসায়ের উৎস ছিল কাবাভিত্তিক তীর্থক্ষেত্রের তীর্থযাত্রীদল, সেহেতু মক্কার বণিকসমাজ স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী হয়ে উঠলো মুহাম্মদের। বিশেষতঃ যেহেতু ঐ সময়ে উদ্ভাসিত কুরআনের বহু আয়াতই ছিল প্রতিমাপূজকদের প্রতি অভিশাপপূর্ণ।

মুহাম্মদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছলো যে মুসলিমরা যত্রতত্র আক্রান্ত হতে লাগলেন; যদিও মুসলিমদের মোট সংখ্যা তখন মাত্র একশোর মত। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ইয়ারসিব মরূদ্যানের খাজরাজ উপজাতির কয়েকজন মানুষ কাবায় তীর্থ করতে এলো। অ্যারেমীয় ভাষায় ঐ মরূদ্যানকে বলা হতো মেদিন্তা বা নগর। মেদিন্তা পরে পরিবর্তিত হয়ে 'মেদিনাৎ অল নবী' বা মদিনা হয়। মদিনা মক্কার ৩৬০ কিমি উত্তর পূর্বে অবস্থিত। খাজরাজ উপজাতির মানুষগুলি মুহাম্মদের সঙ্গে আলাপে প্রীত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। তারাই পরে ফেরার পথে আরও কয়েকজনকে দীক্ষা দিল নতুন মতে।

পরের বছর খাজরাজ উপজাতির মানুষগুলি আবার এলো মক্কায়। সঙ্গে নিয়ে এলো বেশ কয়েকজন নবদীক্ষিতকে। তাদের মধ্যে দুজন আবার আউস উপজাতির। মদিনায় আউসদের সঙ্গে খাজরাজদের বিবাদ চলছিল বহুদিন ধরে। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে ৭৫ জন মদিনাবাসী মুসলিমদের সঙ্গে মুহাম্মদের একটি গোপন বৈঠক হলো। ঐ বৈঠকে স্থির হলো মক্কার মুসলিমরা যদি মদিনায় চলে যায় তবে মদিনাবাসীরা তাদের আশ্রয় দেবে এবং রক্ষা করবে। এরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে মক্কার মুসলিমরা ছোট ছোট দলে মদিনায় চলে যেতে লাগলো। সবশেষে মদিনায় উপস্থিত হলেন হজরত মুহাম্মদ ও তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী আবু বকর। ঐ সময় হজরত মুহাম্মদকে হত্যার চেষ্টা চলছিল। কারণ, তাঁকে যে কাকা রক্ষণ করতেন, সেই প্রতিমাপূজক কাকার মৃত্যু ঘটেছিল।

মদিনায় বিরোধরত আউস ও খাজরাজ উপজাতির মানুষরা মধ্যস্থ হিসাবে মুহাম্মদকে বরণ করে নিল। উভয় উপজাতিই সম্পূর্ণভাবে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরে বিরোধের অবসান ঘটলো। এখন তারা সবাই ইসলামে বিশ্বাসী;সুতরাং ভাই ভাই। মুহাম্মদ মক্কাবাসী উদ্বাস্তুর সঙ্গে এক একজন মদিনাবাসী আনসারের (সহায়ক) ভ্রাতৃত্ব পাতালেন। চিত্রটা বাস্তব করার জন্য নিজেই জোড় পাতালেন আলির সঙ্গে (মতান্তরে উসমান)। ভ্রাতৃত্ব শুধুমাত্র

হৃদয়ের নয়, একজনের মৃত্যুর পর অন্যজন তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন। আবদুর রহমান নামক এক মক্কাবাসী ভ্রাতৃত্ব পাতালেন মদিনার সাদ ইবন অল আরাবীর সঙ্গে। আরাবী বন্ধুত্বে এমনই পাগলপারা যে নিজের দুই স্ত্রীর মধ্যে আবদুর রহমানের পছন্দমত একটিকে বন্ধুকে দিয়ে দিলেন। অসুবিধা নেই, নারী ইসলামে গরুছাগলের মত অস্থাবর সম্পত্তি! ক্রমে ক্রমে নানাবিধ তৎপরতার মাধ্যমে মুহাম্মদ মদিনার সামরিক ও বে-সামরিক শাসনকর্তা হয়ে উঠলেন।

মদিনাতে হজরত মহাম্মদ ইসলামী উম্মা ও দার-উল-ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করলেন। এক লিখিত দলিলে তিনি বললেন : প্রথমতঃ ইসলামে বিশ্বাসীরা (মুমিনরা) ও তাদের পরিজনেরা একটি সামাজিক সঙ্ঘ বা উম্মার অন্তর্ভুক্ত হলো। দ্বিতীয়তঃ উম্মার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠি তাদের সদস্যদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে। তৃতীয়তঃ উম্মার সদস্যরা এককাট্টা থাকবে যাবতীয় অপরাধের বিরুদ্ধে। কোনও নিকট আত্মীয় অপরাধে অভিযুক্ত হলেও কোনও নমনীয়তা দেখাবে না। চতুর্থতঃ উম্মার সদস্যরা ইসলামে অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও শান্তিতে সর্বদা ঐক্যবদ্ধথাকবে। শেযতঃ উম্মার সদস্যদের মধ্যে যদি কোনও কারণে মতবিরোধ দেখা যায় তবে তা নিষ্পত্তির জন্য আল্লাহ্ ও মুহাম্মদের নিকট দাখিল করতে হবে।

এর আগে মক্কায় থাকাকালীনই নাজিল হওয়া কুরআনের বাক্যে তাঁর অনুসারীর সঙ্ঘ বা উম্মার সঙ্গে ধর্মকে একাত্ম করা হয়েছে; মক্কার প্রতিমাপূজকরা হয়েছে সেই দলের বহিঃস্থ। বলা হয়েছে, উম্মা একই ধর্মের (কুরআন,২১/৯২)। সুতরাং উম্মার সৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টি করা হলো এক ধর্মভিত্তিক জাতির, যারা প্রতিমা পূজকদের থেকে ও অন্যান্য অবিশ্বাসীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই জাতির নাম মিল্লত। সুতরাং ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের জন্মের বহু আগে আরবের মরুভুমিতে এক ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়।

কতকগুলি যুদ্ধ জয়ের ফলে মুহাম্মদ তাঁর ইসলামী সাম্রাজ্য প্রসার করতে সক্ষম হলেন। বিশেষ করে হিজরীর দ্বিতীয় বৎসরে বদরের যুদ্ধেস্বল্পসংখ্যক (৩১৩ জন) মুসলিমের হাতে বহু সংখ্যক (১০০০ জন) প্রতিমাপূজকদের পরাজয়ের ফলে প্রতিমাপূজকদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। এই যুদ্ধে মৃত্যু হয় মুহাম্মদের সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জাহালের। এর পরে কয়েকটি ছোটবড় যুদ্ধের পরে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের জানুযারী মাসে মুহাম্মদ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করলেন আদি নিবাস মক্কা। তার আগেই প্রতিমাপূজক নেতা আবু সুফিয়ান বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সুতরাং মনোবলহীন প্রতিমাপূজক কোরেশরা ধ্বংস হয়ে গেল; পতন ঘটলো মক্কার। কাবা প্রাঙ্গণে অবস্থিত তিনশো ষাটটি দেবদেবীর মূর্তি উপড়ে ফেললেন তিনি। অবশিষ্ট ধৃত প্রতিমাপূজকরা তাঁর সামনে দিয়ে অভিবাদন জানাতে জানাতে যেতে বাধ্য হলো। কাবার সেই বিখ্যাত কালো পাথরকে ছড়ি দিয়ে ছুঁয়ে ধ্বনি দিলেন মুহাম্মদ, আল্লাহু আকবর! ইসলামের চিরন্তন রণধ্বনি।

হজরত মুহাম্মদের এই কাবার মূর্তি ধ্বংস পরবর্তীকালে মুসলিমদের মূর্তি ও মন্দির ধ্বংসের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের যুক্তি পয়গম্বরের ঐ কাবার মূর্তি ধ্বংসের নজির।

সর্বাস্তিবাদী যাযাবরদের ধরে ধরে মুসলিম করার ফলে দিনে দিনে স্ফীত হতে লাগলো মুসলিমদের সংখ্যা। এছাড়া স্বেচ্ছায় আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশ থেকে দলের পর দল লোক এসে ঐশ্লামিক উম্মার সদস্য হবার জন্য মুহাম্মদের কাছে আবেদন জানালো। এইভাবে আরবদেশে সেই সময় বিরাজিত ইহুদী ও খ্রিষ্টানধর্ম থেকে কিঞ্চিত পৃথকভাবে বিকশিত হতে লাগলো ইসলাম। যদিও ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মের কথা বারবার উল্লিখিত হলো কুরআনে। ঐতিহাসিক বার্ণার্ড লুই এর মতে ইসলাম বিকশিত হলো একটি রাষ্ট্ররূপে, পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদ হলেন সেই রাষ্ট্রের সেনাপতি, রাজস্ব সংগ্রাহক, অধিকর্তা এবং প্রধান বিচারক।

হজরত মুহাম্মদ উপলব্ধি করলেন, ইসলামী উম্মাকে চিরজীবী করার জন্য নব দীক্ষিতদের এমন কিছু আচার আচরণে বেঁধে রাখা দরকার যেগুলি তাদের প্রাত্যহিক জীবনকে স্পর্শ করবে। নিত্যদিন স্মরণ করিয়ে দেবে যে তারা ইসলামে বিশ্বাসী। ফলে তিনি প্রবর্তন করলেন ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের : কালেমা, রোজা, নামাজ, জাকাত ও হজের।

কালেমা হলো ইসলামের মূল স্তম্ভ। একজন মুসলিমকে নিত্য উচ্চারণ করতে হয় কলেমা — লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (আল্লাহ্ ছাড়া কোনও দেবতা নেই, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র দূত)। ইসলাম গ্রহণের জন্য কয়েকজন সাক্ষীর সম্মুখে উপরোক্ত কালেমা উচ্চারণ করাই যথেষ্ট।

নামায বা প্রার্থনা ব্যক্তিগত ভাবেই করা যায়। সঙ্ঘবদ্ধভাবে মসজিদেও করা যায়। তবে শুক্রবারের নামায সর্বসমক্ষে মসজিদে করাই বাঞ্ছনীয়। নামায যিনি পরিচালনা করেন তিনি মসজিদের ইমাম। নামায পড়া খুব একটা সোজা ব্যাপার নয়। এটা হিন্দুদের পূজা করার মতোই একটা বিস্তৃত পদ্ধতি—যা সবাই একসঙ্গে করা হয়।

জায়নামায হচ্ছে নামায পড়ার জন্য বিশেষ আসন। শুক্রবারের নামাজ জনসমক্ষে মসজিদে পড়াই পুরুষদের পক্ষে প্রশস্ত। নামায পড়ার সময় সবাই একসঙ্গে নির্দেশ অনুযায়ী কখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, কখনও ঝুঁকে, কখনও হাঁটু গেড়ে বসে, আবার কখনও বা শুয়ে পড়ে মন্ত্র পড়েন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের একই স্থলে একই সঙ্গে নামায পড়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য হলেও সবাই সবাইকে আপন ভাবতে পারেন। ফলে তাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়। এছাড়া, সৈন্যবাহিনীর প্যারেডের মত সবাই একসঙ্গে ওঠাবসার মধ্যে এক ধরনের শৃঙ্খলা ও একাত্মতা গড়ে ওঠে।

মুসলিম পর্ব ইদ-উল ফিতর ও ইদ-উল আজহায় বিশেষ নামাযের শেষে মুসলমানরা যে খুতবা পড়েন তাতে বলেন : "হে আল্লাহ্, ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের চিরকাল জয়যুক্ত করুন। আর অবাধ্য কাফের বেদআতী ও মোশরেকদের সর্বদা পদানত এবং পরাস্ত

করুন। হে আল্লাহ্! যে বান্দা তোমার আজ্ঞাবহ হবে, তার রাজ্য চির অক্ষয় রাখুন, তিনি রাজার পুত্র রাজা হউন, কিংবা খাকান (দরিদ্র) পুত্র খাকান হউন, ...হে আল্লাহ্! আপনি তাকে সর্ব দিক দিয়া সাহায্য করুন, ...হে আল্লাহ্! আপনি তাহার পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। তাঁরই তরবারী দ্বারা – বিদ্রোহী, মহাপাতকী, অবাধ্যদের মস্তক ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন। ....হে আল্লাহ্ আপনি ধ্বংস করে দিন কাফেরদের, বেদাআতী ও মোশরেকদের।"[৫]

জাকাত হলো দান : গরীব দুঃখীদের, দেনদারদের, জেহাদের জন্য তহবিলে, ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য ও তীর্থ করার জন্য। একজন মুসলিমের আয়ের শতকরা আড়াই টাকা জাকাত করা বিধেয়।

রমজান মাসে মুসলিমরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা বা উপবাস পালন করেন। খাদ্য পানীয় গ্রহণ বা রমণ কিছুই করেন না। সুর্যাস্তের শেষে উপবাস ভাঙেন।

যাদের আর্থিক সামর্থ আছে তারা হজ করতে পারেন। জেলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে হজ করা বিধেয়। হজ শুরু হয় কাবা প্রদক্ষিণ করতে করতে। শেষ হয় মীনা নামক স্থানে পশু কোরবানী করে। এর মধ্যে আরাফত ও মুজদিলফাতে নামাজও আছে। হজের মাধ্যমে ইসলামী উম্মা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়। বর্তমানে প্রায় কুড়ি লক্ষ মুসলিম প্রতিবছর হজ করেন। হজরত মুহাম্মদ শেষবার কাবা দর্শনের পর হজের বিধান দেন। ঐ সময়ে তিনি ছিলেন ক্ষমতার শিখরে। আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ– দেশের সবচেয়ে সম্মানীয় ধর্মগুরু। বেদুইন উপজাতির মানুষরা, যারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করতো তারা এখন ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত।

প্রতিটি সেমীয় ধর্ম কানান জয় করতে চায়। ইসলামও জমি দখলের তত্ত্ব। ইসলামের কাছে কানান প্রদেশ হলো গোটা বিশ্ব। ইসলাম বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখে। কুরাআনে আছে : 'এবং তোমরা (ইসলামবিশ্বাসীরা) তাদের (অমুসলমানদের) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না অধর্ম দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র ধর্ম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়......." (কুরআন, ৮/৩৯)। এই কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বলে জেহাদ। ইসলামের মর্মবাণী হচ্ছে দ্বিতীয় সুরার ৯৮ নং আয়াত : "নিশ্চয় আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের শত্রু।"

দেখা যাচ্ছে, ইসলামি বিধাতাই অবিশ্বাসীদের শত্রু। শত্রুর নিপাতই কাম্য। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়া যায় শুধুমাত্র তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের দ্বারা। এই আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম। সুতরাং কাফেরদের মৃত্যুই সর্বদা কামনা করে মুসলমানরা। কাফেরদের নিকেশ করে দুনিয়াটা তো দখল করতে হবে। তবে, এখন মধ্য যুগ নেই; এখন গণতন্ত্রের যুগ। এখন সব সময় তরোয়াল দিয়ে জেহাদ করার প্রয়োজন হয় না। যারা সংখ্যায় বেশী তারাই গণতন্ত্রে রাজত্ব করে। পরিবার পরিকল্পনা না করে গুচ্ছের সন্তান সৃষ্টি করলেই রাজত্ব পাওয়া যায়।

আবার সংখ্যালঘু বলে কাঁদুনি গেয়ে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও চাকরী ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ পাওয়া যায়। তাই দিয়ে বহু সন্তান প্রতিপালন করা সম্ভব। হিন্দুদের মতো প্রতিমাপূজকদের বিরুদ্ধেঅনেক বাণীই আছে কুরআনে। সেগুলি সবার জানা প্রয়োজন। প্রতিটি সেমীয় ধর্মই হিন্দুদের পক্ষে ক্ষতিকর। এসব না জেনে এই ধর্মগুলিকে ভিত্তি করে একেশ্বরবাদী ধর্মতত্ত্ব বানানো হলো কাছা খুলে মনের আনন্দে বাস করা আর যে গাছের যে ডালে বসে আছি সেই ডাল কাটা।

এখন একজন হিন্দু হিসাবে ইসলাম ধর্মের কিছু সত্য পাঠকের কাছে তুলে ধরছি। বাঙলা ভাষায় কুরআন প্রথম অনুবাদ করেন একজন ব্রাহ্ম, গিরীশ চন্দ্র সেন। বলা বাহুল্য তিনি একজন কাছাখোলা বাঙ্গালী।

কুরআন অনুবাদ প্রসঙ্গে গিরিশ চন্দ্র লিখেছিলেন, "অন্যদি আনুকুল্য নিরপেক্ষ হইয়া শুদ্ধ তফসিরাদি গ্রন্থের সাহায্য লইয়া ক্রমশঃ পড়িয়াছি ও অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছি।"

গিরিশচন্দ্র যে সময় কুরআন অনুবাদ করেছিলেন সেই সময় কুরআন ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন জর্জ সেল ও জে এম রডওয়েল। তিনি নিজের অনুবাদের সঙ্গে এঁদের অনুবাদ মিলিয়ে দেখতে পারতেন। আবার কোনও আরবী জানা মুসলমানের সঙ্গেও অনুবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারতেন। তিনি দুটির কোনওটাই করেন নি। ফলে ভদ্রলোক অজস্র বিভ্রান্তিতে জড়িয়েছেন কুরআন অনুবাদের সময়। মূল গণ্ডগোল হচ্ছে ইসলামি গড আল্লাহ্‌কে গিরিশ চন্দ্র 'ঈশ্বর' লিখেছেন। 'ঈশ্বর' সগুণ ব্রহ্মের নাম; অর্থাৎ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা। কুরআন আল্লাহ্‌র বাণীর সংগ্রহ; সগুণ ব্রহ্মের বাণীর সংগ্রহ নয়। এই ঈশ্বর কথাটি এখনও বহুলোক বলেন ও জানেন। আমাদের গাঁধীর ভজন আছে, ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম, সবকো সন্মতি দে ভগবান। ঈশ্বর ও আল্লাহ্ পৃথক বিধাতা। আল্লাহ্ শুধুমাত্র মুসলমানদের বিধাতা।

এখন আমাদের 'অবিশ্বাসী' বা কাফের শব্দটির ইসলামি সংজ্ঞার্থ জানা প্রয়োজন। কুরআনের পঞ্চম সুরা মায়েদাহ্‌র ৪৪ নং আয়াতের শেষে আছে, "এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অবিশ্বাসী।" আল্লাহ্ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন; কুরআন অনুযায়ী যারা বিচার বিবেচনা করে না তারা অবিশ্বাসী। কুরআনে আছে, আল্লাহ্ ছাড়া দেবতা নাই; মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র দূত। এই কথা (কালিমামন্ত্র) তিন বার সাক্ষীর সামনে উচ্চারণ করলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। আমরা কি এই কথাগুলি বিশ্বাস করি? করিনা। গিরিশচন্দ্রও করতেন না। সুতরাং আমরা কাফের বা অবিশ্বাসী।

তৃতীয় সুরা আল-ই-ইমরাণের ৮৫ নং আয়াতে আছে, "এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।" চতুর্থ সুরা নিসার ২৪ নং আয়াতটি গুরুত্বপূর্ণ। ঐ আয়াতের প্রথমে আছে, "এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এ আল্লাহ্‌র বিধান।"

এই আয়াতে বলা হয়েছে, বিধর্মীর সধবা নারীকে ধর্ষণ করার কথা। যুদ্ধেবা দাঙ্গায় ধরে আনা প্রতিমাপূজক নারী সধবা-বিধবা যাই হোক না কেন, তাকে ধর্ষণ করা ইসলামবিহিত কর্ম। ২৩ তম সুরা মোমেনূনের ১,৫,৬ আয়াতে বলা হয়েছে, "বিশ্বাসীরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে অন্যথায় তারা নিন্দনীয় হবে না।"

সহী মুসলিমের ৩৪৩২ নং হাদিশে ইসলামি বিধিটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণিত। "হজরত আবু সয়ীদ হইতে বর্ণিত আছে। রসল্লুলাহ্ হুনাইনের যুদ্ধের তারিখে আওতাসের দিকে এক সৈন্যদল পাঠাইলেন। তাহারা শত্রুর সম্মুখীন হইল এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিল, অবশেষে তাহাদের উপর জয়ী হইল এবং বহু যুদ্ধ বন্দিনী লাভ করিল। অতঃপর নবী করিমের সাহাবীদের মধ্যে কিছু লোক বন্দিনীদের মুশরিক স্বামী থাকার কারণে তাহাদের সাথে সহবাস করাকে দুষনীয় মনে করিতে লাগিলো। তখন আল্লাহ্‌তালা এ ব্যাপারে আয়াত নাজিল করিলেন।"

এখানে সাহাবী হচ্ছে হজরত মুহাম্মদের সহচর; মুশরিক অর্থ প্রতিমাপূজক। নাজিল অর্থ উদ্ভব। নাজিল হওয়া আয়াতটি উপরোক্ত ৪/২৪।

চতুর্থ সুরার ৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "যারা আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখন ওর স্থলে নূতন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করতে পারে।"

৪ নং সুরার ১০১ নং আয়াতে আছে, "অবিশ্বাসীগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" অষ্টম সুরার ৪১ তম আয়াতে বলা হয়েছে, "আরও জেনে রাখো যে যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করো তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসুলের, রসুলের স্বজন, পিতৃহীন দরিদ্র এবং পথচারীদের জন্য,"

এই আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে দাঙ্গা ও জেহাদে লুঠ করার প্রেরণা ধর্ম থেকেই আসে। লুঠের মালের ৮০ শতাংশ লুঠেরাদের প্রাপ্য। লুঠের মালের মধ্যে বিধর্মীর স্ত্রী-কন্যারাও আছেন।

কুরআনের ৩৩ নং সুরাটি বিখ্যাত পর্দার আয়াতের জন্য। এটির নাম সূরা আহ্‌যাব। এর ৫৯ নং আয়াতটি হলো, "হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের মুখমণ্ডলের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না।" গিরিশচন্দ্র আয়াতটি ঠিকঠাক অনুবাদ করলেও ভাষ্য দিয়েছেন, "অর্থাৎ অবগুণ্ঠাবৃত হইলে দাসী নয়, ভদ্রমহিলা, নীচ কুলোদ্ভবা নয় সৎকুলোৎভবা, দুশ্চরিত্রা নয় সচ্চরিত্রা ইহা জানা যাইবে। দুশ্চরিত্র লোকেরা তাহা হইলে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে সাহসী হইবে না। অবগুণ্ঠন ইহার চিহ্ন রহিল।"

বাংলা করে বলতে গেলে এই আয়াতে পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে অবিশ্বাসী নারীদের শ্রীলতাহানি করা যেতে পারে। কারণ, বিপরীতে দুশ্চরিত্র পুরুষদের সম্পর্কে কোনও সাবধান বাক্য উচ্চারণ করা হয়নি।

এরপর চলে যাই ৪৭ তম সুরা মুহাম্মদে। এর ৪ নং আয়াত হলো, "অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা ওদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন ওদের মজবুত করে বাঁধবে, অতঃপর তোমরা ইচ্ছা করলে ওদের মুক্ত করে দিতে পার অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা যুদ্ধ চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র সংবরণ করে। এটিই বিধান। এ জন্য যে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ওদের শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান এককে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তিনি কখনই তাদের কাজ বিনষ্ট হতে দেন না।"

ঐ সুরারই ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে,"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, কিন্তু যারা তা অবিশ্বাস করে, ভোগবিলাসে মগ্ন থাকে থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে তাদের নিবাস জাহান্নমে।

কুরআনের ৯৮ তম সুরার ৬ নং আয়াত বলেছে, "গ্রন্থধারী ও অংশবাদীদের যারা অবিশ্বাস করে তারা জাহান্নমের আগুনে স্থায়ীভাবে বাস করবে; ওরাই তো সৃষ্টির অধম।" এখানে গ্রন্থধারী বলতে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের বোঝাচ্ছে। কারণ, খ্রিষ্টানদের বাইবেল ও ইহুদীদের তোড়া (ওল্ড টেস্টামেন্টের অংশবিশেষ) ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত। আর অংশবাদী অর্থ প্রতিমাপূজক। এককথায় বলতে গেলে এই আয়াতে সমস্ত অমুসলমানদের নরকস্থ করা হয়েছে এবং তাদের সৃষ্টির অধম জন্তু বলা হয়েছে।

এর পরে চলে যাই ভারতে মন্দির সভ্যতার পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক আয়াতে। সেটি ৯ ম সুরা তওবার ৫ নং আয়াত ঃ "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের (পড়ুন, প্রতিমাপূজকদের) যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা (অনুতাপ) করে, যথাযথ নামাজ পড়ে ও জাকাত দেয়(দান করে) তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে।" এই আয়াত 'তরবারীর আয়াত' (আয়াত-উস-সৈফ) নামে খ্যাত।

সারা কুরআন জুড়ে অজস্র অভিসম্পাত বর্ষণ করা আছে কাফেরদের প্রতি।

এই হচ্ছে খ্রিষ্টানী আর ইসলাম। এই সব আব্রাহামীয় ধর্মগুলি হচ্ছে প্রবৃত্তিধর্ম—এই ধর্মগুলিতে মানুষ পরকালে হয় স্বর্গ বা নরকে যায়। আব্রাহামীয় ধর্মগুলিতে এই স্বর্গ বা নরকবাস চিরকালের জন্য। এইসব ধর্মে মোক্ষ বলতে কিছু নেই। কিন্তু হিন্দুধর্মে নিবৃত্তির ব্যাপার আছে। সাধারণ ধার্মিক সংসারী মানুষরা মৃত্যুর পর কৃতকর্ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বর্গে বা নরকে

যায়। স্বর্গ বা নরকবাস শেষ হলে আবার জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে। এই জন্মমৃত্যুর চক্র চলতেই থাকে। তাই যাঁরা যোগী তাঁরা এই জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে রেহাই পেতে চান। তাঁরা চান মোক্ষ। মোক্ষলাভ করলে কেউ আর জন্মগ্রহণ করেন না। তাই হিন্দুধর্মের কথা বলতে গেলে মোক্ষের কথা বলতেই হয়।

ইসলামি স্বর্গের সেরা বর্ণনা আছে কোরানের সুরা ওয়াকিয়াতে। সেখানে বলা হয়েছে "যারা ডান দিকে থাকবে তারা থাকবে সুখদ উদ্যানে। তারা স্বর্ণখচিত আসনে বসবে হেলান দিয়ে। পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরকিশোররা। পানপাত্র, সুরা ও প্রস্রবণনিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। সেই সুরাপানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারা হবেনা। ওরা পরিবেশন করবে তাদের পছন্দমত ফলমূল। এবং তাদের ঈপ্সিত মাংস। সেখানে তাদের সঙ্গে থাকবে আয়তলোচনা হুর (অপ্সরা)। তারা দেখতে সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ। তাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ। সেখানে তারা অসার বা পাপবাক্য শুনবে না। কেবল শুনবে 'সালাম' (শান্তি) আর 'সালাম'। যারা ডান পাশে থাকবে তারা কত ভাগ্যবান। তারা থাকবে উদ্যানে, যেখানে থাকবে কন্টকহীন বদরীবৃক্ষ। কাঁদি কাঁদি কলা। সম্প্রসারিত ছায়া। প্রবহমান পানি ও পর্যাপ্ত ফলমূল। যা শেষ হবেনা এবং নিষিদ্ধও হবেনা। তাদের জন্য থাকবে সম্ভ্রান্ত শয্যাসঙ্গিনী, ওদের আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে — ওদের করেছি চিরকুমারী। সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।"

এই স্বর্গ দেহজ ভোগবাদের চরম।

এখন রামমোহন ধর্ম নিয়ে কি করলেন? তিনি প্রতিমাপূজার বিরোধিতা করলেন। বললেন এটা 'পৌত্তলিকতা'। অথচ বেদে প্রতিমাপূজার ইঙ্গিত রয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩০ নং সূক্তের তৃতীয় শ্লোকে প্রতিমা শব্দটি আছে : "যেকালে সকল দেবতা দেবপূজা করলেন তখন তাঁদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিমাণ কি ছিল? প্রতিমাই বা কি ছিল?"

বিখ্যাত পুরুষ সুক্তে বিধাতাকে হাত-পা--মাথা যুক্ত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং বেদের আমল থেকেই প্রতিমাপূজা ভারতে প্রচলিত ছিল। ছিল ঈশ্বরের রূপবর্ণনা।

ব্রাহ্ম ধর্মের বীজ বপন করেছিলেন রামমোহনই। প্রথমে তিনি কেরী সাহেবের মুন্সি রাম রাম বসুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাইবেল পড়েন। রামরাম বসু নিজে আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ না করলেও মানসিকভাবে খ্রিষ্টান ছিলেন। তিনিই 'পৌত্তলিকতা' বাঙ্গলা শব্দটি সৃষ্টি করেন। তিনিই ১৮০০খ্রিষ্টাব্দে 'পৌত্তলিকতা'র বিরুদ্ধেএকটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। রামমোহন বাইবেল পড়েই যিহোভার প্রতিমাপূজা বিরোধী তত্ত্ব জানতে পারেন। জানতে পারেন যিহোবার 'দশটি প্রত্যাদেশ'। তিনি গ্রস্ত হন এর দ্বারা। ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাস্ট ডিডে এই প্রত্যাদেশের 'পৌত্তলিকতাবিরোধী' অংশটুকু আছে। রামমোহন কুরআন পড়েন কলকাতার মৌলানাদের কাছে আর্বী শিখে। ফলে তাঁর মনে নিরাকার একেশ্বরবাদের একটি চিন্তা প্রবেশলাভ করে।

কিন্তু তিনি সেমীয় ধর্মের পয়গম্বর (রসুল, নবী, প্রফেট) তত্ত্ব মেনে নিতে পারেন নি;তিনি চেয়েছিলেন শুধু একদেবতা। তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন ফার্সী ভাষায় লেখা পূর্বকথিত 'তুহ্ফৎ-উল-মুওয়াহিদিন' (১৮০৪) নামক পুস্তকে। বস্তুত, তিনি এক যুক্তিযুক্ত একদেবতাবাদের অন্বেষণ করছিলেন। পরে যখন তিনি পশ্চিমী জগতের সঙ্গে পরিচিত হন, তখন দেখেন পশ্চিমী জগতেও বহু মানুষ উন্মোচিত ধর্মের বাইরে গিয়ে যুক্তিযুক্ত একদেবতাবাদের কথা চিন্তা করেছেন। তিনি ইউনিটেরিয়ান খ্রিষ্টধর্ম ও ডিইজম এর মধ্যে যুক্তিযুক্ত ধর্ম খুঁজে পেলেন। ইউনিটেরিয়ান খ্রিষ্টধর্ম যিশুকে সাধারণ মানুষ বলেই মনে করে, 'আমি ও আমার পিতা এক' এ ধরনের বাক্যে বিশ্বাস একেবারেই করেনা। আর ডিইজম শুধু একজন সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্বীকার করে;এর বেশী কিছু নয়।

হয়তো রামমোহনের চিন্তা ছিল মহৎ। তিনি একটি বিশ্বজনীন ধর্মের মাধ্যমে বিশ্ব থেকে নরঘাতী সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন। মানুষকে করতে চেয়েছিলেন যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান-মনস্ক। তিনিই প্রথম হিন্দু যিনি কুরআন পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি বাইবেল খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পড়েছিলেন, এমন কথা বলা যাচ্ছে না। তিনটি সেমীয় ধর্মই যে আদতে জমি দখলের তত্ত্ব, তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তিনি ধারণার মধ্যে আনতে পারেন নি যে জমি দখল করতে গিয়ে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বজুড়ে ব্যাপক নরহত্যা সংঘটিত করেছে। তিনি দেখতে পান নি প্রতিমাপূজা বিরোধী সেমীয় একেশ্বরবাদের বিষদাঁত।

'প্রার্থনাপত্র' তে তিনি কারও উপর দ্বেষভাব না করতে উপদেশ দিয়েছেন। "তাহাদিগ্যে দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়;" এই মনোভাব নির্বুদ্ধিতা বললে হয়তো তাঁকে অসম্মান করা হয়;কিন্তু অনৃতভাষণ হয় না। এই মনোভাবের কারণেই মিশনারী আলেকজান্ডার ডাফ কলকাতায় এসে স্কুল স্থাপন করতে চাইলে রামমোহনই তাকে বাড়ি ঠিক করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরই উত্তরসূরী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডাফের তথাকথিত 'শিক্ষাপ্রসারের' বিরোধিতা করতে হয়েছিল। কারণ, শিক্ষার মাধ্যমেই ডাফ একের পর এক ছাত্রকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খ্রিষ্টান করছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ডাফকে 'করুণা' করতে পারেন নি।

ডাফ ছিলেন কট্টর মৌলবাদী। তাঁর পিতা তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, ভারতবাসীরা পাপের মধ্যে পড়ে রয়েছে। একমাত্র যিশুকে ত্রাণকর্ত্তা বলে স্বীকার করলেই তারা পাপমুক্ত হতে পারে। তাই তিনি কলকাতায় এসে ভারতবাসীকে 'পাপমুক্ত' করার প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। বঙ্গদেশে তখনও পর্যন্ত কোনও উচ্চবর্ণের মানুষ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নি।

হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ছাত্রদের গোমাংস খাইয়ে জাতিচ্যুত করার একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তখন ছাত্ররা হিন্দুধর্ম নিপাতের ধ্বনি তুলছিল। এই অবস্থা বর্ণনা করে ডাফ তাঁর পুস্তকে লিখেছিলেন : ....আমরা এই পরিস্থিতিকে অভিবাদন জানালাম। কারণ,

এই রকম পরিস্থিতির জন্য আমরা বহুদিন ধরে প্রত্যাশা করছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম আর প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম।....যথেষ্ট যে শত্রুরা তাদের দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে এসেছে....।

একদা ঠনঠনিয়ায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তাঁর অনুপস্থিতিতে বন্ধুরা গোমাংস খেয়ে গো-হাড় প্রতিবেশীদের বাড়ীতে ছুড়ে ফেলে। এর পরিণতিতে কৃষ্ণমোহন বাড়ী থেকে বিতাড়িত হন। বিতাড়িত কৃষ্ণমোহনকে আশ্রয় দেন ডাফ। শেষ পর্যন্ত ডাফের কাছে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহনই প্রথম ব্রাহ্মণ সন্তান যিনি বঙ্গদেশে খ্রিষ্টান হয়েছিলেন।

এই হচ্ছে রামমোহনের উদারতার ফল।

রামমোহন শেষ পর্যন্ত তাঁর একদেবতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন উপনিষদের মধ্যে। ব্রহ্মই সেই একদেবতা। রামমোহনের ব্রহ্ম নিরাকার (formless), অনন্ত (infinite), অচিন্ত্য (unthinkable), বিকারহীন (immutable)। তাঁর মূর্তি নির্মাণ করা যাবে না; ছবিও আঁকা যাবে না। বাইবেলের 'টেন কমান্ডমেন্টে' যেমন আছে: Thou shalt not make thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above or that is in earth beneath or that is in the waters beneath the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them: for I the LORD thy god am a jealous God.

(স্বর্গে-মর্ত্যে-পাতালে আছে এমন কোনও কিছুর মূর্তি বা ওই ধরনের কিছু নির্মাণ করবে না। তুমি তাদের কাছে কখনও নত হবে না; কারণ, আমি, তোমাদের প্রভু একজন ঈর্ষাপরায়ণ দেবতা।)

এইভাবে হিন্দুধর্মের মধ্যে সেমীয় ধর্মের তত্ত্ব এনে হিন্দুধর্মকে দূষিত করেছিলেন রামমোহন। এখন উপনিষদের মূল বিষয়বস্তু কী কী জানা যাক:

এক, সর্ববস্তু স্বরূপতঃ ব্রহ্ম

কেন উপনিষদের শান্তিপাঠে আছে :

"সর্ববস্তু স্বরূপতঃ উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই, আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন; তাঁহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নিত্য অবিচ্ছেদ হউক।"

ব্রহ্ম ওম্ শব্দের বাচ্য এবং ওঙ্কার ইহার প্রতীক

ব্রহ্ম পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম

কঠোপনিষদে আছে :

"বেদসমূহ একবাক্যে যে ঈপ্সিত বস্তুর প্রতিপাদন করেন, অখিল তপস্যাদি কর্মরাশি যাঁহার প্রাপ্তির সহায় এবং যাঁহার কামনায় লোকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে, আমি তোমায় সেই প্রাপ্তবস্তুর সম্বন্ধেই উপদেশ করিতেছি—ইহাই ওম্।

অতএব এই ওঙ্কার অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়াত্মক। এই ওঙ্কারকে ব্রহ্ম রূপে উপাসনা করিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই (অর্থাৎ, অপরব্রহ্ম প্রাপ্তি বা পরব্রহ্ম-জ্ঞান) হইয়া থাকে।

ইহাই শ্রেষ্ঠ আলম্বন, ইহাই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম এই উভয় বিষয়ক। এই আলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্ম লোকে মহীয়ান হন। ১।২।১৫-১৭

ঈশোপনিষদের শান্তিপাঠে আছে :

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তি ঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।।

এই শান্তিপাঠের অর্থ, ওঁ উহা (অর্থাৎ পরব্রহ্ম) পূর্ণ, ইহাও পূর্ণ (অর্থাৎ নামরূপস্থ ব্রহ্ম ও) পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদগত হন; পূর্ণের (অর্থাৎ কার্য ব্রহ্মের) পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে পূর্ণই (অর্থাৎ পরব্রহ্ম ই) অবশিষ্ট থাকেন। ও ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

মূল বক্তব্য, পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম (কার্যব্রহ্ম, উপাধিব্রহ্ম, ক্ষর ব্রহ্ম) দুই-ই সমান সত্য।

কেনোপনিষদে আছে,

(১) "বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যিনি উচ্চারিত হন না, যদ্দারা বাগিন্দ্রিয় এবং শব্দ প্রকাশিতহয়, তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান—কিন্তু এই যাঁহাকে লোকে আত্মভিন্নরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাকে নহে।।" ১/৫

(২) "অন্তঃকরণসহায়ে যাঁহাকে লোকে চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু অন্তঃকরণ যদ্দ্বারা উদ্ভাসিত হয় বলিয়া ব্রহ্ম বিদগণ বলিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান—কিন্তু এই যাঁহাকে লোকে আত্মভিন্নরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাকে নহে। ১/৬

(৩) "নয়নের দ্বারা যাঁহাকে কেহ দেখে না, যৎসহায়ে লোকে নয়নবৃত্তিসমূহকে উদ্ভাসিত করে, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান—কিন্তু এই যাঁহাকে লোকে আত্মভিন্নরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাকে নহে।" ১/৭

(৪) "শ্রবণের দ্বারা যাঁহাকে কেহ শুনে না, যদ্দ্বারা শ্রবণ বিষয়ীকৃত হয় (স্ববিষয় প্রকাশে সমর্থ হয়), তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান—কিন্তু এই যাঁহাকে লোকে আত্মভিন্নরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাকে নহে। ১/ ৮

(৫) "ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা কেহ তাহাকে আঘ্রাণ করিতে পারে না, যদ্দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্ববিষয়ে প্রেরিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান—কিন্তু এই যাঁহাকে লোকে আত্মভিন্নরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাকে নহে।"১/৯

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পরব্রহ্ম কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না। অন্য কথায় পরব্রহ্ম অচিন্ত্য।

এবং পরব্রহ্ম অনন্তও : শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে বলা হয়েছে : "যেহেতু পরমাত্মা অনন্ত ও সর্বস্বরূপ, অতএব তিনি কর্তৃত্বহীন। সাধক যখন এই তিনটিকে (অর্থাৎ ভোগ্য, ভোক্তা ও ভোগকে) এই অনন্ত ব্রহ্ম স্বরূপে জানেন (তখন তিনি পাপমুক্ত হন)।"

কঠোপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "ব্রহ্মের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। এই আত্মা কারণান্তর হইতে উদ্ভূত হন নাই, ইহা হইতেও কিছু উৎপন্ন হয় নাই। এই আত্মা জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর নিহত হইলেও তাঁহার নাশ নাই। ১।২।১৮

অর্থাৎ, পরব্রহ্ম বিকারহীন।

কিন্তু ব্রহ্ম বিকারহীন হলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলো কে?

সৃষ্টিকর্ত্তা অপর ব্রহ্ম। তিনি বিকারশীল। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ এর প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আছে :

প্রথমতঃ এই জগৎ পুরুষাকার আত্মা (বা বিরাট) রূপেই ছিল। তিনি আলোচনা করিয়া আপনা হইতে ভিন্ন কিছু দেখিলেন না। তিনি প্রথমে "আমি সেই" এই কথা উচ্চারণ করিলেন। অতএব তিনি "আমি" এই নামধারী হইলেন।

তিনি ভয় পাইলেন। এই জন্য (আজও) লোকে একাকী থাকিতে ভীত হয়। সেই বিরাট চিন্তা করিলেন, "আমা হইতে ভিন্ন কেহ যখন নাই, তখন কাহা হইতে ভয় পাইতেছি?" তাহারই ফলে তাঁহার ভয় দূর হইল, কারণ কাহা হইতে তিনি ভয় পাইবেন? দ্বিতীয় কেহ থাকিলেই ভয় হইতে পারে।

তিনি মোটেই আনন্দিত হইলেন না। এইজন্য (আজও) কেহ একাকী থাকিলে সুখী হয় না। তিনি সঙ্গীর অভিলাষ করিলেন। স্বামী ও স্ত্রী আলিঙ্গিত হইয়া যে পরিমাণ হয়, তিনি সেই পরিমাণ হইলেন। তিনি সেই দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহা হইতে পতি ও পত্নী জাত হইলেন। তিনি তাহাতে উপগত হইলেন। ফলে মনুষ্যগণ জাত হইল।

তিনিও (অর্থাৎ শতরূপাও) আলোচনা করিলেন, "আমাকে আপনা হইতেই উৎপন্ন করিয়া ইনি কিরূপে আমাতে উপগত হইতেছেন? ভাল কথা, আমি তিরোভূতা হই।" তিনি গাভী হইলেন, অপরে (অর্থাৎ মনু) বৃষ হইলেন, এবং তাঁহাতে উপগত হইলেন;তাহার ফলে গরুসকল জাত হইল।

এইভাবেই অপর ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন।

অপর ব্রহ্ম ইচ্ছা করলে রূপবান হয়ে দেবতা বা মানুষকে দেখা দিতেও পারেন। কেনোপনিষদের তৃতীয় খণ্ডে আছে, "(দেবাসুর সংগ্রামে) ব্রহ্মই দেবতাদের জন্য বিজয় করিলেন; সেই ব্রহ্মের বিজয় বশতঃ দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন। (কিন্তু) তাঁহারা মনে করিলেন, "এই বিজয় আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই।"

"ব্রহ্ম ইঁহাদের মিথ্যাভিমান অবশ্যই জ্ঞাত হইলেন। তাহাদেরই মঙ্গলার্থে তিনি নিজেকে যক্ষরূপে তাহাদের ইন্দ্রিয়গোচর করিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতে পারিলেন না যে, এই পূজ্যস্বরূপে যিনি সম্মুখে অবস্থিত তিনি কে। তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন," হে জাতবেদা, তুমি সম্মুখে অবস্থিত যক্ষকে জানিয়া আস যে, ইনি কে। অগ্নি সেই যক্ষসমীপে গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহাকে এইরূপ অভিভাষণ করিলেন—"তুমি কে?" অগ্নি বলিলেন—আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ, আমি জাতবেদা নামেও খ্যাত।" ব্রহ্ম বলিলেন—"তাদৃশ তোমার কি সামর্থ্য?" অগ্নি এই উত্তর দিলেন—"এই যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তৎ-সমস্তই আমি দগ্ধ করিতে পারি।"

"ইহা দগ্ধ কর" বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি পূর্ণোৎসাহজনিত বেগে সেই তৃণ সমীপে গমন করিলেন;কিন্তু উহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি উক্ত যক্ষের নিকট হইতে দেবতাদের সমীপে ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন— "এই পূজনীয়স্বরূপ কে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।

অনন্তর ইন্দ্রকে বলিলেন—" হে মঘবন্, তুমি এই সম্মুখস্থ যক্ষ সম্বন্ধে জানিয়া আস যে, ইনি কে?" "তথাস্তু" বলিয়া ইন্দ্র তৎসমীপে গমন করিলেন। যক্ষ তাহার নিকট হইতে তিরোহিত হইলেন। ইন্দ্র সেই আকাশেই সুবর্ণ-ভূষিতা নারীর ন্যায় অতি সুশোভনা স্ত্রীরূপিনী উমার (বা ব্রহ্মবিদ্যার) সকাশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই পূজনীয়স্বরূপ কে?"

উমা বলিলেন—" ইনি ব্রহ্ম;ব্রহ্মেরই এই বিজয়ে তোমরা আপনাদিগকে মহিমান্বিত মনে করিতেছ। সেই উমাবাক্য হইতেই ইন্দ্র জানিলেন যে ইনি ব্রহ্ম।

সুতরাং ব্রহ্ম ইচ্ছা হলে রূপধারণ করতে পারেন।

কিন্তু রাজা রামমোহনের ব্রহ্ম সম্বন্ধে বক্তব্য কী? রাজা রামমোহন রায় তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থে ব্রহ্ম অচিন্ত্য, নিরাকার, বিকারহীন এবং অনন্ত বলেই উল্লেখ করেছেন। তিনি 'কেন' উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন। কেন উপনিষদের অন্য নাম তলবকার উপনিষদ। তলবকার উপনিষদে ব্রহ্মের রূপধারণ সম্পর্কে তিনি লিখলেন : " সেই অন্তর্যামী ব্রহ্ম দেবতাদের এই মিথ্যাভিমান জানিলেন পাছে দেবতাসকল এই মিথ্যাভিমানের দ্বারা অসুরের ন্যায় নষ্ট হয়েন এই হেতু তাঁহাদিগ্যে জ্ঞান দিবার নিমিত্ত বিস্ময়ের হেতু মায়ানির্মিত অদ্ভুতরূপে বিদ্যুতের ন্যায় তাহাদিগ্যের *চক্ষুর গোচর হইলেন*।"

সুতরাং রাজা রামমোহন স্বীকার করলেন যে ব্রহ্ম 'চক্ষুর গোচর' হতে পারেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম রূপধারণ করতে পারেন; অবশ্যই যদি তিনি অপরের দৃষ্টিগোচর হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন। সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁর বিবৃতি পরস্পরবিরোধী।

এই পরস্পর বিরোধিতা স্পষ্ট হবে রামমোহন রচিত একটি সঙ্গীতে।

নিত্য নিরঞ্জন নিখিল কারণ
বিভু বিশ্বনিকেতন।
বিকারবিহীন, কামক্রোধহীন,
নির্ব্বিশেষ সনাতন।
অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর,
অন্তরাত্মা অগোচর।
সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বত্র সমান,
ব্যাপ্ত সর্ব্বচরাচর।
অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়,
একমাত্র নিরাময়।
উপমা রহিত, সর্ব্বজন হিত,
ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।
সর্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল
সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।
নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন
ভ্রমেন নিয়মে যাঁর।
জলবিন্দুপরি, শিল্পকার্য্য করি,
দেন রূপ চমৎকার।
পশু পক্ষি নানা, জন্তু অগণনা,
যাঁহার রচনা হয়।
স্থাবর জঙ্গম, যথা সে নিয়ম,
সেইরূপে সব রয়।
আহার উদরে, দেন সবাকারে,
জীবের জীবন দাতা।
রস রক্ত স্থানে দুগ্ধ দেন স্তনে
পানহেতু বিশ্বপাতা।
জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ,
হয় যাঁর নিয়মেতে।
সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর,
ভাব মনে বিধিমতে।

এই সঙ্গীতে দেখা যাচ্ছে, ব্রহ্ম কে বিকারবিহীন বলেও তাঁর নানা ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। পর ব্রহ্মে র সঙ্গে অপর ব্রহ্মকে মিশ্রিত করা হয়েছে। "মন যারে নাহি পায়" বলেও "ভাব মনে বিধিমতে" বলা হয়েছে।

সুতরাং, রামমোহনের ব্রহ্ম অস্পষ্ট, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মে র (পর ও অপর, অক্ষর ও ক্ষর ব্রহ্মে র) মিশ্রণ। ঠিক উপনিষদের ব্রহ্ম নয়। পরম্পরাগত হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করে নতুন এক নিরাকার সৃষ্টি করার মানসে রামমোহন ব্রহ্ম সম্বন্ধে নানা জগাখিচুড়ি কথা বলেছেন।

আর 'পৌত্তলিকতা' বিরোধিতা? বাইবেল-কুরআন পড়ে ওনার মাথাটা বিগড়ে গিয়েছিল। ব্রহ্মে র নাম উচ্চারণ করে রামমোহন যে ধর্ম সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হলেন তা হলো সেমীয় বা আব্রাহামীয় ধর্ম। আর যুক্তিহীনভাবে প্রতিমাপূজার বিরোধিতা করে তিনি তাঁর ধর্মীয় অনুসারীদের মুসলমানদের সঙ্গে এক সারিতে নিয়ে গেলেন। আজকের ব্রাহ্ম রা প্রবলভাবে মুসলিম অনুরাগী। এবং অবশ্যই প্রবল হিন্দুবিদ্বেষী।

এখন হিন্দু ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। হিন্দুদের পরমদেবতা অবশ্যই ব্রহ্ম। মানুষ দেবতার উপাসনা করে। উপাসনা কি? উপাসনা হচ্ছে শাস্ত্র অনুমোদিত কোনও একটি বিষয় আলম্বন করে বা ধ্যানের বিষয় অবলম্বন করে তাতে এমনভাবে চিত্তবৃত্তির প্রবাহ উৎপন্ন করতে হবে যে তাতে আর ভিন্ন বিষয়ে প্রত্যয় (অর্থাৎ, জ্ঞান) উৎপন্ন হয়ে মনোযোগ নষ্ট করতে না পারে। এই উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম বা অপর যে কোনও শাস্ত্র-বিহিত দেবতা হতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্মে রও উপাসনা হয়—শুধুমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মে র শব্দ প্রতীক ওঁ উচ্চারণ করে।

উপাসনার দুটি ভাগ—ব্রহ্মো পাসনা ও প্রতীক উপাসনা। ঐতরেয় আরণ্যকের ভূমিকায় বিখ্যাত বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্য লিখেছেন, উপাসনা দু রকমের—ব্রহ্ম উপাসনা ও প্রতীক উপাসনা। ব্রহ্মকেই যখন গুণবিশিষ্টরূপে চিন্তা করা হয়, তখন তা ব্রহ্ম উপাসনা। কিন্তু চিত্ত প্রবল লৌকিক পদার্থের সংস্কারযুক্ত হওয়ায় তা পরিত্যাগ করে ব্রহ্মে প্রবেশ করতে না পারলে যখন ব্রহ্ম দৃষ্টিতে লৌকিক বস্তুর চিন্তা করা হয়, তখন তা প্রতীক উপাসনা।

সংক্ষেপে বলতে গেলে অনাত্ম বস্তুকে দেবতাবুদ্ধিতে বা ব্রহ্ম বুদ্ধিতে যে উপাসনা করা হয় তা প্রতীক উপাসনা। প্রতীকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান হতে পারে না; কারণ, তাতে প্রতীকের প্রাধান্য থাকে। ব্রহ্ম সঙ্গীতের মাধ্যমে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান হয় না। তা অপর ব্রহ্মে র উপাসনা। কর্মের অঙ্গভূত উদগীথ, সাম, প্রভৃতি অবলম্বনে যে প্রতীক উপাসনা, তা যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত উপাসনা। যজ্ঞবহির্ভূত প্রতীক উপাসনায় যজ্ঞাঙ্গ ভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রতীক গৃহীত হয়। ঐসব প্রতীক বৈদিক, পৌরাণিক বা তান্ত্রিক হতে পারে। যেমন, বৈদিক ওঁ কার, পৌরাণিক প্রতিমা বা তান্ত্রিক যন্ত্র।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অন্য ব্যাপার; তা ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া বা উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ করে হয় না। এর জন্য সর্বপ্রথমে বাসনা ত্যাগ করতে হয়। তা ব্রাহ্মদের কেউ পারেন নি। তারপর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। গুরুমুখে শ্রবণ না হয়ে থাকলে জ্ঞান সুদূরপরাহত। "অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য"—এই প্রকার স্থির নিশ্চয়ের প্রতি অনুকূল মানসক্রিয়া-বিশেষকেই শ্রবণ

বলা হয়। গুরুমুখে শোনা বেদান্ত বাক্যের সঙ্গে মন ও অন্তরের বিরোধ আছে, এই রকম শঙ্কা মনে হলে শ্রবণ অনুকুল যে তর্কাত্মক মানস ব্যাপারের দ্বারা ঐ শঙ্কা দূর হয়, তাকে মনন বলে। সাধকের চিত্ত সর্বদাই অনাদি দুর্বাসনা দ্বারা বিষয় সমূহে আকৃষ্ট হয়। যে মানস ব্যাপার দ্বারা ঐ চিত্তকে ভোগ্য বিষয় থেকে সরিয়ে আত্মবিষয়ে একাগ্র করে থাকে তাকে নিদিধ্যাসন বলে।

যাইহোক, প্রতিমাপূজার বিরোধিতার জন্য পরিবারের সঙ্গে সংঘাত লাগে রামমোহনের। রামমোহনই প্রথম বাঙলা ভাষায় উপনিষদ চর্চা করেন। কিন্তু তিনি উপনিষদের অপব্যাখ্যা করেন। খ্রিষ্টানরা যে বাইবেল গৃহে রাখেন তা ওল্ড টেস্টামেন্ট সমেত। সুতরাং ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়ার জন্য হিব্রু ভাযা শেখার প্রয়োজন নেই। তেমনই, নিউটেস্টামেন্ট পড়ার জন্য গ্রীকভাষা শেখা বাতুলতা। রামমোহনের হিব্রু ভাষা ও গ্রিকভাষা শেখার ব্যাপারটা অবশ্যই গল্প। কিং জেমস এডিশনের বাইবেল পড়লেই ইহুদী ধর্ম আর খ্রিষ্টধর্ম সম্বন্ধে পুরো জ্ঞানলাভ করা যায়। আর, রামমোহন ওল্ড টেস্টামেন্টের মর্মার্থ বুঝেছিলেন, এমন কথা বলা যাচ্ছে না।

রামমোহনের বাইবেল-কুরআন নিয়ে চর্চার ঘটনাটা যদিও ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০৩-৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই ঘটেছিল, কিন্তু তিনি তাঁর ধর্মমত প্রসঙ্গে সেই সময়েই সোচ্চার হন নি। তিনি যখন রংপুরে তখন ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর সঙ্গে বিলক্ষণ শাস্ত্রচর্চায় মগ্ন হন রামমোহন। পিতার শ্রাদ্ধের সময় মার সঙ্গে তার মনান্তর ঘটেছিল, কিন্তু, এর জন্য ধর্মভাব বিন্দুমাত্র দায়ী ছিল না। মনান্তরের কারণ ধনী রামমোহনের স্বার্থপরতা। পৃথকভাবে পিতার শ্রাদ্ধ তিনি যথারীতি করেছিলেন।

কলকাতায় পাকাপাকিভাবে বাস করতে আসার পর থেকেই বাইবেল-কুরআন ও তন্ত্র মিশিয়ে তিনি 'ব্রহ্ম' নামক সেমীয় একেশ্বরকে খাড়া করেন। এই 'ব্রহ্ম' মোটেই আমাদের উপনিষদের ব্রহ্ম নন। রামমোহন উপনিষদকে বিকৃত করে নিজের 'ব্রহ্ম' তৈরী করেছিলেন।

যাইহোক, রামমোহন তাঁর অভিনব ধর্মমত প্রকাশ করতে থাকেন কলকাতায় পাকাপাকিভাবে বসবাস করার পর থেকে। মানুষ জাঁকিয়ে বসা ধনী ব্যক্তিদের সমীহ করে চলে; এই বোধ থেকে ফরাসী বুদ্ধিজীবী ভলত্যার প্রথমে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে জাঁকিয়ে বসে আরম্ভ করেন তাঁর বৌদ্ধিক ক্রিয়াকর্ম। রামমোহনও ঠিক তাই করেছিলেন। তিনি কোন পথে অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি।

রামমোহন 'ধর্মসংস্কার' করেছিলেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি আসলে হিন্দুধর্মকে দূষিত করেছিলেন; কুসংস্কার ঢুকিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের মধ্যে। হিন্দুধর্মের প্রাণের মধ্যে প্রবিষ্ট করেছিলেন নারীধর্ষণ সমর্থক সেমীয় ধর্ম। একজন ব্রাহ্মের সঙ্গে আলাপের প্রথমেই তিনি বলবেন, আমরা 'পুঁতুল' পূজা করি না। এই 'পুঁতুল' পূজার বিরোধিতা থেকে জন্ম নিয়েছে ব্রাহ্মদের মুসলিম প্রেম। খ্রিষ্টানরা অল্পস্বল্প পুতুল পূজা করে। বাড়িতে ছবি বা মূর্তি রাখে যিশুর। কিন্তু মুসলমানরা নির্ভেজাল প্রতিমাবিরোধী। যদিও মুসলমানদের বিধাতা কেয়ামতের দিন দেখা দেবেন মুসলমানদের। তিনি নিরাকার নন।

রামমোহনের পূর্বপুরুষ হিন্দুই ছিলেন। তাঁরা সগুণ ব্রহ্মে র উপাসনা করতেন প্রতিমা বা শালগ্রাম শিলার মতো প্রতীকের দ্বারা। হাজার বছরের ইসলামী শাসনে তাঁরা জিম্মী নামধারী অধম নাগরিক ছিলেন। তাঁদের ঘোড়ায় চড়ার বা পাল্কিতে চড়ার অধিকার ছিল না। খুশীমতো তাঁদের মঠ-মন্দির ধ্বংস করে দেওয়া হতো। হারেমে পোরা হতো মেয়ে বউদের ধরে নিয়ে গিয়ে। কিন্তু রামমোহন যেহেতু 'পৌত্তলিকতা' বিরোধী হয়ে গেলেন কুরআন পড়ে, তাঁর অনুসারীরাও ইসলাম ও মুসলমান প্রেমিক হয়ে উঠলেন। কারণ, দুটি 'পুতুলপূজা বিরোধী' ধর্মের মধ্যে সাযুজ্য সৃষ্টি হলো, সাযুজ্য সৃষ্টি হলো দুটি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও। আজকে দেখা যায় ব্রাহ্ম ও মুসলমানরা সমান হিন্দু বিরোধী, কিন্তু একে অন্যের বন্ধু।

যাইহোক আমরা রামমোহনের তথাকথিত ধর্ম সংস্কার প্রসঙ্গে আসি। ব্যাপারটা যে ধর্ম সংস্কার নয় হিন্দুধর্ম দূষণ তা আশাকরি যুক্তিবাদী পাঠক বুঝেছেন। কয়েকজন তা স্বীকার করবেন না, এটাও সত্য। তথ্য তাদের অস্তিত্বের শিকড় ধরে টান দেবে। কোলের মধ্যে অসৎ উপায়ে সংগ্রহ করা বিপুল অর্থ নিয়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে এসে রামমোহন নানা রকম 'সংস্কারের' কাজে লেগে পড়লেন।

রামমোহন তাঁর হিন্দুধর্ম দূষণের জন্য চার প্রকার পথ অবলম্বন করলেন।

(১) পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ।

(২) কথোপকথন ও আলোচনা।

(৩) সভা স্থাপন।

(৪) বিদ্যালয় স্থাপন।

রামমোহন প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন সন্দেহ নেই । কিন্তু, কুরআন, বাইবেল, বেদ বা উপনিষদ একবার পড়লেই সব বোঝা যায় না, বার বার পড়তে হয়। রামমোহন বেদ পড়লেও সব কিছু পড়েন নি; বাইবেল পড়লেও সব কিছু বোঝেন নি। উপনিষদের তথ্য এড়িয়ে গেছেন। নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম পৃথক করেন নি।

সুতরাং বই ও পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে রামমোহন হিন্দুধর্ম দূষণের কাজই করেছেন। কলকাতায় আসার পর তিনি অনুবাদ ও ভাষ্য সহ বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এটা সত্য, তখনও পর্যন্ত ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ছাড়া অন্য কেউ বেদান্ত চর্চা বাঙলায় বসে করেন নি। রামমোহনই বঙ্গদেশে পুরোদমে বেদান্ত চর্চার সূত্রপাত করেন, কয়েকটি উপনিষদ বাঙলায় অনুবাদ করেন। মিশনারী ওয়ার্ড বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। ওয়ার্ড লেখেন, "বেদান্তর প্রকৃত চর্চা ও অধ্যাপনা হতো কাশীতে। বঙ্গীয় পণ্ডিতদের বেদান্ত জ্ঞান ছিল সামান্য। টোলের পাঠক্রমের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠরত ছাত্রদের আনুপাতিক সংখ্যা নির্ণয়ের একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন ওয়ার্ড। তাতে দেখা গিয়েছিল, এক হাজার ছাত্রের মধ্যে কাব্যের ছাত্র চার-পাঁচ শো, অলংকারের ছাত্র পঞ্চাশ, স্মৃতির চার শো, তন্ত্রের দশ, ন্যায়ের তিন শো। কিন্তু বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল,

বৈশেষিক ইত্যাদি মিলিয়ে ছাত্রদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে পাঁচ-ছ জন। বেদান্তের এই স্বল্পসংখ্যক ছাত্রকে পড়তে হতো, বাদরায়ন (বা ব্যাস) কৃত ব্রহ্ম সূত্র, যার অন্য নাম শারীরক সূত্র; শংকর কৃত ব্রহ্ম সূত্রভাষ্য (বা শারীরক ভাষ্য)। উক্ত ভাষ্যের উপর বাচস্পতি মিশ্র রচিত 'ভামতী' টীকা; অমলানন্দ রচিত কল্পতরুর টীকা 'পরিমল'; সম্ভবত প্রকাশাত্মন রচিত পদ্মপাদাচার্যের 'পঞ্চপাদিকা'র টীকা 'পঞ্চপাদিকা বিবরণ' অথবা তার অবলম্বনে বিদ্যারণ্য রচিত 'বিবরণপ্রমেহসংগ্রহ'; শংকরাচার্যের বৃহদারণ্যক-উপনিষদ-ভাষ্যের উপর সুরেশ্বর রচিত 'বৃহদারণ্যক-উপনিষদ-ভাষ্য বার্তিক'; ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের 'বেদান্তপরিভাষা'; অপ্পয় দীক্ষিত রচিত 'সিদ্ধান্তলেশ'; মধুসূদন সরস্বতী রচিত 'সিদ্ধান্ত তত্ত্ববিন্দু' বা সিদ্ধান্তবিন্দু'; ও বিদ্যারণ্য-কৃত পঞ্চদশী'। পাঠক্রমের প্রত্যেকটি বই-ই শংকরাচার্য ব্যাখ্যাত নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের পরিপোষক।

ওয়ার্ড পরে আর একটি পুস্তকে তখনকার বঙ্গদেশে ও গোটা ভারতবর্ষে সংস্কৃত শিক্ষার অবস্থা বিবৃত করেছেন। এই পুস্তক অনুযায়ী বঙ্গদেশের নবদ্বীপ, কলকাতা, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, গোন্দলপাড়া, ভদ্রেশ্বর, জয়নগর, মজিলপুর, আন্দুল, বালী প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত চতুস্পাঠীসমূহের অনেকগুলির পাঠ্যসূচীরও সমীক্ষা করেছিলেন। তাতে দেখা যায়,নবদ্বীপে অধ্যয়নের বিষয়—ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ। কলকাতায় আঠাশটি শিক্ষাকেন্দ্রে ন্যায় ও স্মৃতি; বাঁশবেড়িয়া, গোন্দলপাড়া ও ভদ্রেশ্বরে—ন্যায়; অন্যান্য স্থানের বিষয়ের উল্লেখ নেই। ওয়ার্ডের মতে সমকালীন বাঙ্গালীদের মধ্যে একমাত্র ত্রিবেণীর স্বনামধন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননই কিছুটা বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন। এমত পরিস্থিতিতে রামমোহনের তথাকথিত ধর্মসংস্কারকে রণ-আহ্বান করবার জন্য কেউই স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে আসেন নি। কলকাতার এক উঠতি বড়লোক বেদান্ত নিয়ে কী লিখছেন তা নিয়ে সুদূর ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মাথাব্যথা হওয়ার কথা নয়।

তাঁর 'ব্রহ্ম উপাসনা' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রামমোহন লিখেছিলেন, "পরমেশ্বরে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাঁকে আপনার আয়ুর আর দেহের আর সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্ব্বান্তকরণে শ্রদ্ধা এবং প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টিরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তন করা এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে সমীহ করা অর্থাৎ, এই অনুভব সর্ব্বদা কর্ত্তব্য যে যাহা করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি।"

এখানে লক্ষণীয় যে রামমোহন পরমেশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে স্বীকার করছেন। ব্রহ্ম যখন সৃষ্টিকর্ত্তা তখন তিনি সবিকার। সবিকার ব্রহ্ম আর নিরাকার নন। তিনি আকার বিশিষ্ট। তিনি পুরুষ। পুরুষ হলেই একজন পুরুষের ছবি আঁকা যায়; পটুয়া তাঁর মূর্ত্তি নির্মাণও করতে পারে। সুতরাং সেমীয় 'পৌত্তলিকতা বিরোধিতার' দেহান্ত হয়ে গেল। হিন্দুরা ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ক্ষমতারূপক হিসাবে ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা করেছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। তারপর কল্পনার আরও প্রসারণ করে সৃষ্টি করেছে আরও সব দেবদেবী।

সুতরাং আব্রাহামীয় ধর্মাবলী থেকে ধার করে আনা 'পৌত্তলিকতাবিরোধিতা' প্রথম থেকেই কাল করেছে ব্রাহ্ম ধর্মের। ঠুনকো করে দিয়েছে ব্রাহ্ম ধর্মকে। সমাজের ধনী মানুষদের হুজুগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে। দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই হুজুগে বাতাস দিয়েছেন মাত্র। দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজে ব্রাহ্ম না হলেও রামমোহনের ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ বিলক্ষণ অর্থব্যয় করতেন ব্রাহ্ম সমাজের জন্য। ভালো বেতনের জন্য বহু ব্রাহ্ম ণ পিতৃপুরুষের ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের চাকু রে হয়েছেন। কারণ, ক্ষুধাই মানুষের প্রাথমিক ধর্ম। সমাজ সেবার ব্যাপারে ব্রাহ্ম সমাজের ভুমিকা বিরাট। বহু মানুষ সমাজসেবার তাগিদেই ব্রাহ্ম দের দলে নাম লেখান। এর মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন তাতে প্রমাণ তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য হলেও পরম্পরাগত হিন্দুধর্মে তাঁর আস্থা কিছু কম ছিল না। প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশের পিতামহ গুরুচরণ মহালনবিশের আত্মজীবনী পড়লে দেখা যায় ব্রাহ্ম ধর্ম তত্ত্ব নিয়ে ভদ্রলোকের বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা ছিল না। তিনি নিজের সমাজসেবার বিশাল ফিরিস্তি দিয়ে গেছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্ম ধর্ম ত্যাগ করে পরম্পরাগত হিন্দুধর্মে ফিরে গেলে তিনি প্রচণ্ড গালি দিয়েছেন তাঁকে। কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দেখান নি।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্বামী ধর্ম ত্যাগ করলে স্ত্রীকেও ধর্মত্যাগ করতে হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবীকেও তাই করতে হয়েছিল। তিনি হয়েছিলেন ব্রাহ্মি কা। কিন্তু, তিনি মনে মনে ব্রাহ্ম ধর্মের 'পৌত্তলিকতা' বিরোধিতা মেনে নিতে পারেন নি। মনে মনে ছাড়তে পারেন নি হিন্দু আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকেও। শুধু প্রকাশ্যে স্বামীর বিরোধিতা করতে পারতেন না। তিনি লিখেছেন, ঈশ্বর যদি নিরাকার হন, সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে উঠবে। তিনি বুঝেছিলেন তাঁর স্বামী বড় সরকারী চাকুরে বলেই সবাই তাঁকে সমীহ করে চলে। একঘরে করার সাহস দেখায় না।

রামমোহন তাঁর বিভিন্ন পুস্তকে নির্গুণ-সগুণ ব্রহ্ম কে মিশিয়ে ফেললেও প্রতিমা পূজা তিনি একরকম গায়ের জোরেই বিরোধিতা করেছেন। এর কারণ আখেনাতনের অনুসরণ। যিহোভার দশটি প্রত্যাদেশে বিশ্বাস । তিনি রাজনারায়ণ বসুর মতো বলতে পারেন নি যে ব্রহ্মে র শক্তি অথবা রূপ রূপকচ্ছলে দেবদেবীরূপে কল্পিত হইয়াছে।

রামমোহন যে সমস্ত পুস্তকাদি রচনা করেছিলেন সেগুলির মধ্যে আছে, ফার্সী ভাষায় তুহফাৎ উল—মুয়াহ্হিদীন, এবং বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষায় (১) বেদান্ত গ্রন্থ; (২) বেদান্তসার, (৩) তলবকার উপনিষদ (৪) ঈশোপনিষদ (৫) উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার; (৬) ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার; (৭) কঠোপনিষদ; (৮) মাণ্ডুক্যোপনিষদ; (৯) গোস্বামীর সহিত বিচর; (১০) সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ; (১১) গায়ত্রীর অর্থ; (১২) মুণ্ডকোপনিষৎ ; (১৩) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ;

(১৪) কবিতাকারের সহিত বিচার;(১৫) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার;(১৬) ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সংবাদ; (১৭) চারি প্রশ্নের উত্তর; (১৮) প্রার্থনাপত্র; (১৯) পাদরি ও শিষ্য সংবাদ; (২০) গুরুপাদুকা; (২১) পথ্যপ্রদান (২২) ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ; (২৩) কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার ; (২৪) বজ্রসূচী; (২৫) গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং; (২৬) ব্রহ্মোপাসনা; (২৭) ব্রহ্ম সঙ্গীত; (২৮) অনুষ্ঠান; (২৯) সহমরণ বিষয়; এবং (৩০) গৌড়ীয় ব্যাকরণ। এছাড়া দুটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রামমোহন রচনাবলীতে প্রকাশিত হয়েছে: ক্ষুদ্রপত্রী এবং আত্মানাত্মবিবেক।

এ ছাড়া রামমোহন শ্রীভগবদ্‌গীতা পদ্যে অনুবাদ করেছেন বলে প্রচার। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গীতার পদ্যানুবাদ করেন। বৈকুণ্ঠনাথ রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভার' 'নির্ব্বাহক' ছিলেন। 'কোন পণ্ডিতের সহকারাবলম্বনে' তিনি ঐ অনুবাদ সম্পন্ন করেন। ঐ অনুবাদ রামমোহনের বেনামীতে রচনা কিনা তা বলা যায় না বলে মত প্রকাশ করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামমোহন রায়ের ইংরেজী রচনাবলী কম নয়। কিন্তু আমরা সেগুলি উল্লেখ করে পুস্তকের অবয়ব বৃদ্ধি করতে উৎসাহী নই।

আপন মত প্রকাশের জন্য পুস্তক রচনা ছাড়াও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন রামমোহন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ব্রাহ্ম নিক্যাল ম্যাগাজিন—ব্রাহ্মণসেবধি (সেপ্টেম্বর ১৮২১); সম্বাদ কৌমুদী (৪ ডিসেম্বর, ১৮২১) ও ফার্সী ভাষায়, 'মীরাৎ-উল-আখবার'

ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম প্রসঙ্গে রামমোহন

১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে বাল্টিমোরের এক বন্ধুকে তিনি লেখেন, "আমার মতে খ্রিষ্টধর্ম সমস্ত মানব জাতিকে এক চিরন্তন পিতার সন্তান বলে ঘোষণা করার ফলে একজন মানুষকে জাতি-ধর্ম-দেশ-গায়ের রং নির্বিশেষে অন্যজনকে ভালোবাসতে প্রণোদিত করেছে।"

এ বক্তব্য স্পষ্ট মিথ্যা। অখ্রিষ্টানদের মানুষদের নিয়ে খ্রিষ্টীয় ঈশ্বরের কোনও মাথাব্যথা নেই। খ্রিষ্টীয় ঈশ্বর বলপূর্বক অখ্রিষ্টান মানুষদের ধর্মান্তরিত করার প্ররোচনা দিয়েছেন। আসল কথা, সেমীয় ঈশ্বর যে গোটা পৃথিবীকে তাঁর মনোনীতজনদের ভোগ করার জন্য দিয়েছেন, বাকী মানুষদের ধ্বংসের বিনিময়ে, এ তথ্য অজানা ছিল রামমোহনের। সুতরাং খ্রিষ্টধর্ম "সমস্ত মানব জাতিকে এক চিরন্তর পিতার সন্তান বলে ঘোষণা করার ফলে একজন মানুষকে জাতি- ধর্ম-দেশ-গায়ের রং নির্বিশেষে অন্যজনকে ভালোবাসতে প্রণোদিত করেছে,", এ বক্তব্য মিথ্যা ও খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে রামমোহনের অসীম অজ্ঞতা প্রকাশ করে। রামমোহন সেসব মিশনারীদের দেখেছেন, তারা যদি এ তথ্যে বিশ্বাস করতো, তাহলে তারা দেশ ছেড়ে এতদূরে আসতো না খ্রিষ্টধর্ম প্রসারের জন্য। আর, খ্রিষ্টান হওয়ার পরেও যদি খ্রিষ্টানরা সবাইকে সমান মনে করতো তা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেভারেণ্ড মার্টিন লুথারকে সাদা আমেরিকানদের

বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করতে হতো না। দলিত খ্রিষ্টান বলে কিছু থাকতো না ভারতের মাটিতে। ভারতের মানুষদের দুর্ভাগ্য যে ভারতের একটি বুদ্ধিজীবীও বাইবেল ও কুরআন খুঁটিয়ে পড়েন নি। বুঝতে পারেন নি আখেনাতন অনুসারী ধর্মগুলির ক্ষতিকর দিকগুলি। সেই জন্যই আজকের হিন্দু ভারত ধ্বংসের মুখে। রামমোহন সেমীয় ধর্মের তত্ত্ব হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট করে সমূহ ক্ষতি করেছেন হিন্দুজাতির।

রামমোহন রায় পাকামো করেছেন খ্রিষ্টধর্ম নিয়েও। তিনি খ্রিষ্টধর্মের বিষদাঁত তো দেখতেই পান নি, উপরন্তু যেগুলি তিনি পছন্দ করেন না সেগুলি বাদ দিয়ে যেগুলি পছন্দ করেন সেগুলি নিয়ে 'প্রিসেপ্ট অফ্ যেশাস' নামে একটি বই লেখেন। বলা বাহুল্য, এমন বই লেখার কোনও অধিকার তাঁর নেই। বাইবেলকে কাট-ছাঁট করার তিনি কে? এর ফলে তিনি শ্রীরামপুরের কেরী-মার্শম্যানদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। আমরা আগেই প্রদর্শন করেছি, রামমোহন বাইবেল বোঝেন নি।

রামমোহন রায় ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানা তর্কবিতর্ক করেন বহুজনের সঙ্গে। এবং সেই সব তর্কে অবশ্যই জয়লাভ করেছিলেন। এখন পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, রামমোহন রায় বেদান্তের সঙ্গে যিহোভার প্রত্যাদেশ মিশিয়েছেন বলছেন, তখন তো কেউ এমন কথা বলতে পারেন নি। এর উত্তর, এখনও বহু পরম্পরাগত হিন্দু রামমোহনের 'পৌত্তলিকতাবিরোধিতার' প্রশংসা করেন। এইসব কাছা খোলা কালিদাসরা সিনেমা দেখেছেন 'টেন কমান্ডমেন্টস', কিন্তু টেন কমান্ডমেন্টেস এর ভয়ঙ্কর তাৎপর্য বোঝেন না। আর তখন রামমোহন নিজেই কিছু বুঝেছিলেন কিনা সন্দেহ। আর আগের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে তখন কেউই উপনিষদ পড়তো না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কাছে উপনিষদের পুঁথি থাকলেও তিনি এই নিয়ে পড়াশুনা করেন নি। উপনিষদের ভাষ্য তাঁর কাছে ছিল কিনা তাও জানা নেই। রামমোহনের ঈশোপনিষদের অনুবাদ পড়ে বোঝা যায় তাঁর কাছে শাংকরভাষ্য ছিল। 'বাস্যমিদং' শব্দটি তিনি যেভাবে অনুবাদ করেছেন তা শাংকরভাষ্য অনুমোদিত। এইসব ভাষ্য তিনি সম্ভবত কাশী থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রী অরবিন্দ অন্য ভাষ্যে অন্য অর্থে আগ্রহী। সুতরাং, ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। বস্তুত বাইবেল ও উপনিষদ দুটিই যদি কারও জানা থাকতো,তবে তিনি রামমোহনকে পরাস্ত করতে পারতেন। এছাড়া পণ্ডিতী বিতর্ক সম্বন্ধে একটা বিষয় জানা উচিৎ। এক পণ্ডিত অন্য রাজার সভায় গিয়ে বললেন, রাজা তস্কর, ধর্ষক, প্রতারক! স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিবাদ এলো সেই রাজার সভাপণ্ডিতের কাছ থেকে। তখন প্রথম পণ্ডিত একটি সংস্কৃতশ্লোক উচ্চারণ করলেন যার অর্থ প্রজারা যা পাপপূণ্য করে তার একের ছয় অংশ রাজার প্রাপ্য হয়। কাজ কাজেই একজন প্রজাও যদি তস্করবৃত্তি করে, লাম্পট্য করে বা প্রতারণা করে, রাজা তার একের ছয় অংশ পাপের ভাগী হয়। সেই অর্থে রাজাকে পাপী বলা চলে।

রামমোহনের জীবনীতে পাই বিতর্কে পরাজিত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ পরে তাঁর মতে আস্থা স্থাপন করেন। খুব স্বাভাবিক। টাকার থলি দেখে বহুলোকই তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল। স্বাস্থ্যে, দর্শনে, সাজপোষাকে, বাচনভঙ্গীতে, সর্বোপরি ধনগৌরবে তিনি ছিলেন কলকাতার সমাজে অনন্য এক বাঙ্গালী। তাঁর মাণিকতলার বাড়িতে নগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ ঘটতো। তাদের মধ্যে দেশী লোক ছাড়াও বহু বিদেশী লোক ছিল।

বাঙ্গালীরা মোসাহেবগিরি, পেটোয়াগিরিতে অত্যন্ত পারঙ্গম, এ কথা সবাই জানে। আর সমকালীন ব্রাহ্মণ সমাজ যে কতো দরিদ্র ছিল তা যাঁরা বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' পড়েছেন তাঁরা জানেন। সুতরাং, একটা পেটোয়া ব্রাহ্মণ সমাজ তিনি অতি সহজেই পেয়ে গিয়েছিলেন তাঁর তথাকথিত ধর্মসংস্কারের যজ্ঞে। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এমনই এক ব্যক্তি। অর্থের বিনিময়ে কয়েকজন দক্ষিণী ব্রাহ্মণও বেদ পাঠ করতেন তাঁর ব্রাহ্ম সমাজে। কলকাতায় আসার পরেই তিনি একটি সভা স্থাপন করেছিলেন ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে, 'আত্মীয় সভা' নামে। আত্মীয় সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা, বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা,এবং 'ব্রহ্ম সঙ্গীত' ইত্যাদি হতো। ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে এই সভায় রামমোহন রচিত একটি ব্রহ্ম সঙ্গীত গাওয়া হয়—"কে ভুলালো হায়/কল্পনাকে সত্য করি জান, এ কি দায়/ আপনি গড় যাকে;/ যে তোমার বশে তাঁকে/ কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?/কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার;/ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার।/প্রভু বোলে মান যারে,/ সম্মুখে নাচাও তারে—হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?"

এ গীত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মুসলিমদের হিন্দুধর্মের সমালোচনা।

প্রথম প্রথম আত্মীয় সভায় বেশ ভালোই ভিড় হতো। পরে তিনি যখন আব্রাহামীয় ধর্মভিত্তিক 'পৌত্তলিকতাবিরোধী' ব্রহ্মের কথা বলতে থাকেন তখনই ভিড় পাতলা হতে আরম্ভ করে। তিনি এইসময় বিভিন্ন উপনিষদ অনুবাদ ও প্রকাশ করে মানুষকে বিনামূল্যে বিতরণ করতে থাকেন। কিছু মানুষ অবশ্যই রামমোহনের মতবাদে আকৃষ্ট হলো। বিপরীতে একটি রক্ষণশীল দল সংগঠিত হলো রামমোহনের বিরুদ্ধে। তাঁরা শুধু রামমোহনের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রকাশ করেই নিরস্ত হলো না;প্রশ্ন তুললো তাঁর চরিত্র ও আচারব্যবহার নিয়েও। রামমোহনের বাড়ীতে বিলক্ষণ মদ্য-মাংসের প্রচলন ছিল। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন বঙ্গ সমাজে রামমোহনই মদ্যের প্রচলন করেন। এর ফলে তিনি ছাত্রাবস্থায় মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে কলেজ স্কোয়ারে পড়ে থাকতেন। রামমোহন নাকি অপরিমিত মদ্যপান পছন্দ করতেন না। কিন্তু মদ্যপান আরম্ভ করলে যে সবার মাত্রজ্ঞান থাকে না, এটা বলাই বাহুল্য। এই অশুভ প্রচলন রাজনারায়ণ পছন্দ করতে পারেন নি। আজও আমরা পছন্দ করতে পারছি না। আর তথাকথিত ধর্মসংস্কারের নামে তিনি যে হিন্দুধর্মকে কলুষিত করেছেন, এটা বলার সময় অনেক আগেই হয়েছে। কিন্তু হিন্দুজাতির দুর্ভাগ্য, কেউই খুঁটিয়ে বাইবেল পড়েন নি;আর কুরআন পড়া তো দূরস্থান। আত্মীয় সভা খুব বেশীদিন চলে নি। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে রামমোহন

ও সহযোগীরা 'ইউনিট্যারিয়ান কমিটি' নামে আর একটি সভা স্থাপন করলেন। ঐ সময় ইউরোপে ইউনিট্যারিয়ানইজম বলে একটি নতুন খ্রিষ্টান মত গজিয়ে ওঠে। এই মতে যিশুকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করা হতো না। খ্রিষ্টধর্মের ত্রিত্বও অস্বীকৃত ছিল। এই মত রামমোহনের আদর্শ মনে হয়েছিল। পুত্র রাধাপ্রসাদ, কয়েকজন আত্মীয় এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব এই দুইজন শিষ্য নিয়ে রামমোহন এই সভায় যেতেন। এই সভা প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনে অ্যাডাম নামক এক মিশনারী রামমোহনের সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু এই সভাও বেশীদিন চলেনি। এক দিন ইউনিট্যারিয়ান কমিটির বৈঠক থেকে ফেরার পথে তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তাঁকে বলেন, আমাদের অন্যের উপাসনা মন্দিরে যাওয়ার প্রয়োজন কি, আমাদের নিজেদেরই তো একটি মন্দির হতে পারে। কথাটা রামমোহনের মনে দাগ কাটলো। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রহ্ম উপাসনার জন্য একটি নতুন সভা প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০ শে আগষ্ট। এর নাম হয় 'ব্রাহ্ম সমাজ'। কিন্তু মানুষ এই সভাকে ব্রহ্ম সভা বলতো।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সাতটা থেকে নটায় সভার অধিবেশন বসতো। একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করতো, আর উপনিষদ পাঠ করতেন তাঁর পূর্বতন সমালোচক উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ। পরে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করতেন। সবশেষে সঙ্গীত হতো। গান করতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী, পাখোয়াজ বাজিয়ে সহায়তা করতেন গোলাম আব্বাস নামক এক মুসলমান। সম্পদশালী মানুষের সেবায় তাঁর কনিষ্ঠ ভাইটিকে লাগিয়ে দিয়েছিলেন বিচক্ষণ হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী।

ব্রাহ্ম সমাজ প্রথমে আপার চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ীতে স্থাপিত হয়েছিল। পরে রামমোহন অর্থ সংগ্রহ করে জোড়াসাঁকোতে নতুন বাড়ী তৈরী করেন। এই নতুন ভবনের উদ্বোধন হয় ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ শে জানুয়ারী। উদ্বোধনের দিন প্রায় ৫০০ হিন্দু সমবেত হয়েছিলেন। মন্টগোমারী মার্টিন নামে এক সাহেবও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আসলে রামমোহন আব্রাহামীয় 'পৌত্তলিকতাবিরোধী' হওয়ায় অনেক খ্রিষ্টানই ভাবতেন তিনি একদিন খ্রিষ্টান হয়ে যাবেন। কিন্তু রামমোহন তাঁর হিন্দুসত্তা মুহূর্তের জন্যও বিসর্জন দেন নি। চিরকাল উপবীত ধারণ করেছেন। ইংলন্ডে গিয়েছেন নিজস্ব পাচক সাথী করে। কলকাতায় লর্ড বিশপের সঙ্গে পরিচয়কালে বিশপ মিডিলটন তিনি খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছেন ধরে নিয়ে উন্নততর ধর্ম গ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানালে তিনি সবিনয়ে তাঁর ভুল সংশোধন করে দিয়ে জানান, এক কুসংস্কারের বদলে অন্য কুসংস্কার বরণ করার জন্য তিনি কুসংস্কারের শৃঙ্খল ছিন্ন করেন নি। ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম আচার্য হন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ব্রাহ্ম সমাজ কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ছিল না। সব সম্প্রদায়ের মানুষই একেশ্বরের উপাসনা করতে পারতো এই সভাতে এসে। রামমোহন নিজে কি ভাবে কার উপাসনা এই সমাজে হবে তার একটি দলিল লিখে গেছেন। তিনি লিখে যান যে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালন কর্ত্তা,

আদি-অন্ত রহিত, অগম্য ও অপরিবর্ত্তনীয় পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। কোনও সম্প্রদায়ের নামে তাঁহার উপাসনা হতে পারবে না। যে কোনও ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে উপাসনা করতে পারবেন। তাঁর জন্য জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্বিশেষে সবার জন্য মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। কোনও প্রকার চিত্র, প্রতিমূর্ত্তি, বা খোদিত এই মন্দিরে ব্যবহৃত হবে না। প্রাণীহিংসা বা পানভোজন এই মন্দিরে হবে না। জীব বা জড় যাই হোক না কেন, কোনও সম্প্রদায়ের উপাস্যকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্র করা যাবে না। যাতে পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার প্রসার হয়, প্রেম নীতি ভক্তি দয়া সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হবে;অন্য কিছু হতে পারবে না।

লক্ষ্য করার বিষয় যে যিহোভার প্রত্যাদেশ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে রামমোহনের দলিলে। এই সমাজে এসে সব সম্প্রদায়ের লোকই এক ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারতেন। বস্তুত, হিন্দুমুসলমান, ইহুদী-খ্রিষ্টান, সকলেই এই উপাসনায় যোগ দিতেন বলে জানিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এর সত্যতা বিচার আজ সম্ভব নয়।

মূলত পরম্পরাগত হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্যই নিজের গর্ভধারিণীর সঙ্গে বিবাদ লাগে রামমোহনের। ভদ্রমহিলা পুত্রের প্রতি ঘৃণায় শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথের মন্দির ঝাঁট দিয়ে অন্নসংস্থান করতেন। শ্রীক্ষেত্রেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

পয়সাকড়ি নিয়ে অসাধুতা, বাপ-দাদার সঙ্গে অসহযোগিতা করলেও, বা, অসাধু উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করলেও রামমোহনের প্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না। কিছু কিছু ব্যাপারে তিনি অগ্রদূত, আবার কিছ কিছু ব্যাপারে তিনি অগ্রদূত না হলেও অগ্রবর্তী। তাঁর কিছু ধ্যান-ধারণা বিকৃত ও ভ্রান্ত; ফলে ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু ধর্ম ও সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে ও করে চলেছে।

ডঃ টাকারম্যানকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে প্রকাশ, "আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে হিন্দুরা এখন যে ধর্মপ্রণালী অবলম্বন করে রয়েছে তা রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণ করতে পারবে না। অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত থাকার কারণে তাদের জাতীয়তাবোধ নেই। একগাদা ধর্মীয় উৎসব ও নানাবিধ ধর্মীয় বিধান ও প্রায়শ্চিত্ত থাকার ফলে তাদের পক্ষে শক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। .....আমি মনে করি ধর্মতে কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। অন্তত তাদের রাজনৈতিক সুবিধা এবং সামাজিক স্বস্তির জন্য।"

রামমোহনের কালে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটলেও ভারতের মানুষরা সেই রাজাদের পৃথিবীতেই ছিলেন। এমনকি ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পরে মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহকেই ফিরিয়ে আনা হয় দিল্লীর সিংহাসনে—কোনও প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির কথা কেউ ভাবে নি। প্রিন্স ফ্রেডরিকের মতো ভারতের কেউই বলেনি, ভাইসব, এ দেশটা তোমাদের মাতৃভূমি। রামমোহনও বলেন নি। তবে রামমোহনের জীবৎকালেই এ কথা বলেছিলেন

এক ইউরেশিয়ান কবি, তাঁর নাম, হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও। আর, ভারতের পরবর্তী ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে, হিন্দুধর্ম জাতীয়তাবাদের পরম সহায়ক। 'বন্দেমাতরম' ছাড়া জাতীয়তাবাদের বৃক্ষ বড় হতে পারেনি।

রামমোহন বহু ব্যাপারেই অগ্রগামী, কিন্তু সর্বদা অগ্রদূত নন। তিনি ইসলাম চর্চায় হিন্দুদের অগ্রদূত। হিন্দুদের মধ্যে তিনিই প্রথম কুরআন পড়েছিলেন, মূল আরবী ভাষায়। তাঁর পরে খুব কম হিন্দুই মূল আরবী ভাষায় কুরআন পড়েছেন। রামমোহন 'তুহ ফাৎ উল—মুয়াহ্হিদীন' পুস্তিকায় কুরআন এর সবচেয়ে সাংঘাতিক আয়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। ওবাইদুল্লা এল ওবাইদির অনুবাদে পড়ি—"The followers of Islam on the other hand, according to purport of the holy verses of the Quran "kill the idolaters whenever you find them" and "then tie the hands, i.e, capture the unbelievers in the holy war, then set them free by obligation to them, or, by taking ransom,".

এর মধ্যে কুরআনের দুটি আয়াত বা বচন আছে। নবম অধ্যায়ের পঞ্চম বচন—যা 'তরবারীর আয়াত' (আয়াত-উস-সৈফ) নামে খ্যাত। অন্য যে আয়াতটি আছে সেটি হলো: ৪৭/৪ —"অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা ওদের সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করবে তখন ওদের মজবুত করে বাঁধবে, অতঃপর তোমরা ইচ্ছা করলে ওদের মুক্ত করে দিতে পারো অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পারো।....."

রামমোহন বেশীদিন তাঁর ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম এদেশে বসে চালাতে পারেন নি। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পেনসনভোগী মুগল সম্রাটের দূত হয়ে ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। পরে সে দেশেই দেহ রাখেন। টাকা খরচা করে তাঁর ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম উপাসনাস্থল টিম টিম করে জ্বালিয়ে রাখেন বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর। কিন্তু পরে রামমোহনের ছেড়ে যাওয়া জুতায় পা গলান দ্বারকানাথ নন্দন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিই ব্রাহ্ম ধর্মকে একটি ব্যাপক হুজুগে পরিণত করেন প্রচুর অর্থব্যয় করে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যৌবনেই দেবেন্দ্রনাথ স্নেহময়ী পিতামহী অলকা দেবীকে হারিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা দেবেন্দ্রনাথকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই মৃত্যুতে তিনি শোকতপ্ত হয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর মনে কিছু ঈশ্বরচিন্তাও প্রবেশলাভ করে। তাঁর মনে পড়ে পিতৃবন্ধু রামমোহন রায়ের কথা। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়েছিলেন তিনি। গ্রীষ্মের ছুটিতে তাঁরই বাড়ীর বাগানে গিয়ে ফল-পাকুড় খেতেন তিনি। রামমোহন রায় তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।

দেবেন্দ্রনাথ স্থির করলেন তিনি রামমোহন রায়ের ধর্মটিকেই নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যা ভাবা তাই কাজ। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "এই অবধি আমি মনে মনে সংকল্প

করিলাম যে, রামমোহন যেমন কোন প্রতিমা পূজায় ও পৌত্তলিকতায় যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না। কোন প্রতিমাকে পূজা করিব না, কোনও পৌত্তলিক পূজায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না।'

এই ব্যাপারে রামমোহন ছেলের সঙ্গে দল পাকান নি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ভাইদের নিয়ে একটা দল বাঁধলেন। তাঁরা সকলে মিলে সংকল্প করলেন পূজার সময় ঠাকুর দালানে যাবেন না। যদি যেতে বাধ্য হন তবে প্রতিমাকে প্রণাম করবেন না। এইভাবে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক একটি আখেনাতন পন্থী ধর্মমত ও সম্প্রদায় গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন—যা রামমোহন রায় করেন নি। এর পরে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌত্তলিকতার উপদেশ, সে শাস্ত্রে আমার আর শ্রদ্ধা থাকিত না। আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, আমাদের সমুদায় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র। অতএব তাহা হইতে নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের তত্ত্ব পাওয়া অসম্ভব।"

রামমোহন রায়ের জুতায় পা গলানোর পরে তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই রামমোহন সাহিত্য পড়ে দেখবেন, বুঝতে না পারলে বাড়ির পণ্ডিত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের সাহায্য নেবেন। তারপর তিনি না পারলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কে ডাকবেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বেশ একটা গল্প তৈরী করেছেন।

তিনি একদিন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কাজ করতে অফিস যাচ্ছেন এমন সময় কি একটা সংস্কৃত পুস্তকের পাতা উড়ে যেতে দেখলেন। তিনি সেটা তুলে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে বললেন, এখন আমি অফিসে যাচ্ছি, রাতে এসে এই সংস্কৃতের অর্থ জানতে চাইবো। রাতে ফিরে এসে শ্যামাচরণের মুখে শুনলেন, এতো ব্রহ্ম সভার কথা, ব্রহ্ম সভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই বুঝতে পারেন। সেই রাতেই বিদ্যাবাগীশকে ডাকা হলো। জানি না তাঁর বাড়ি কতোদূরে ছিল। বিদ্যাবাগীশ এসে জানালেন, এটা ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক। তিনি এর অর্থও করলেন। 'ঈশ্বর দ্বারা সমুদয় জগৎ আচ্ছাদন কর।'

আসলে তাঁর গল্প বাদ দিলে যা দাঁড়ায় রামমোহনের পদচিহ্ন অনুসরণ করার তাগিদে তিনি প্রধান প্রধান উপনিষদগুলি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে পড়েছিলেন। তিনি বেদ পাঠও শিখেছিলেন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠিক করলেন যে তিনি উপনিষদ প্রচার করবেন। খুব ভালো কথা। তিনি যদি সত্যই উপনিষদ প্রচার করতেন তবে একটি হিন্দুজাগরণ সৃষ্টি করতে পারতেন। যাইহোক, তিনি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও ভ্রাতাদের নিয়ে একটি সভা করতে মনস্থ করলেন। বাড়ির পুকুরের ধারে একটি কুটির ছিল; সেটাই পরিষ্কার করে শরৎকালের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর প্রভাতে (১৭৬১ শকের ২১ শে আশ্বিন রবিবার) স্নান করে শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে সবাইকে দিয়ে সভা শুরু হলো। দেবেন্দ্রনাথ কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর ছ নম্বর শ্লোক আবৃত্তি করলেন। তারপর তার অর্থও জানালেন: প্রমোদী ও ধনমদে মূঢ় নির্বোধের নিকট পরলোক

সাধনের উপায় প্রকাশ পায় না;'এই লোকই আছে, পরলোক নাই' যাহারা এ প্রকার মনে করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশে (মৃত্যুর বশে) আইসে।

ব্যাখ্যান শেষ হলে তিনি সভাকে চিরস্থায়ী করার প্রস্তাব করলেন। সভার নাম দিলেন 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। ঠিক হলো, প্রতি মাসের প্রথম রবিবার বিকালে সভা বসবে। পরের মাসের অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডাকা হলো। তিনি এসে সভার নাম পাল্টে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' করলেন। সভার উদ্দেশ্য বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। এই বেদান্ত মানে উপনিষদ। প্রথম দিনে মাত্র দশজন সভ্য থাকলেও ক্রমে ধনীর নন্দনের খেয়াল দ্বারা গ্রস্ত হতে লাগলেন অনেকেই। ঠাকুর বাড়ির একটি বড় ঘরে অধিবেশন বসতে লাগালো। পরে সুকিয়া স্ট্রীটের একটি পুরো বাড়িই ভাড়া করা হলো। সভার অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য হয়ে বসলেন। তিনি দ্বারকা নন্দনের প্রীতার্থে ভাগবতের একটি শ্লোক প্রতিবারই আবৃত্তি করতেন, যার অর্থ :

"হে অখিলগুরো! তুমি রূপবিবর্জ্জিত, অথচ ধ্যানের দ্বারা আমি তোমার রূপ যে বর্ণন করিয়াছি, এবং স্তুতির দ্বারা তোমার যে অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি,ও তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তোমার ব্যাপিত্বকে যে বিনাশ করিয়াছি—হে জগদীশ চিত্তবিকলতা হেতু আমি যে তিন দোষ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর।"

যদিও 'চিত্ত' শব্দটি শ্লোকের মধ্যে নেই, দ্বারকা নন্দন এই শ্লোক পাঠে খুব আনন্দ পেতেন। কিন্তু রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ তিনজনেই 'চিত্তবিকলতা হেতু' এই পাপ করতেন। এই তিন ব্রহ্ম জ্ঞানী অবশ্যই কোনও বাস্তব মূর্তি নির্মাণ করেন নি, কাগজ কলম তুলি দিয়ে ছবিও আঁকেন নি। কিন্তু কল্পনায় নির্মাণ করেছিলেন নির্গুণ ব্রহ্মের বহু মূর্তি। যখন ব্রহ্মকে পিতা বলা হয়, তখন একজন বাস্তব পিতাকেই স্মরণ করা হয়—নিজের বা অন্যের। ঈশ্বরের নররূপারোপ (Anthropomorphism) পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। কারণটা খুবই যুক্তিগ্রাহ্য—নিরাকার কিছু মানুষ চিন্তা করতে পারে না। ঈশ্বরকে পিতা বলাও নররূপারোপ। পুত্র বলাও তাই।

আবার ফিরে যাই তত্ত্ববোধিনী সভা প্রসঙ্গে। এই সভাতে সব সভ্যেরই বক্তৃতা করার অধিকার ছিল। অনেকেই বক্তব্য রাখতে চাইতেন। সুতরাং নিয়ম হলো বক্তৃতা আগে লিখে সম্পাদকের কাছে জমা দিতে হবে। ফলে অনেকেই খুব ভোরে লিখিত বক্তৃতা সম্পাদকের বিছানায় জমা দিয়ে আসতেন। কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র একটা খেয়ালে মেতেছেন, কিছু মানুষতো সঙ্গে জুটবেই। তবে লোক সংখ্যা দেবেন্দ্রনাথের মনে সন্তোষ আনতে পারে না। আরও সভ্য চাই, আরও। ঠিক করলেন তৃতীয় বার্ষিকী সভা খুব জাঁক করে করবেন। তখন এখনকার মতো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে তেমন কাজ হতো না। কজন বা সংবাদপত্র পড়তো। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ ঠিক করলেন, কলকাতায় যতো অফিস আছে, প্রত্যেক কর্মচারীর নামে চিঠি লিখে পাঠাবেন। সেই মতো কাজ হলো। যদিও তত্ত্ববোধিনী সভার নামও অনেকে

শোনে নি। ১৭৬৩ শকে ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীর দিন তত্ত্ববোধিনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার দিন উপস্থিত হলো। এ দিকে দেবেন্দ্রনাথরা সারাদিন ব্যস্ত। সন্ধ্যার আগে থাকতেই আলো জ্বেলে ঘর গুছিয়ে সভাঘর সাজিয়ে সব ঠিকঠাক করে প্রস্তুত। দেখা গেল সন্ধ্যার পরেই লণ্ঠন হাতে করে একের পর এক লোক আসছেন। কারও জানা নেই কি জন্য আসছেন, আর কি হবে সেখানে। রাত আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছাদের উপর শাঁখ, ঘন্টা ও শিঙ্গা বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সবকটা দরজা খুলে দেওয়া হলো অধিবেশন কক্ষের। সবাইকে আহ্বান করে ঘরের মধ্যে ডেকে বসানো হলো। সামনেই বেদী। তার দু পাশে দশজন করে বিশ জন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদীতে বসলেন। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণেরা একসঙ্গে বেদ পড়তে আরম্ভ করলেন। বেদ পাঠ শেষ হতেই রাত দশটা বেজে গেল। তখন দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণ শুরু করলেন : 'এইক্ষণে ইংলন্ডীয় ভাষার আলোচনায় বিদ্যার বৃদ্ধিহইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং এতদ্দেশস্থ লোকের মনের অন্ধকারও অনেক দূরীকৃত হইয়াছে। এইক্ষণে মূর্খ লোকদিগের ন্যায় কাষ্ঠ লোষ্ট্রেতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া তাহাতে পূজা করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। বেদান্ত প্রচারের অভাবে, ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য-স্বরূপ, সর্ব্বগত, বাক্য মনের অতীত, ইহা যে আমাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। সুতরাং আপনার ধর্মে এ প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞান না পাইয়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রে তাহা অনুসন্ধান করিতে যায়। তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় আছে যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কেবল সাকার উপাসনা, অতএব এ প্রকার শাস্ত্র হইতে তাহাদিগের যে শাস্ত্র উত্তম বোধ হয়, সেই শাস্ত্র মান্য করে। কিন্তু যদি এই বেদান্ত ধর্ম প্রচার থাকে তবে আমাদিগের অন্য ধর্মে কদাপি প্রবৃত্তি হয় না। আমরা এইভাবে আমাদিগের হিন্দুধর্ম রক্ষায় যত্ন পাইতেছি।'

উত্তম প্রস্তাব! কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বারকানন্দন পরবর্তীকালে বেদান্ত ভিত্তিক হিন্দুধর্ম প্রচার করেন নি। পরিবর্তে তিনিও রামমোহনের মতো এক জগাখিচুড়ি উপাসনা পদ্ধতি সৃষ্টি করেন। এইভাবে হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন তিনি। তিনি উপনিষদকে একরকম ধর্ষণই করেছিলেন। যে ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য-স্বরূপ, সর্ব্বগত, বাক্য মনের অতীত, সেই ঈশ্বরকে শুধুমাত্র শব্দপ্রতীক ওঁ সহযোগে উপাসনা করা যায়; অন্য কোনও ভাবে উপাসনা করা যায় না, এই বোধ তাঁর ছিল না।

যাইহোক, এবার দেবেন্দ্রনাথের নজর গেল রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের দিকে। তিনি ঠিক করলেন ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গেও ব্রাহ্ম সমাজের যোগসূত্র করবেন।

একদিন তিনি ব্রাহ্ম সমাজ দেখতে গেলেন। দেখলেন সূর্য অস্ত যাবার আগে একজন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ সমাজের মূল গৃহের পাশের ঘরে উপনিষদ পাঠ করছেন। সেখানে কেবল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ঈশ্বর চন্দ্র ন্যায়রত্ন ও আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণ বসে বসে তা শুনছেন। সূর্য অস্ত গেলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও ঈশ্বর চন্দ্র ন্যায়রত্ন মূল সভাগৃহে বেদীতে উপবেশন

করলেন। এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র সব জাতিরই সমান অধিকার। কিন্তু লোক সমাগম অতি অল্প। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন উপনিষদ ব্যখ্যা করলেন, বিদ্যাবাগীশ মশাই বেদান্ত দর্শনের মীমাংসা বুঝাতে লাগলেন।

সব দেখে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের ভার নিলেন। ঠিক হলো তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম সমাজের তত্ত্বাবধান করবে। এইভাবে ব্রাহ্ম সমাজের দখল নিলেন দেবেন্দ্রনাথ। মাসের প্রথম রবিবার প্রাতে ব্রাহ্ম সমাজের সভা হতো। আর সাম্বৎসরিক সভা স্থির হলো ১১ই মাঘ, সমাজের গৃহপ্রতিষ্ঠার দিন। হুজুগে বাঙ্গালীরা ধনী দ্বারকানন্দনের হুজুগে সামিল হলো। দিনে দিন বাড়তে লাগলো ব্রাহ্মদের সংখ্যা। ব্রাহ্মদের দলে যোগ না দিলে আর প্রগতিশীল হওয়া যায় না। ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যে সাপ আছে না ব্যাঙ আছে না কাঁকড়া বিছে আছে, তা দেখার প্রয়োজন নেই। মোদের নতুন হুজুক চাই মোদের নতুন হুজুক চাই। এইভাবে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের ভবনও বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ ধর্ষণ

দেবেন্দ্রনাথ প্রাথমিকভাব মজে গেলেন উপনিষদে। কিন্তু রামমোহনের মতোই সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্মের পার্থক্য করলেন না। উপনিষদের সেই বিখ্যাত শ্লোক : যার বক্তব্য

'দৃষ্টির অগোচর যে ব্রহ্ম তা সর্বদাই পূর্ণ। আর নাম এবং রূপ নিয়ে যে ব্রহ্ম, তাও পূর্ণ। দৃষ্টির অগোচর যে ব্রহ্ম সেটি কারণ; আর নামরূপাত্মক যে ব্রহ্ম সেটি কার্যব্রহ্ম। পূর্ণ থেকেই পূর্ণের উদ্ভব, অর্থাৎ, কারণ থেকেই কার্যের উদ্ভব। কারণ ব্রহ্ম যদি পূর্ণ হয় তো কার্য ব্রহ্মও পূর্ণ।'

কিন্তু, দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন, আমার হৃদয় বলিতেছে যে, তিনি আমার পিতা, মাতা, বন্ধু। উপনিষদে দেখি যে তাহারই অনুবাদ, 'স নো বন্ধুর্জ্জনিতা স বিধাতা।'

এর দ্বারা ব্রহ্মর নররূপারোপ হচ্ছে, একটি বাকপ্রতিমা অঙ্কন করা হচ্ছে ব্রহ্মর, তা খেয়াল নেই দ্বারকানন্দনের। তিনি নিরাকার ব্রহ্মের গল্প শুনিয়ে যাচ্ছেন।

এর পরে দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন, "তিনি আপনার আত্মা হইতে আমাদিগের আত্মাকে প্রসব করিয়াছেন। সেই এক ধ্রুব নির্ব্বিকার অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা, স্ব-স্বরূপে নিত্য অবস্থিতি করিয়া, অসংখ্য পরিমিতআত্মা-সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। এইকথা আমি উপনিষদে স্পষ্টই পাইলাম, 'একং রূপং বহুধা যঃ করোতি', যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন।"

নির্ব্বিকার শব্দটির অর্থ, যার পরিবর্তন হয় না। নির্ব্বিকার অনন্ত ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তা নন, তিনি বিকারশীল সগুণ ব্রহ্ম (অপর ব্রহ্ম বা কার্য ব্রহ্ম) যিনি সৃষ্টি করেন। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ এর প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আছে :

প্রথমতঃ এই জগৎ পুরুষাকার আত্মা (বা বিরাট) রূপেই ছিল। তিনি আলোচনা করিয়া আপনা হইতে ভিন্ন কিছু দেখিলেন না। তিনি প্রথমে "আমি সেই" এই কথা উচ্চারণ করিলেন। অতএব তিনি "আমি" এই নামধারী হইলেন।

তিনি ভয় পাইলেন। এই জন্য (আজও) লোকে একাকী থাকিতে ভীত হয়। সেই বিরাট চিন্তা করিলেন, "আমা হইতে ভিন্ন কেহ যখন নাই, তখন কাহা হইতে ভয় পাইতেছি?" তাহারই ফলে তাঁহার ভয় দূর হইল, কারণ কাহা হইতে তিনি ভয় পাইবেন? দ্বিতীয় কেহ থাকিলেই ভয় হইতে পারে।

তিনি মোটেই আনন্দিত হইলেন না। এইজন্য (আজও) কেহ একাকী থাকিলে সুখী হয় না। তিনি সঙ্গীর অভিলাষ করিলেন। স্বামী ও স্ত্রী আলিঙ্গিত হইয়া যে পরিমাণ হয়, তিনি সেই পরিমাণ হইলেন। তিনি সেই দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহা হইতে পতি ও পত্নী জাত হইলেন। তিনি তাহাতে উপগত হইলেন। ফলে মনুষ্যগণ জাত হইল। তিনিও (অর্থাৎ শতরূপাও) আলোচনা করিলেন, "আমাকে আপনা হইতেই উৎপন্ন করিয়া ইনি কিরূপে আমাতে উপগত হইতেছেন? ভাল কথা, আমি তিরোভূতা হই।"

তিনি গাভী হইলেন, অপরে (অর্থাৎ মনু) বৃষ হইলেন, এবং তাঁহাতে উপগত হইলেন; তাহার ফলে গরুসকল জাত হইল।"

এইভাবেই অপর ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন।

এরপর দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন, "তাঁহাকে উপাসনা করিয়া, তাহার ফল আমি তাঁহাকে পাই।"

যে ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিকার, অচিন্ত্য, তাঁকে উপাসনা করার একমাত্র উপায় ওঁ মন্ত্র জপ করা। দেবেন্দ্রনাথ তেমন করেছেন, এমন উল্লেখ নেই। উপনিষদ পড়লেই ব্রহ্ম উপলব্ধি হয় না। বিড়াল তপস্বী দেবেন্দ্রনাথ যিনি প্রজাদের গলায় বাঁশ দিয়ে নানা রকম অবৈধ কর আদায় করতেন তিনি 'ব্রহ্ম উপলব্ধি' করেছিলেন! এর পরে তো নারীধর্ষক-ডাকাতরাও ব্রহ্ম উপলব্ধি করবে।

এর পরে দেবেন্দ্রনাথ লিখে চলেছেন, "তিনি আমার উপাস্য, আমি তাঁর উপাসক; তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁর ভৃত্য; তিনি আমার পিতা, আমি তাঁর পুত্র;—এই ভাবই আমার নেতা। যাহাতে এই সত্য আমাদের ভারতবর্ষে প্রচার হয়; সকলে যাহাতে এই প্রকারে তাঁহার পূজা করে, তাঁহার মহিমা এইরূপেই যাহাতে সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়, আমার জীবনের লক্ষ্য তাহাই হইল। এই লক্ষ্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য একটি যন্ত্রালয়, একখানি পত্রিকা, অতি আবশ্যক হইল।"

বড়লোকের ছেলের বায়ু চেগেছে তিনি তাঁর হযবরল ধর্ম সারা ভারতে প্রচার করবেন। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্র কিনে ১৭৭৫ শকাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হলো। পত্রিকার একজন সম্পাদক প্রয়োজন, অক্ষয় কুমার দত্তকে সম্পাদক নিয়োগ করা হলো মোটা বেতনে। এই পত্রিকার মাধ্যমে বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্মে র উপাসনা প্রচার করা হবে। হিন্দুরা পূজার সময় যে ওঁ মন্ত্র উচ্চারণ করে সেটা যেন ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোনও দেবতার উপাসনা।

এর পরে দ্বারকানন্দন লিখেছেন, "আমরা ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম। বেদান্তদর্শনকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না; যে হেতুক, তাহাতে শঙ্করাচার্য জীব আর ব্রহ্ম কে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরের উপাসনা করিতে। যদি উপাস্য ও উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে? অতএব বেদান্ত দর্শনের মতে আমরা মত দিতে পারিলাম না। আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনই অদ্বৈতবাদের বিরোধী। শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে লইতে পারিলাম না। যে হেতুক তিনি অদ্বৈতবাদের পক্ষে টানিয়া তাহার সমুদায় অর্থ করিয়াছেন। এই জন্যই ভাষ্যের পরিবর্তে আমার আবার নূতন করিয়া উপনিষদের বৃত্তি লিখিতে হইয়াছিল। যাহাতে ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ রক্ষিত হয়, আমি ইহার সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাতে বৃত্তি করিয়া, ইহার অনুবাদ বাঙ্গালাতে লিখিতে লাগিলাম, এবং তাহা ক্রমে ক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ হইতে লাগিল।

অর্থাৎ, রামমোহনের পথে তিনি নতুন একটি সেমীয় একেশ্বরবাদ নির্মাণ করতে লেগে গেলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠিক করলেন, তাঁর তৈরী ব্রাহ্ম ধর্ম দ্বৈতবাদী হবে। আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ, এইটাই ব্রাহ্ম ধর্মের প্রাণ। উপনিষদকে ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি করতে গিয়ে তিনি দেখলেন, "সোহহমস্মি' তিনিই আমি, 'তত্ত্বমসি' তিনিই তুমি," এইসব লেখা আছে, তখন সেই উপনিষদের উপরও নিরাশ হলেন।

তিনি লিখেছেন," পবিত্র হৃদয়েতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্ম ধর্মের পত্তনভূমি। সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করতে পারি। আর, হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করতে পারি না। সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে উপনিষদ, তাহার সঙ্গে এখন আমাদের এই সম্বন্ধ হইল।"

এক কথায় দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব অদ্বৈতবাদ বাদ দিলেন। দর্জিরা যেমন কাটা কাটা কাপড় থেকে পছন্দমত পোষাক নির্মাণ করে তিনি একটি দর্জির তৈরী ধর্ম 'ব্রাহ্ম ধর্ম' বলে বাজারে চালাতে লাগলেন।

ধনী দ্বারকানন্দনের সঙ্গ করার জন্য কাতারে কাতারে মানুষ ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরে আসতে লাগলো। আবার চলেও যেতে লাগলো কিছুলোক। দ্বারকানন্দনের মনে হলো এর কারণ কেউই এক ধর্মসূত্রে গ্রথিত হয় নি। তিনি ঠিক করলেন একটি প্রতিজ্ঞাপত্র করতে হবে। যারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হবেন তাঁরাই প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে ব্রাহ্ম হবেন। তিনি এই প্রতিজ্ঞাপত্র তৈরী করেছিলেন। আর তৈরী করেছিলেন ব্রহ্ম প্রাপ্তির একটি ত্রিবার্ষিক কোর্স—আজকাল যেমন স্নাতক হওয়ার জন্য ত্রিবার্ষিক কোর্স হয়েছে, সেই রকমই একটা ব্যাপার। তা করতে হবে কী? "প্রণবপূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি, অর্থাৎ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ, আর ত্রিপাদ গায়ত্রী, এই তিন ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন। যে, তিন বৎসর প্রতিদিন নিরালস্য হইয়া প্রণব ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে, সে ব্রহ্ম কে প্রাপ্ত হয়।"

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭৬৫ শকাব্দের ৭ই পৌষ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট উপরোক্ত মর্মে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে ২১ জন ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করলো। রামমোহন কোনও পৃথক একটি ধর্মসম্প্রদায় গড়ে তোলেন নি, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক একটি ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে তুললেন।

হুজুগটা ভালোই তুলেছিলেন দ্বারকানন্দন। ঠিক দু বছর পরে দেখা গেল এর মধ্যে ৫০০ জন প্রতিজ্ঞা করে ব্রাহ্ম হয়েছে। ঐ বছর ৭ই পৌষ তিনি পলতার অপর পারে গোরিটির বাগানবাড়িতে সব ব্রাহ্মদের সমবেত করেন। কলকাতা থেকে ৭/৮ টি বোট ভাড়া করে সবাইকে গোরিটির বাগানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি 'ফল ফুলে শোভিত বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিয়া মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া পরিতৃপ্ত ও পবিত্র' হলেন।

ধর্মদর্জির ফকীরের আলখাল্লা তৈরী

দ্বারকানন্দন দেবেন্দ্রনাথের ফকীরের আলখাল্লা নির্মাণ আগেই তো শুরু হয়েছিল। যিহোভার প্রত্যাদেশ মতো 'পৌত্তলিকতা' বিদ্বেষ, সগুণ ব্রহ্ম ছেঁটে শুধুমাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম গ্রহণ, অদ্বৈতবাদ ছেঁটে শুধুমাত্র দ্বৈতবাদ গ্রহণ, তিন বছরে ব্রহ্মপ্রাপ্তি—এ সব তো চলছিলই। এরপর দেবেন্দ্রনাথের মনে হলো গায়ত্রী মন্ত্র বড় শক্ত। আগে তিনি রামমোহন রায়ের উপদেশ মেনে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করেই ব্রহ্মের উপাসনার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। এখন তাঁর বোধ হলো সাধারণের পক্ষে এ মন্ত্র বড়ই কঠিন। গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ বুঝে ব্রহ্মের উপাসনা করা অনেক সাধনা সাপেক্ষ, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরের পতন' এই ধরণের মানসিকতা না থাকলে এ মন্ত্রে সিদ্ধ হওয়া যায় না। কিন্তু এ রকম মানসিকতা তো হাজারে একজনের থাকে। তবে কি ব্রহ্ম প্রাপ্তি কষ্টসাধ্য বলে মেনে দিতে হবে!

প্রকাশ করো ব্রহ্ম উপলব্ধির সহায়িকা পুস্তক। দেবেন্দ্রনাথ সেই কাজেই মত্ত হয়ে উঠলেন। শ্রদ্ধাপূর্বক দশবার গায়ত্রী জপের বদলে তিনি করলেন 'প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।'

কিন্তু পরব্রহ্মে আত্মা সমর্পণ করতে গেলে একটা শব্দের অবলম্বন তো প্রয়োজন। সে শব্দকে হতে হবে ক্লাস ফাইভের ছেলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। তবেই তো ভালো সহায়িকা! সে শব্দ হবে প্রাচীন কিন্তু প্রচলিত, সহজ ও সুবোধ্য। তাহলেই উপাসকের পক্ষে উপকারী। দেবেন্দ্রনাথ বহু খুঁজে উপনিষদ থেকে সহজ দুটি মন্ত্র আহরণ করলেন। সে মন্ত্র দুটি হলো: 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' আর 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'। এতে তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠলো, যখন দেখলেন সব ব্রাহ্মই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' আর 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' উচ্চারণ করে ব্রহ্মের উপাসনা করছে। কিন্তু তাঁর মনে হলো ব্যক্তিগত উপাসনা শুধু নয়, সমষ্টিগত উপাসনার জন্যও একটি প্রশস্ত উপাসনাপ্রণালী প্রয়োজন। সুতরাং প্রথমোক্ত দুটি মহামন্ত্র প্রথমে উচ্চারণ করে তার সঙ্গে উপনিষদ থেকে আরও তিনটি শ্লোক যোগ করলেন। সে তিনটি হলো ঈশোপনিষদের ৮, মুণ্ডক উপনিষদের ২/১/৩ ও কঠ উপনিষদের ২/৩/৩।

এবার তো পরমেশ্বরের একটা স্তোত্র পাঠ করা প্রয়োজন। সেই জন্য তিনি তন্ত্র থেকে একটা লম্বা শ্লোক জোগাড় করলেম :- তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ, এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য, ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। ....

একটা হৃদয়গ্রাহী ব্রহ্ম স্ত্রোত্র এর সঙ্গে যোগ করার জন্য বেদ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলেন দেবেন্দ্রনাথ। কিন্তু পেলেন না। তখন শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ একটি সুন্দর ব্রহ্ম স্ত্রোত্রের কথা বললেন, যেটা আছে তন্ত্রে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ দেখলেন তার মধ্যে তাঁর দু চোখের বিষ অদ্বৈতবাদ আছে। সুতরাং চলবে না। অতএব তিনি তাঁর দর্জির কাঁচি চালিয়ে তন্ত্রের ব্রহ্ম সূত্র থেকে অদ্বৈতবাদটুকুকে ছেঁটে ফেলে বাকিটুকু জোড়া লাগালেন ফকীরের আলখাল্লাতে।

দর্জি তাঁর তৈরী আলখাল্লা দেখে প্রীত হলেন। তিনি লিখেছেন, 'ইহা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্ম মতে ঈশ্বর বিশ্বস্রষ্টা, তিনি বিশ্বরূপ নহেন। অতএব, প্রথম চরণে বলিলাম, তিনি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ, ও দ্বিতীয় চরণে বলিলাম, তিনি জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়। তাহার পরে, 'নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্ম ণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়,' যিনি এই জগতের কারণ, যিনি জগতের আশ্রয়, তিনি আমাদের মুক্তিদাতা, তিনি ব্রহ্ম , সর্ব্বদেশব্যাপী, ও কালের অতীত, নিত্য।"

পরে তিনি একটি প্রার্থনা রচনা করে উপাসনা প্রণালীর সবশেষে সেটা যোগ করে দিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজে এই উপাসনা প্রণালী ১৭৬৭ শকাব্দে চালু হয়। কিন্তু তখন স্তোত্র সংস্কৃত ভাষাতেই পাঠ হতো। ১৭৭০ শকাব্দের পর সংস্কৃত শ্লোকের বাঙ্গলা অনুবাদ পাঠ হতে থাকে।

উপনিষদ পাগল দ্বারকানন্দন

উপনিষদ পাগল দ্বারকানন্দন একদিকে যেমন ধর্ষণ করছিলেন উপনিষদকে, অন্যদিকে তেমনই উপনিষদে মুগ্ধ।

উনি নাকি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা ভেবেছিলেন সেটাই পেয়ে গেছেন উপনিষদে। তিনি পেয়েছিলেন 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। এখন তিনি স্পষ্ট জানতে পেরেছেন, প্রকৃতির উপর একজন নিয়ন্তা আছেন। তাঁর এক কশাঘাতে সব চলছে। তিনি মহারাজা, তিনি আমাদের পিতা, মাতা, বন্ধু, এটুকু জেনেই তিনি নির্ভয় হলেন, তাঁর উপাসনা করে কৃতার্থ হলেন।

তিনি উপনিষদ পড়েই নিরাকার ব্রহ্মকে পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "কত লোক ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া ছুটিতেছে, কতলোক বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে, কত লোক জগন্নাথ ক্ষেত্রে, কত লোক দ্বারকা হরিদ্বারে, তাহার গণনা নাই। ইতস্ততঃ দেবমন্দিরসকল দেবের আবির্ভাবে পরিপুরিত, ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত, মঙ্গল ধ্বনিতে নিনাদিত। কিন্তু আমার কাছে তাহা সকলই শূন্য।"

হবেই তো, তিনি আগে তো যিহোভার প্রত্যাদেশ বাক্যে বিশ্বাস করে বসে আছেন।

এর পরেও তিনি লিখে গেছেন, "কখন আমি আমার উপাস্য দেবতাকে দেখিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব, কখন আমার হৃদয়ের ভক্তি উপহার দিয়া তাঁহাকে পূজা করিব, কখন তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিব,—জলাভাবে পিপাসার ন্যায় আমার এই বলবতী স্পৃহা আমাকে কঠিন দুঃখ দিতেছিল।"

তাঁহার যে উপাস্য দেবতা নিরাকার, তাঁকে তিনি দেখার আকাঙ্ক্ষা করেন, অর্থাৎ, এঁড়ে গরুর দুধ খেতে চান!

তা এঁড়ে গরুর দুধ তিনি খেলেন। তিনি লিখেছেন, "আমি দেখিলাম,'অয়ম্ অস্মি ন্নাকাশে তেজোময়ো হমৃতময়ঃ পুরুষ, সর্ব্বানুভূঃ', এই সর্ব্বজ্ঞ তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই আকাশে। এই জগন্মন্দিরে জগন্নাথকে দেখিলাম। তাঁহাকে কেহ স্থাপিত করিতে পারে না, তাঁহাকে কেহ হস্ত দিয়া নির্মাণ করিতে পারে না, তিনি আপনাতেই আপনি নিত্য স্থিতি করিতেছেন। আমি আমার সেই প্রাণদাতা উপাস্য দেবতাকে পাইলাম, এবং নির্জনে সজনে তাঁহার উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। আমি যে আশা করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলাম, সে-আশা আমার পরিপূর্ণ হইল।"

মানুষটা তাঁর জগাখিচুড়ি ধর্মচর্চা করে ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন বলছেন। কোন মানুষটা? যার জমিদারীতে বাইশ রকম বে-আইনী কর চাপানো হতো অসহায় প্রজাদের উপর। না দিলে ব্রাহ্ম মন্দির থেকে বেরিয়েই শায়েস্তা করতে প্রজাদের জুতা পেটা করতেন দেবেন্দ্রনাথ।

এ হেন মানুষই আবার ঈশ্বর দর্শনের কথা বলতেন। এবং বহু মানুষকে তাঁর জগাখিচুড়ি 'ধর্মের' কোলে টেনে এনেছিলেন। যে ধর্মের মূল তত্ত্ব আখেনাতন, তথা মোজেসের নিকট থেকে আহরিত। তাঁর সুবিধা ছিল একটাই—প্রচুর টাকা; সেই টাকায় বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণকে কিনে নেওয়া যেত। কিছু গুলগাপ্পা উচ্চারণ করে যদি মাসের শেষে লম্বা একটা বেতন পাওয়া যায়, গরীব ব্রাহ্মণের তাতে তো আপত্তি করার কিছু নেই। শুধু মন্ত্র উচ্চারণ নয়, অচিন্ত্য ব্রহ্মের গুণগান করে ব্রহ্ম সঙ্গীত বলে একধরণের আজগুবি গান রচনা করা হয়েছিল। সেইগুলি গেয়ে কিছু গায়ক দু-পয়সা উপায় করছিল। আসলে ব্রহ্ম সঙ্গীত ছিল সগুণ ব্রহ্মের স্তুতি। দেবেন্দ্রনাথের নিরাকার ব্রহ্মের স্তুতি নয়।

গায়ত্রী মন্ত্র সর্বসাধারণের উপযুক্ত নয় বলে তা পাল্টে দিয়েছিলেন উপাসনা পদ্ধতি থেকে। কিন্তু সেই গায়ত্রীরই প্রেমে পড়ে গেলেন দেবেন্দ্রনাথ। তিনি গায়ত্রী জপে মজে গেলেন। সেই গায়ত্রী জপ করেই তিনি আশাতীত ফল পেলেন। তাঁর দর্শন পেলেন, তাঁর আদেশ শ্রবণ করলেন, এবং তাঁর একেবারে সঙ্গী হয়ে উঠলেন। তিনি দেখতেন, "তিনি গুরুর ন্যায় নিয়ত আমার হৃদয়ে বসিয়া আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, সৎকর্মে চালাইতেছেন।"

প্রজাদের আখমাড়াই কলে পিষে টাকা বের করা সেটাও গায়ত্রী প্রণোদিত সৎকর্ম নাকি?

দেবেন্দ্রনাথ স্বরচিত দর্জির তৈরী ফকীরের আলখাল্লাসদৃশ ব্রাহ্ম ধর্মকে প্রচারের জন্য উপনিষদকে মাধ্যম করতে চাইলেন। উপনিষদ সগুণ ব্রহ্ম কে যেমন দেখিয়েছে, তেমনই বলেছে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা। উপনিষদ ব্রহ্মার কথা বলেছে সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে। পরবর্তীকালে হিন্দুরা ব্রহ্ম কে সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় কর্ত্তারূপে ব্রহ্মা। বিষ্ণু মহেশ্বরকে কল্পনা করেছে। কারণ, হিন্দুরা তো আখেনাতন তথা যিহোভার প্রত্যাদেশ দ্বারা গ্রস্ত হয় নি। তাঁরা ব্রহ্মের নানা মহিমার নররূপ নির্মাণ করেছে, প্রতিমাও গড়েছে। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তন্ত্র-পুরাণেতেই পৌত্তলিকতার আড়ম্বর। বেদান্ত পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দেন না। তন্ত্র-পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া যদি সকলে এই উপনিষদ অবলম্বন করে , যদি উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া সকলে ব্রহ্মোপাসনাতে রত হয়, তবে ভারতবর্ষের অশেষ মঙ্গল লাভ হয়।"

দেবেন্দ্রনাথ একটু আগেই মত প্রকাশ করেছেন যে, গায়ত্রী মন্ত্র খুব কঠিন, সাধারণ মানুষ এই মন্ত্রের মর্ম বুঝতে পারে না। আগে তিনি রামমোহন রায়ের উপদেশ মেনে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করেই ব্রহ্মের উপাসনার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। তাঁর বোধ হলো সাধারণের পক্ষে এ মন্ত্র বড়ই কঠিন। গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ বুঝে ব্রহ্মের উপাসনা করা অনেক সাধনা সাপেক্ষ, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরের পতন' এই ধরণের মানসিকতা না থাকলে এ মন্ত্রে সিদ্ধ হওয়া যায় না। কিন্তু এ রকম মানসিকতা তো হাজারে একজনের থাকে। এখন সেই দেবেন্দ্রনাথই আকাঙক্ষা করছেন, সকলে উপনিষদ অবলম্বন করুক ব্রহ্ম বিদ্যা অর্জন করার জন্য ! উপনিষদ কিছুই বোঝেনই নি এই জমিদারের নন্দন জমিদার। তাঁর অনুসারীরা তো দূরস্থান। ব্রহ্ম বিদ্যা ছেলের হাতের মোয়া নয়। একশোবার উপনিষদ পড়ে মোহিত হলেও কেউ ব্রহ্ম বিদ্যা অর্জন করে না। আর বেদেতেও প্রতিমা পূজার কথা আছে। সুতরাং প্রতিমাপূজাকে দূর ছাই করার মানসিকতার কোনও সঙ্গত কারণ নেই, যিহোভার অনুসারী হওয়া ছাড়া।

দেদার টাকা খরচ করে প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র একটি ব্যাপক হুজুগ সৃষ্টি করলেন।

কিন্তু, লক্ষ করার বিষয়, দেবেন্দ্রনাথের ব্যবস্থা করা পদ্ধতিতে ব্রহ্ম উপলব্ধি হয় না। সুতরাং ব্রাহ্ম ধর্মে কোনও পরলোক তত্ত্ব নেই। বাস্তবে ব্রাহ্ম রা নাস্তিক।

দুই

কেশব চন্দ্র সেন: খ্রিষ্টপাগল ব্রাহ্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা আলোচনা করতে গেলে কেশব চন্দ্র সেনের কথা বলতেই হয়। একদিকে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল রামকৃষ্ণের, অন্যদিকে রামকৃষ্ণের যুবক শিষ্যরা ছিলেন প্রথমে কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের, পরে তার থেকে ভেঙ্গে তৈরী হওয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য।

কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম কলকাতার কলুটোলার এক বিশিষ্ট ও ধনী বৈদ্য পরিবারে। ঐ পরিবার ছিল বৈষ্ণব। তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী ছিলেন।

কেশবচন্দ্র কলেজ প্রথম জীবনে বাইবেল পড়ে খ্রিষ্টধর্মের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, একটা আগাম মুগ্ধতা নিয়েই কেশবচন্দ্র বাইবেল পড়েছিলেন;খুঁটিয়ে বিচার করে পড়েন নি। আর ওল্ড টেস্টামেন্ট যে পড়েন নি, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সময়টা হচ্ছে এমন, যখন ইংরেজ জাতি দিগ্বিজয়ী। তাদের যাবতীয় সাফল্যের কৃতিত্ব তাদের ধর্মমতের, এ রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরী করে দেওয়া ও মেনে নেওয়া হয়েছে। আসলে ছাপাখানা আবিষ্কারের পর মানুষের সঙ্গে মানুষের মানসিক যোগাযোগের সুবিধার ফল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের চিন্তা চেতনার একটা বিপুল পরিবর্তন আসে। ধর্মকে পাশে সরিয়ে রেখে মানুষ জনকল্যাণের কথাও ভাবতে থাকে। এই সব ধর্মেতর ব্যাপারগুলিকেই এদেশের কিছু মানুষ এখনও খ্রিষ্টধর্মের দান বলে ভাবেন। সেই জন্য, সন্তানের নাম দেন যিশু। এটা কাছা খোলা হিন্দুর কদর্য্য কাজ। খ্রিষ্টানরা হিন্দুদের পাপী বলেই ভাবে, বলে হিদেন, জেন্টু।

উনিশ শতকে বাঙ্গালীর সবচেয়ে উপকারী মানুষ ছিলেন ডেভিডহেয়ার। ভদ্রলোক কিন্তু নাস্তিকতার জন্য খ্রিষ্টীয় কবরখানায় স্থান পান নি। ডেভিড হেয়ার তাঁর পরোপকার প্রবৃত্তি কোথা থেকে পেয়েছিলেন? নিশ্চয় খ্রিষ্টধর্ম থেকে নয়!

যাই হোক দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্ম হুজুগ তুলেছিলেন, কেশবচন্দ্র গ্রস্ত হলেন তার দ্বারা। এ বিষয়ে সঞ্চালকের কাজ করলেন দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিই

কেশবচন্দ্রের 'গুডউইল ফ্রাটারনিটি' নামক সংস্থার এক সভায় পিতা দেবেন্দ্রনাথকে নিয়ে আসেন। দেবেন্দ্রনাথ বেশ কিছু সম্পন্ন ব্রাহ্ম দের সঙ্গে ঐ সংস্থার অধিবেশনে যোগ দেন। দেবেন্দ্রনাথের চেহারা, ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য উপস্থিত যুবকদের মোহিত করে। সভায় দেবেন্দ্রনাথ বক্তব্যও রাখেন। কেশবচন্দ্র মুগ্ধ হন দেবেন্দ্রনাথকে দেখে। এর পর দেবেন্দ্রনাথ যখন সিমলায় তখন কেশবচন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করার অভিপ্রায় জানান। ঐ চিঠিতে দেবেন্দ্রনাথকে তিনি 'ধর্মতাত' বলে উল্লেখ করেন।

এর পরবর্তী ঘটনা হলো দেবেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরলে সংবাদ পেলেন যে কেশবচন্দ্র 'ব্রাহ্ম ধর্মের লক্ষণ' বইটি পড়ে গোপনে অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করে ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হয়েছেন।

কেশবচন্দ্র কিন্তু নিজের বাড়ির লোকের কাছে নিজের ধর্মভাবের কথা বেশীদিন গোপন রাখতে পারলেন না। তাঁদের পরিবারে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার একটা ব্যাপার ছিল। গুরুজনদের অভিলাষে একবার দুই জ্যেঠতুতো দাদার সঙ্গে কেশবের দীক্ষার কথা হলো। দিন স্থির করে তাঁর দীক্ষার ব্যবস্থাও হলো। কেশবচন্দ্র দীক্ষা না নিয়ে ভোরবেলাতেই পালালেন বাড়ি থেকে। দেবেন্দ্রনাথের বাড়ি গিয়ে সেখানেই কাটালেন সারা দিন। দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য দীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে কোনও মতামত দিলেন না। কেশবকেই বেছে নিতে বললেন পথ। কেশবজননী সারদাসুন্দরী মনে করলেন কেশব বোধ হয় খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। কিন্তু বেশী রাতে কেশব ফিরে এলেন নিজের মার কাছে। একখানি বই ও একটি কাগজ ফেলে দিলেন মায়ের কোলে। কাগজটিতে লেখা :

তুমি কার কে তোমার
তুমি কারে বলবে আপন
মিছে মায়ার নিদ্রাবশে
দেখেছো স্বপন।

গানটি পড়ে কেশবজননী প্রচুর সন্তুষ্ট হলেন। ছেলে আর যাই হোক খ্রিষ্টান হয়ে যায় নি।

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে 'ব্রহ্ম বিদ্যালয়' খোলা হলো। রবিবারের সকালে এর অধিবেশন বসতো। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গলাতে আর কেশবচন্দ্র সেন ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা দিয়ে যেতেন সুপুরুষ কেশবচন্দ্র।

দেবেন্দ্রনাথ নিজেদের জমিদারীর প্রজাদের কাছ থেকে বৈধ খাজনা ছাড়াও নানারকম অবৈধ কর, যা ফার্সী ভাষায় 'আবওয়াব' বলে তা পীড়ন করে আদায় করতেন। সেই টাকায় দেদার দান ও পেটোয়া পোষা ছাড়াও দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিংহল গিয়েছিলেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনকে। সেকালে সমুদ্রযাত্রা ছিল নিষিদ্ধ। তাই কেশবের সমুদ্রযাত্রা নিয়ে ভীত হয়ে উঠেছিলেন কেশব জননী। এই সিংহল সফরের মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ কেশবকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করে ফেললেন। সত্যেন্দ্রনাথের ডায়েরী পড়ে দেখা যায় একদিন দুপুর বেলা তিনি বলছেন, "এই ধর্মবৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য বলিদান চাই। দুই দিনজনের রক্ত পেলেই বৃক্ষ সারবান হবে।"

কেশবের অন্তরে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মালো। সিংহলে গিয়ে তাঁর লক্ষ্য গেল বৌদ্ধধর্মের প্রচারের দিকটায়। কেশবচন্দ্র ঠিক করলেন প্রচারের দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্মকে সর্বত্র পৌঁছে দেবেন।

এই সময় কলুটোলার বাড়ির একতলার ছোট একটি ঘরে কেশবচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে নানারকম আলোচনা করতেন। দেবেন্দ্রনাথ এই সভার নাম দিয়েছিলেন 'সঙ্গত সভা'। আলোচনা হতো, পৈতা ত্যাগ, স্ত্রীশিক্ষা, 'পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন' ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি নিয়ে। এই যুবকদল দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতেও আড্ডা দিতেন। সেখানে তাদের চা জলখাবারের ঢালাও ব্যবস্থা ছিল। কখনও কখনও রাতের আহারও সমাপন হতো দেবেন্দ্র ভবনে। কিন্তু কেশবচন্দ্রের পক্ষে দেবেন্দ্রভবনে রাতের আহার গ্রহণ করাটা অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। একে পিরালী ব্রাহ্ম ণ, তায় ব্রাহ্ম ! এটা কিছুতেই মানতে পারেন না কেশবচন্দ্রের বৈষ্ণব অভিভাবকরা। দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে বিলক্ষণ মুরগীর মাংসের প্রচলন ছিল। কেশব অবশ্য নিরামিষ খেতেন বরাবর।

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ই এপ্রিল একটি উৎসব করে কেশবচন্দ্রকে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য করে নিলেন। ঐ উৎসবে সস্ত্রীক যোগ দিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্র এর জন্য মায়ের অনুমতি নিয়েছিলেন। কিন্তু জ্যেঠামশাই হরিমোহন সেন বাড়ির গেটে তালা দিয়ে রেখেছিলেন, যাতে কেশব স্ত্রীকে নিয়ে যেতে না পারেন। কিন্তু খুব সকালে উঠে দ্বারোয়ানকে আদেশ দিয়ে গেট খুলিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে যান কেশব। স্ত্রীকে পালকীতে চড়িয়ে নিজে হেঁটে কলুটোলা থেকে উপস্থিত হন জোড়াসাঁকোয়। উৎসব শেষে আর বাড়িতে ফিরে যান নি কেশবচন্দ্র। এই অনুষ্ঠানে কেশবচন্দ্র ছাড়াও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও অক্ষয় কুমার মজুমদার সস্ত্রীক যোগ দেন। এঁরা ছিলেন কেশবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সম মতাবলম্বী।

শেষ পর্যন্ত ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নিলেন কেশব চন্দ্রের অভিভাবকরা। কিন্তু, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সম্পর্ক চিরকাল মধুর হয়ে রইল না। নীতিগত প্রশ্নে বিচ্ছেদ ঘটলো দুজনের মধ্যে। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে সমাজ সংস্কারের একটি হাতিয়াররূপে দেখতে চেয়েছিলেন। আর ধর্মের দিক দিয়ে কেশবচন্দ্র ছিলেন রামমোহন রায়ের মতো সর্বজনীন ধর্মবাদী।

কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। জাতিভেদ প্রথা, বহুবিবাহ ইত্যাদির উচ্ছেদকামী। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় ব্রাহ্মিকাদেরও যোগদান করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়ির মেয়েদের ব্রাহ্ম সমাজে আনতে কিছুতেই রাজী নন। তিনি এ ধরণের ব্যাপক পরিবর্তনে গররাজী ছিলেন। জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদ মানে বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিয়ে। একে পিরালী ব্রাহ্মণ হওয়ার কারণে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে তাঁর প্রচুর ঝামেলা; তার উপর যদি জাত না মানেন তবে সমস্যা দাঁড়াবে পর্বত প্রমাণ। আর তিনি ছিলেন প্রবল মিশনারীবিরোধী। মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফের বিরুদ্ধেলাগাতার যুদ্ধ করেছিলেন তিনি। যার ফলে ডাফ হতাশ হয়ে ফিরে যান দেশে। মিশনারীদের দ্বারা হিন্দুদের ঘর ভাঙ্গুক, এটা তিনি মোটেই চাইতেন না। তাই তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না

কেশবচন্দ্রের খ্রিষ্টপ্রেম। তিনি যিহোভার প্রত্যাদেশ মেনে বিগ্রহ, শালগ্রাম শিলা ও অগ্নি ব্যাতিরেকে হিন্দু ধর্মের যাবতীয় প্রথা মানতে মনস্থ করেছিলেন। বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি কর্মগুলি ব্রাহ্ম মতে করার জন্য তিনি ব্রাহ্ম পুরোহিত দর্পণ তৈরী করেছিলেন; ছেলেমেয়েদের বিয়ে পৈতেও দিয়েছিলেন সেইভাবে।

দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্য আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে জড়িত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের ও শোষণের ফলে বাঙ্গলায় একটি নতুন অর্থব্যবস্থা গড়ে ওঠে। অল্পবিস্তর ইংরেজী শিখে ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করে, ইংরেজ বণিকদের ব্যবসাকেন্দ্রে ও কোম্পানী সরকারে চাকরী করে বহু বঙ্গসন্তান অর্থবান হয়ে ওঠেন। এই বঙ্গসন্তানরা সবাই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এর মধ্যে প্রচুর কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্য জাতি ছিল। তারা ব্রাহ্মণদের মতো ধর্মীয় ক্ষেত্রে কিছু সম্মানীয় স্থান দাবী করছিল।

১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের ২রা আগস্ট কেশবচন্দ্রের উৎসাহে পার্বতীচরণ গুপ্তের সঙ্গে এক বালবিধবা বৈষ্ণবকন্যার বিয়ে হয়। দেবেন্দ্রনাথ বাধাও দেননি, উৎসাহও দেননি। তিনি বিধবা বিবাহ বা ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ কোনওটাই পছন্দ করছিলেন না। ফলে তিনি ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে একটি ট্রাস্ট ডিড দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজের কর্তৃত্বভার নিজের হাতে নেন।

কিন্তু কেশবচন্দ্র সুদর্শন তরুণ, যেমন বক্তৃতা দিতে পারেন, তেমনই গাইতে পারেন গান। তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গেল। কেশব সমাজ সংস্কারের জন্য ছটফট করছেন, দেবেন্দ্রনাথ তাতে রাজী নন। কেশব সকলের সঙ্গেই মিশতে পারতেন অবাধে। দেবেন্দ্রনাথের ছিল প্রবল আভিজাত্য বোধ। কেশব প্রথমে আলাদাভাবে প্রতিনিধি সভা করলেন। এই সভাতে যোগ দিল প্রচুর ব্রাহ্ম। গুরু শিষ্য একে অপরকে ভালবাসেন;কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর বিশাল পার্থক্য। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটলো। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে আষাঢ় দেবেন্দ্রনাথ কেশব গোষ্ঠির নিকট থেকে একটি চিঠি পেলেন। চিঠির স্বাক্ষরকারী ছ' জন 'নিতান্ত বশম্বদ'। এঁরা হলেন, কেশবচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ, যদুনাথ, নিবারণচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র। চিঠিতে কেশবরা প্রস্তাব দিলেন : ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বা উপাচার্য বা অধ্যেতা কেউ সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদসূচক কোনও চিহ্ন ধারণ করবেন না। সাধু, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্মরাই কেবল বেদীর আসনের অধিকারী হবেন। ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও উপদেশে ব্রাহ্মধর্মের উদার প্রশস্ত ও নিরপেক্ষ ভাব প্রকাশ পাবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণাসূচক বাক্য উহাতে ব্যবহৃত করা হবে না। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা উহার উদ্দেশ্য থাকবে। যতদিন না উপাসনা সম্পর্কে উপরে লিখিত নতুন প্রণালী অবলম্বনে আপনি স্বীকৃত না হন, ততদিন সাধারণ ব্রাহ্মদের ঐ প্রণালী অনুসারে অন্য একদিন উপাসনা করতে দিয়ে বাধিত করবেন। যদি এতেও আপনি অস্বীকৃত হন, তবে আমাদের পৃথক ব্রাহ্মসমাজ গঠন করার বিষয়ে সৎ পরামর্শ দেবেন।

মাত্র চারদিনের মধ্যেই চিঠির উত্তর দিলেন দেবেন্দ্রনাথ। প্রতিটি প্রস্তাব বিশদভাবে আলোচনা করে তাতে অস্বীকৃতি জানালেন তিনি। কারণ, তিনি হিন্দুসমাজকেই উন্নত করার তাগিদে ব্রাহ্মধর্মের

পত্তন করেছিলেন। হিন্দুধর্ম নষ্ট করার জন্য নয়, আলেকজান্ডার ডাফদের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য নয়। কিন্তু খ্রিষ্ট অনুরাগী কেশবচন্দ্রকে আটকানো সম্ভব নয়। তাই চিঠির শেষে জানালেন, একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের উপাসনা বিস্তারের জন্য যত ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় ততই মঙ্গল।

কেশবচন্দ্ররা এর পর ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের জন্য পূর্ববঙ্গে চলে গেলেন। পরের বছর জানুয়ারীতে যে মাঘোৎসব হলো, তাতে কেশবচন্দ্ররা সদলে সমাজের মহিলাদের নিয়ে সমবেতভাবে উপাসনা করলেন।

এর পরে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মিকাদের নিয়ে ডঃ রবসন নামক এক খ্রিষ্টান পাদ্রীর সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দিলেন।

মে মাসে কেশবচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ অডিটোরিয়ামে 'জেসাস ক্রাইষ্ট, এসিয়া অ্যান্ড ইউরোপ' নামে এক বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি যিশুর প্রতি এমন প্রগাঢ় ভক্তি দেখালেন যে গভর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স থেকে আরম্ভ করে কলকাতার খ্রিষ্টান সমাজ ধরে নিল কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে আর একটা বড় মাছ ধরা পড়েছে খ্রিষ্টধর্মের জালে। ব্রাহ্ম সমাজে নিন্দার ঝড় বহে গেল। সেই থেকে কেশবচন্দ্রের খ্রিষ্টান অপবাদ কোনও দিন দূর হয় নি। অপবাদের আগুনে আরও অক্সিজেন জোগাল কেশব গোষ্ঠীর বড়দিনে যিশুকে ধ্যান করা, যিশুর নামে গান লেখা, যখন তখন যিশু কীর্তন করা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেশব চন্দ্র কি বাইবেল নিষ্ঠভাবে পড়েছিলেন? এর উত্তর একটি স্পষ্ট 'না'।

কেশবচন্দ্রের বাইবেল অনেকটা কান দিয়ে পড়া। মহারাণীর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না। তার কারণ, অনেকেই ভাবতেন, মহান খ্রিষ্টধর্মের জন্যই সাদা চামড়ার মানুষগুলি এতো ক্ষমতাবান। তিনিও তাই ভাবতেন। বাইবেলে এ সবের কতোটা কি আছে, তা কেউ পড়ে দেখলো না। কেশবচন্দ্রও যে ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট খুঁটিয়ে পড়েন নি তা বলাবাহুল্য। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার আগেই কেশবচন্দ্র একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। বিভিন্ন ধর্মের ভালো ভালো বাণী নিয়ে একটা সংকলন প্রকাশ করলেন। এই ধর্মগুলির মধ্যে রইল ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মও। এই বই রচনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ বসু, অঘোরনাথ, গৌরগোবিন্দ রায় ও অমৃতলাল বসু।

কিন্তু, বাঘ-সিংহ ইত্যাদি পশু দেখতে সুদর্শন। গোখরো সাপও দেখতে সুদর্শন। আগে ধনী লোকেদের বাড়ীতে বাঘের চামড়ার মধ্যে খড় ঢুকিয়ে বৈঠকখানায় সাজিয়ে রাখা হতো। কিন্তু ঐ দৈহিক সৌন্দর্যটাই বাঘ সিংহের সব নয়। বনের মধ্যে বাঘ, সিংহ, কি গোখরো সাপ কালান্তক যম। বুদ্ধিমান মানুষ বাঘের সব সংবাদটাই রাখবে। ধর্মশাস্ত্রের সবটাই জানবে। শুধু কিছু ভালো ভালো বাণী নয়। পুরোটা না পড়ে কোনও ধর্মকে সৎচরিত্রের তুষ্টিপত্র দেবে না।

কিন্তু কেশব চন্দ্র সেন বাঘ-সিংহের সব খবর রাখেন নি। তিনি কাছা খোলা কালিদাসের মতো 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' করতে গেছেন খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের সঙ্গে।

ঘটনা হচ্ছে, অনেক মুসলমান ও সাহেব খ্রিষ্টানও ব্রাহ্ম সমাজে ঢুকেছিল। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, যখন ডিরোজিওর শিষ্যরা গোমাংস খেতে শুরু করেছিল, তখন আনন্দে মিশনারী আলেকজান্ডার ডাফ লিখেছিলেন, শত্রুরা এখন দুর্গের বাইরে চলে এসেছে।

ব্রাহ্ম রা তো প্রথম থেকেই যিহোভার প্রত্যাদেশ মেনে 'পৌত্তলিকতা' বিরোধী হয়ে বসেছিল। চলে এসেছিল দুর্গের বাইরে। এখন মুসলমান আর খ্রিষ্টানদের সঙ্গে 'যত মত তত পথ' করছে। সাহেবেরা আর বুদ্ধিমান মুসলমানরা অপেক্ষা করছিল, কখন পাকা আমটা ঝরে পড়বে। পাকা আমটা আর শেষ পর্যন্ত ঝরে পড়েনি। কিন্তু কিছু কিছু ধর্মান্তর ঘটেছিল। খ্রিষ্টানীতে এবং ইসলামে। মুসলমান আর খ্রিষ্টানরা অবশ্য তাদের সত্তা পুরোপুরি বজায় রেখে ব্রাহ্ম দের সঙ্গে মিশেছিল।

ঢাকা শহরের শিক্ষিত মুসলমানরা ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা শুনতে আসতেন। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের উৎসবে কেশবচন্দ্র যখন তৃতীয়বার ঢাকায় গিয়েছিলেন, তখন খাজে আবদুল গণি ও খাজে আহসানউল্লা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু জালালউদ্দিন নামক একজন মুসলমান ছাত্র যখন ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করলেন তখন মুসলমানরা ক্রুদ্ধ হয়ে জালালকে পীড়ন করতে শুরু করলেন। বছর চারেক পরে জালাল ব্রাহ্ম দের দ্বারা পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে বিয়ে করলেন। অনুমান করতে অসুবিধা নেই ঐ ছাত্রীটিকে বিয়ে করবার জন্যই জালালের ব্রাহ্ম ভক্তি।

রজনীকান্ত গুহের আত্মচরিতে আমরা দেখি, একবার মাঘোৎসবে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন আচার্যের কাজ করেছিলেন মহর্ষি হরিনাথ মজুমদার তাঁর 'ফিকিরচাঁদের দল' নিয়ে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য এসেছিলেন। সঙ্গীত যখন পুরোদমে চলছে তখন একটি সঙ্গীতে 'যবন' শব্দ শুনে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের মুসলমান নেতা হামিদুদ্দিন আহম্মদ প্রতিবাদ করে সঙ্গীতে বাধা দিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন 'যবন' শব্দের অর্থ 'বলবান', এর মধ্যে অবজ্ঞাব্যঞ্জক কিছু নেই। কিন্তু হামিদুদ্দিন কিছুই শুনতে রাজী নন, শেষপর্যন্ত গান বন্ধই রইল।

পূর্ববঙ্গে প্রচার কার্যক্রমে ঘুরে বেড়ানোর সময় যখন বহুলোক ব্রাহ্ম দের আশ্রয় দিত না, তখন প্রচারকরা মুসলমানদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করতেন।

কেশবচন্দ্ররা দেবেন্দ্রনাথ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। পয়লা নভেম্বর ১৮৬৬'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় ঘোষিত হলো, ১৯ শে নভেম্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হবে। ১৯ শে নভেম্বর প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই প্রায় দু শো মানুষ সমবেত হলেন সভাগৃহে। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' গঠনের কথা ঘোষিত হলো। উদ্বোধন করলেন কেশবচন্দ্র।

তিনি বললেন, যাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিজ মঙ্গল সাধন ও এবং ব্রহ্ম জ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের উদ্দেশ্যে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের' নামে সমাজবদ্ধ হোন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ হলো, ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে দেশ, জাতি

ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রগতিশীল একটি বিশ্বধর্ম স্থাপন। এক ঈশ্বর, এক সত্য ও এক মানব সমাজ সভ্যতার নিয়তি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বসে এমন কাছাখোলা কালিদাস মার্কা কথা বলছেন কেশবচন্দ্র। তিনি জানেন না কি খ্রিষ্টধর্ম কি ইসলাম, কেউই অন্য কোনও ধর্মকে স্বীকার করে না। তখন পৃথিবীতে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দুটি সেমীয় ধর্ম!

১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠার পর সবাই মিলে দেবেন্দ্রনাথকে এক অভিনন্দন পত্র দিলেন।

নবগঠিত সমাজের সম্পাদক হলেন কেশবচন্দ্র। সভাপতি স্বয়ং ঈশ্বর। নতুন ব্রাহ্ম সমাজ আবার খোল কর্ত্তাল নিয়ে কীর্ত্তন শুরু করলেন। এটা ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে নতুন সংযোজন। এবার ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে নতুন সভাগৃহ নির্মাণের চিন্তা এলো ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের। মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে এক খণ্ড জমি পাওয়া গেল। কিন্তু টাকা কোথায়? খোল, কর্ত্তাল, পতাকা ও সংকীর্তনের দল নিয়ে কেশবচন্দ্র উত্তর ও মধ্য কলকাতা চষে ফেললেন। সঙ্গে আবেদন, আমরা উপাসনা মন্দির গড়ব বলে সাহায্য চাইছি। মেছুয়া বাজারের জমিটা কিনে ফেলা হলো। মন্দির তৈরীর টাকা উপাসকরা তাদের আয় থেকে দেবেন। অমৃতলাল বসু মন্দির তৈরীর ভার নিলেন। এক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৈরী হলো সমাজ ভবন।

২৩ শে জানুয়ারী ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাহ্ম মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করে কেশবচন্দ্র বললেন, এই ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য, ভারতবর্ষের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। যত সত্য পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, পূর্বে ছিল, এখনও আছে এবং অনন্তকাল থাকবে তার প্রতি শ্রদ্ধা করবার, সাধু উপদেশে ভক্তি রাখবার সহজ উপায়স্বরূপ এই মুক্তিপ্রদ উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠা করতে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

এ দিন একুশজন ব্রাহ্ম দীক্ষা নিলেন কেশবচন্দ্রের কাছে। এঁদের মধ্যে ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ।

সন্ধ্যাবেলা টাউন হলে সভার আয়োজন। বক্তা কেশবচন্দ্র। বক্তৃতার বিষয়, ভাবী ধর্মসমাজ।

কাছাখোলা কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতায় মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের পটভূমিকায় ভাবী ধর্মসমাজের রূপ তুলে ধরলেন। বললেন, কোনও ধর্মই সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল ধর্ম থেকেই সত্য গ্রহণ করবে। এই নবধর্মের আদর্শ হলো—ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও সর্বমানবের ভ্রাতৃত্ব। এই নবধর্মের বেদীতলে একদিন হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান সবাইকে একদিন মিলিত হতে হবে। এই মিলিত হওয়াই বিবর্তিত মানবসমাজের নিয়তি—নির্দিষ্ট পরিণতি।

নতুন একটা হুজুগের সৃষ্টি হওয়াতে দলে দলে লোক ব্রাহ্ম হতে লাগলো। ব্রাহ্ম ধর্ম বাঙ্গলার সীমা ছাড়িয়ে বাইরেও ছড়িয়ে পড়লো।

ভাবাবেগে উন্মত্ত কেশবচন্দ্র ভাবলেন বিলেতের লোককেও ব্রাহ্ম করতে হবে। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে তিনি সদলে ইংলণ্ড উপস্থিত হলেন। ইংলণ্ডের খ্রিষ্টানদেরও উৎসাহ

প্রবল। 'খ্রিষ্টভক্ত ব্রাহ্ম' কেশবচন্দ্র আসছেন এ দেশে। এই রকম একটি লোককে যদি খ্রিষ্টান করা যায়, তবে গোটা ভারত খ্রিষ্টান হয়ে যাবে।

অজস্র সভায় বক্তৃতা করলেন কেশবচন্দ্র। রাণী ভিক্টোরিয়াও তাঁকে সাক্ষাতকার দিলেন। কিন্তু নেহাৎ লুকোচুরি খেলা হলো গোটা ব্যাপারটা। কেশবচন্দ্র খ্রিষ্টান হলেন না। ব্রাহ্ম ধর্মও ইংলণ্ডে পা ফেলতে পারলো না।

কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম ধর্মকে ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা বিড়ালকে ইঁদুরে পরিণত করার মতো অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু বিড়াল প্রায়শই ইঁদুর ধরতে ব্যর্থ হয়। কেশবচন্দ্রকে ধরতে ব্যর্থ হলো খ্রিষ্টীয় বিড়াল।

বোম্বাইতে জাহাজ থেকে নেমে বিশাল সম্বর্ধনা পেলেন কেশবচন্দ্র। যদিও একটি ইংরেজও তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত হলো না।

কলকাতাতেও উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন কেশবচন্দ্র। ব্রাহ্ম সমাজের বাইরের মানুষরাও তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। ব্রাহ্ম দের তিনি বিলাত ভ্রমণের ফলাফল জানালেন।

বিলাতে তিনি মধ্যবিত্তদের 'হোম' দেখেছিলেন। অনেকগুলি পরিবার একত্র হয়ে একজায়গায় বাস করে, এক রান্নাঘরে খায়। তিনি এই ধাঁচে ব্রাহ্ম দের থাকার জন্য 'ভারতাশ্রম' স্থাপন করলেন। সেখানে অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবার থাকতে শুরু করলো। প্রথমে কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রীটে পরে বেলঘরিয়ায় জয়নারায়ণ সেনের বাগানবাড়ীতে।

কিন্তু, অচিরেই বাঙ্গালীদের এই আশ্রমে ভাঙ্গন ধরলো নানা কারণে। মূল ব্যাপার স্থানাভাব ও অধিবাসীদের অর্থাভাব।

কেশবচন্দ্র যেমন বিদ্রোহী হয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গ পরিত্যাগ করেছিলেন, এরপর কিছু লোক কেশবচন্দ্রের বিপক্ষেও যেতে শুরু করলো। একদল দাবী করলো, তারা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে পর্দার বাইরে বসে উপাসনা করবে। মন্দিরের এক কোণে তাদের স্ত্রীদের বসার ব্যবস্থা করতে হলো। কিন্তু এতৎসত্তেও একটা বিরোধিতা থেকেই গেল। তার কারণ, কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস। সেই প্রত্যাদেশ তিনি সবার উপর চাপিয়ে দিতেন।

এদিকে বিলাতে যাই হোক না কেন, খ্রিষ্টানরা হাল ছাড়েনি খ্রিষ্টভক্ত কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে। মিস পিগট ইংরেজী পড়াতেন কেশবচন্দ্রের স্ত্রীকে। তিনি একদিন ছাত্রীকে বললেন, খ্রিষ্টান না হলে তুমি পাপের মধ্যে মরবে, মরার পর নরকে যাবে। এমনকি তোমার স্বামীও নরকে যাবে। এরপর মিস পিগটকে ছাঁটাই করে দেওয়া হলো।

কেশবচন্দ্রের আমলেই ভারতবর্ষীয়ব্রাহ্মসমাজরূপে ব্রাহ্মসমাজের সর্বাঙ্গীন প্রসার ঘটেছিল। নারীশিক্ষা, বিশেষ বিবাহ আইন করা, ভারতাশ্রমে ব্রাহ্মদের যৌথ জীবনযাপন ইত্যাদি ব্যাপার ঘটেছিল। পূর্ববঙ্গতেও ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল ব্রাহ্মধর্মের। কিন্তু এই দৈহিক প্রসারের মধ্যেই ছিল ধ্বংসের বীজ। সাধারণ মানুষের অনেকেই ব্রাহ্মধর্মকে খ্রিষ্টান করার চক্রান্ত বলে মনে করতেন। কারণ, খ্রিষ্টানদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের গলাগলি যে কোনও বিচারে অশুভ। অনেকে ব্রাহ্মদের খ্রিষ্টান বলেই মনে করতো। একবার ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ দরিদ্রনারায়ণ সেবা করে। প্রায় হাজার

খানেক মানুষ সেই সেবা গ্রহণ করেছিল। চাল, পয়সা ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছিল। দান গ্রহণ করে তারা দাতাদের ধন্যবাদ দিতে গিয়ে বলেছিল, "খ্রিষ্টানদের জয় হোক!"

কেশবচন্দ্র আর যাই হোন বিচারবুদ্ধিশীল মানুষ ছিলেন না। সবসময় একটা আবেগের উন্মত্ততার মধ্যে বাস করতেন। এই উন্মত্ততা ছিল অসুস্থতার লক্ষণযুক্ত। কিন্তু নামযশের উচ্চ শিখর থেকে কেশবচন্দ্রের আকস্মিক পতন ঘটলো ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতির বিবাহকে কেন্দ্র করে।

ভাবোন্মত্ত হয়ে থাকলেও কেশবচন্দ্রের সন্তান-সন্ততি কম ছিল না। পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা। এই পাঁচ কন্যার বিয়ে দেওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না।

কোচবিহার রাজ্যকে তত্ত্বাবধান করতো ব্রিটিশ সরকার। বালক বয়সেই রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে সরকার। কিন্তু শিক্ষা শেষ করার জন্য তাঁকে ইংলন্ডে নিয়ে যাবার কথা উঠলো। কিন্তু রাজমাতা বেঁকে বসলেন। বিলেতে যাবার আগে ছেলের বিয়ে দিতে চান তিনি।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার রাজ্যের কোনও মেয়ের সঙ্গে নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিয়ে দিতে রাজী নন। ক্ষত্রিয় হলেও কোচরা আদিজাতি। তাঁরা একটি শিক্ষিত মেয়ে খুঁজতে লাগলেন নৃপেন্দ্রনারায়ণের জন্য।

শেষপর্যন্ত তাদের নজর গেল কেশবচন্দ্রের কন্যা সুনীতির উপর। কেশবচন্দ্রের কাছে প্রস্তাব গেল। কেশবচন্দ্র এক কথায় গররাজী হলেন। মেয়ে এখনও নাবালিকা; চোদ্দ বছর না হলে মেয়ের বিয়ে হবে না। তাছাড়া তাঁর মেয়ে এমন কিছু সুন্দরীও নয় যে রাজরাণী হবে।

সুন্দরী না হলেও শিক্ষিতা। ব্রিটিশ সরকার সেটাই চাইছে। মেয়ে দেখে পছন্দও হয়ে গেল নৃপেন্দ্রনারায়ণের। সুনীতিও পছন্দ করলেন যুবক রাজাকে।

কিন্তু কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে দেবেন না। নৃপেন্দ্রনারায়ণ লিখিতভাবে জানালেন, তিনি একেশ্বরে বিশ্বাস করেন।

লেখায় অসুবিধা নেই। হিন্দুদের ঈশ্বর একজোড়া নয়। নানা টাল বাহানার পর কেশবচন্দ্র একটি বাগদান কর্মকাণ্ড করতে রাজী হলেন। কিন্তু তা 'অপৌত্তলিক' হতে হবে।

ঠিক আছে তাই হবে। রাজাদের তরফে জানানো হলো।

কেশবচন্দ্র কোচবিহারে গেলেন মেয়ে নিয়ে। একটা অনুষ্ঠান হলো; তাতে মঙ্গলঘটও রইল, শালগ্রাম শিলাও রইল।

মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলেন কেশবচন্দ্র। এসে দেখলেন চতুর্দিকে টি টি পড়ে গেছে। রটে গেছে নিজে আচার্য হয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কেশবচন্দ্র। তাও হিন্দু মতে। গোটা ব্যাপারটাই টাকার লোভে।

সুতরাং ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর একটি মিটিং ডাকবার অনুরোধ করে একটা আবেদন গেল কেশবচন্দ্র সেনের কাছে। তিনি রাজী হলেন। সভায় নিজের পদচ্যুতির প্রস্তাব উপস্থিত করতে চাইলেন।

শেষ পর্যন্ত গোলমালে কেশবচন্দ্রের অনুগামীরা সভা ত্যাগ করলেন। তারই মধ্যে কেশবচন্দ্রকে আচার্যের পথ থেকে অপসারিত করা হলো। বিরোধীরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের মেছুয়াবাজারের মন্দিরটি দখল করতে চেয়েছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র পুলিসের সাহায্য নিয়ে তাতে বাধা দেন। বিরোধীরা 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নাম দিয়ে পৃথক ব্রাহ্ম মন্দির ও সমাজ গঠন করে। ব্রাহ্ম দের সিংহভাগই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে চলে যায়। টিম টিম করে জ্বলতে থাকে কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের আলো।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এইসব ঘটনার আগেই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল রামকৃষ্ণ পরমহংসের। তিনিই শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করেছিলেন। কোণঠাসা হয়ে এবার তিনি বেশী করে আঁকড়ে ধরলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে।

আগেই বলেছি, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার আগেই ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্ব থেকে ভালো ভালো কথাগুলি চয়ন করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এটি এক কথায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি প্রচেষ্টা।

এই প্রচেষ্টার চরম রূপ দেখা গেল ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে 'নববিধান' ঘোষণার মধ্যে। এই বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র চর্চা করতে বলা হলো। ইসলাম চর্চা করবার ভার পেলেন গিরিশচন্দ্র সেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খ্রিষ্টধর্ম চর্চার জন্য নিযুক্ত হলেন।

তখনও পর্যন্ত কুরআন বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হলেও বাঙ্গলা ভাষায় কেউ কুরআন অনুবাদ করেন নি। যদিও রামমোহন রায় কুরআন পড়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র সেন কুরআন অনুবাদ করতে লাগলেন। বিভিন্ন খণ্ডে তা প্রকাশও হলো ছ' বছর ধরে। অনুবাদে বিভিন্ন বচনের 'তফসির' বা ব্যাখ্যানও রইল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গিরিশচন্দ্র নিজে একজন বিধর্মী হয়ে কুরআনের মর্মবাণী বুঝলেন না। কেশবচন্দ্রকেও বোঝালেন না যে এ ধর্মে বিধর্মী নারীদের ধর্ষণ করার বিধান আছে। বিধর্মীদের নিকৃষ্ট পশু বলা হয়েছে। বিধর্মীদের হত্যা করে বিশ্বজুড়ে আল্লাহ্‌র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে।

অবশ্য গিরিশচন্দ্র নিজেও কুরআন বোঝেন নি। তাই, আল্লার জায়গায় ঈশ্বর লিখেছিলেন। ওনার ধারণা হয়েছিল, কুরআনও উপনিষদের ঈশ্বরের (সগুণ ব্রহ্মে র)বাণী।

কাছাখোলা কালিদাস কেশবচন্দ্র যেমন খ্রিষ্টধর্ম বোঝেন নি, তেমনই বোঝেন নি ইসলাম। অথচ, তখন তাঁর পক্ষে স্যার উইলিয়াম মুয়রের মুহাম্মদের জীবনী পড়ে দেখার সুযোগ ছিল। সুযোগ ছিল এডওয়ার্ড গিবনের রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও পতনের ইতিহাস পড়ার। ঐ বই পড়লে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রসার কীধরণের বীভৎসতার মধ্যে ঘটেছিল এবং ইসলামের উদ্ভব ও প্রসার সম্পর্কেও জানতে পারতেন। এমনকি জর্জ সেলের কুরআনের অনুবাদও পড়তে পারতেন। কিন্তু তিনি কিছুই পড়েন নি। কান দিয়ে খ্রিষ্টধর্ম পড়ে, গীর্জায় গীর্জায় যিশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তি দেখে ভাবলেন কি করুণাময় যিশু! ধ্বংসাত্মক সর্বধর্ম সমন্বয় প্রচার করে কেশবচন্দ্র হিন্দুধর্ম ধ্বংসের ডিনামাইট সৃষ্টি করেছিলেন।

কেশবচন্দ্রের মধ্যে আবেগ ছিল প্রচুর, পাণ্ডিত্য ছিল না। খ্রিষ্টধর্মের দ্বারা তিনি এমনই গ্রস্ত হয়েছিলেন যে তিনি নিজে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পান বলে মনে করতেন। এমনিতেই ব্রাহ্ম ধর্ম ছিল ভিত্তিহীন, চলছিল শুধু হুজুগে, তিনি আবার এর সঙ্গে যোগ করলেন ক্ষতিকর সেমীয় ধর্মদ্বয়।

কেশবচন্দ্রের যিশু প্রেম একটা উন্মত্ততায় পরিণত হয়েছিল। এতে তিনি দলের মধ্যেও অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। একে তো ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় বাইবেল, কুরআন ও জেন্দাবেস্তা থেকে পাঠ হতো। এ ছাড়াও ২৫ শে ডিসেম্বর খ্রিষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে সারাদিন উপবাস করতেন কেশবচন্দ্র। নিজেকে খ্রিষ্টদাস বলে গর্ববোধ করতেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "প্রভু খ্রিষ্ট, আমার মধুর খ্রিষ্ট, আমার হৃদয়ের সর্বোজ্জ্বল রত্ন, আমার আত্মার মণিহার—গত কুড়ি বছর ধরে বেদনাবিধুর হৃদয়ে যাঁর লাগি অপেক্ষিয়া আছি।"

নানা ধরণের খ্রিষ্টীয় অনুষ্ঠান করতেন কেশবচন্দ্র। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখের এমন একটি অনুষ্ঠানের বিবরণ :

"খ্রিষ্টের হিন্দু শিষ্যগণ উপাসনান্তে ভোজনগৃহে সমবেত হলেন। একটি রূপার থালায় 'অন্ন' আর একটি ছোট পাত্রে জল ছিল। লুকের মঙ্গলবাণীর ১২ অধ্যায় থেকে আচার্য পাঠ করতে লাগলেন : 'অপিচ তিনি রুটি লইলেন এবং ধন্যবাদ দিলেন এবং উহাকে ভাঙ্গিলেন, এবং এই আমার শরীর যাহা তোমাদের জন্য প্রদত্ত হইতেছে। আমার স্মরণার্থে তোমরা এই কর।'

রুটি খাওয়ার পর জলের পাত্র নিয়ে পাঠ করলেন, 'যে শোনিত তোমাদের জন্য পাত হইল, আমার শোনিতে এই পানপাত্র নবনিবন্ধন পাত্র হইল'

এরপর কেশবচন্দ্র সেই রুটি ও জল ব্রাহ্ম ভক্তদের দিলেন। সবাই পানভোজন করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

আর এক বক্তৃতায় নিজেকে জুডাস বলে ঘোষণা করলে তাঁর অনেক অনুরাগীই অসন্তুষ্ট হন। খ্রিষ্টধর্মের প্রতি অতি অনুরাগের ফলে খ্রিষ্টীয় পাপবোধ তত্ত্ব ব্রাহ্ম সমাজেও গৃহীত হয়।

শুধু খ্রিষ্টধর্ম নয়, ইসলাম ধর্ম নিয়েও মাততেন কেশবচন্দ্র। 'মিরর' পত্রিকার সংবাদ, "৪ঠা আশ্বিন(১৯শে সেপ্টেম্বর) মোহম্মদ সমাগম হয়। ঐদিন রবিবার উপাসকগণ আরবের হিতৈষী বন্ধু এবং প্রেরিতমহাপুরুষের নিকটবর্তী হন। তাঁহারা হিন্দুর সংকুচিতভাব ও বর্ণসংস্কার পরিহার করিয়া ভাবতঃ মুসলমান হইলেন।....মোহম্মদ ম্লেচ্ছ এবং তাঁহার ধর্মকে অবিশুদ্ধ বলিয়া সকলের মনে ছিল, এখন তাহাকে ভালোবাসা ও সম্মানের যোগ্য, নিকট সম্পর্কীয় প্রিয় বলিয়া তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন।"

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের পঁচিশে জানুয়ারী ব্রহ্ম মন্দিরের আচার্যের বেদী থেকে কেশবচন্দ্র নববিধান ঘোষণা করেন :

"গৃহস্থের গৃহে আজ আনন্দধ্বনি কিসের জন্য? বঙ্গদেশ পৃথিবীকে বলিতে লাগিলেন, পৃথিবী, শুন, পঞ্চাশ বৎসর ব্রাহ্ম সমাজ গর্ভে ধর্মের শিশু গঠিত হইতেছিল, বহুকাল প্রসববেদনার

পর এক সর্বাঙ্গসুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই শিশুর ভিতর যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদায় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সেই শিশুর অন্তরে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল কোরাণ সমুদায় রহিয়াছে।.....পৃথিবীতে যত ভাবের অবতারণা হইয়াছে শিশু সকলকে আপনার ভিতর এক করিয়া লইয়াছেন।"

বিভিন্ন বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র নববিধান সম্পর্কে নানা কথা বলেন। তার কয়েকটি হলো :

"জগতের সমস্ত লোককে তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থ এবং স্বর্গীয় পরিবারভুক্ত করবার জন্যই মঙ্গলময় ঈশ্বর এই নববিধান সৃষ্টি করেছেন।"

"যদি তোমার কিছুই নিজের না দেওয়ার থাকে, যদি তুমি পুরাণো কথাই বলতে এসে থাকো, তবে পৃথিবীতে তোমার কিছু প্রয়োজন নেই। তোমার ধর্ম যদিও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান সকল ধর্মকেই পূর্ণ করতে এসেছে, তবুও তুমি নতুন। কথা পুরাণো, ভাব নতুন। আমাদের প্রায়শ্চিত্ত, প্রত্যাদেশ, পরলোক, স্বর্গরাজ্য-এ সবই নতুন ভাবে পরিপূর্ণ।"

"হিন্দুধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, মুসলমানধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে যে সত্য আছে, তার সবই তোমাদের মণ্ডলী সংগ্রহ করবে। .....হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে যে অমূল্য সম্পদ আছে তা আমরা হারাতে পারিনা। খ্রিষ্টধর্মকেও আমরা ঘৃণা করতে পারি না। খ্রিষ্টধর্মের নীতি হৃদয়ে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবে না? হিন্দুধর্ম ও খ্রিষ্টধর্ম একটুও বিরোধী নয়—উভয়ের সত্য একই। অতএব খ্রিষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্ম এই দুইয়ের মধ্যে কাউকেই মনোনীত করতে পারি না। দুই সত্যকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। "

এসব কাছাখোলা কালিদাসের কথা। ধনী নন্দনের খাওয়া পরার সমস্যা ছিল না। নিশ্চিন্ত অবসরে যে নতুন কিছু বিদ্যাচর্চা করবেন সে মানসিকতাও ছিল না। শুধু একটা হুজুগে মেতেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বও তাঁর জানা ছিল না। তবুও তিনি বুঝেছিলেন সব ধর্মের মধ্যেই কিছু 'সত্য' আছে। কি সত্য আছে সেটা কেশবচন্দ্র কেন, কারও মুখ থেকেই শোনা যায় নি। 'নববিধান' ঘোষণার পর কেশবচন্দ্র বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন ধর্ম জানবার ভার দিয়েছিলেন। বন্ধু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পেয়েছিলেন খ্রিষ্টধর্ম চর্চা করার ভার। অর্থাৎ, খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে তাঁরও ভালো জ্ঞান ছিল না। আর গিরিশচন্দ্র সেন যে কি ইসলাম বুঝেছিলেন তার প্রমাণ তো আমাদের হাতের মধ্যে। দুনিয়ার 'নিকৃষ্ট জীব' হয়েও সেবা করে গেছেন ইসলামী দুনিয়ার।

এই 'নববিধান' দ্বারাই গ্রস্ত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তারই ফসল 'যত মত তত পথ'। আর, ঈশ্বরচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দও কেশবচন্দ্র পন্থী। কেশবচন্দ্রের কাল্পনিক খ্রিষ্টই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের তুরুপের তাস। এই তাস দেখিয়েই তিনি আমেরিকায়-ইউরোপে বিভিন্ন গীর্জায় অবাধে বক্তৃতা করে এসেছিলেন।

তিন

কেশবচন্দ্রের ভাগ্যাকাশে শ্রীরামকৃষ্ণের উদয়

১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সাক্ষাত হয়। তখন কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের ডাকসাইটে নেতা। সুতরাং তাঁর সঙ্গে হৃদয়ের মামার সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারক ভাগ্নে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ই উদ্যোগ নিয়ে ব্যাপারটা ঘটান। প্রথমে হৃদয়রাম মামাকে নিয়ে কলুটোলায় কেশবচন্দ্রের বাড়িতে উপস্থিত হন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেদিন বেলঘরিয়ার বাগানবাড়িতে গিয়েছিলেন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। সেই শুনে পরদিন হৃদয়রাম মামাকে নিয়ে চললেন বেলঘরিয়ায়।

কেশবচন্দ্র সবান্ধবে বাগানের বড় পুকুরঘাটে বসে ছিলেন। সম্ভবতঃ খ্রিষ্টসাধন করছিলেন। স্নানেরও উদ্যোগ হচ্ছিল। হঠাৎ সবাই দেখলেন একটি ছ্যাকরা গাড়ী এসে বাগানের মধ্যে থামলো। সেই গাড়ী থেকে নামলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয়রাম। শ্রীরামকৃষ্ণের পরনে একটি মাত্র লালপাড় ধুতি—কোনও উত্তরীয় নেই।

প্রথমে অন্য একটি ঘাটে নেমে হাত-পা ধুয়ে নিলেন দুজনে। তারপর এলেন কেশবচন্দ্রদের কাছে।

হৃদয় জানালো, (গৌরগোবিন্দ রায়ের বর্ণনা) "আমার মাতুল আপনাদের সঙ্গে হরিপ্রসঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আপনার গৃহে গিয়াছিলেন। সেখানে শুনিলেন আপনি এই উদ্যানে আছেন। তাই তিনি এখানে আপনার নিকট উপস্থিত।"

তাঁহাকে দেখিয়া কাহারও মনে তত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। অভ্যাগত বলিয়া, উভয়কে বসিবার জন্য আসন প্রদত্ত হইল। অভ্যাগত পরমহংস (তখন আর পরমহংস বলিয়া কে জানিত) প্রথমেই বললেন, বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করো? সে দর্শন কেমন আমি তা জানিতে চাই। প্রসঙ্গ হইতে হইতে প্রসঙ্গের ভাবোপযোগী একটি রামপ্রসাদী গান তিনি ধরিয়া দেন। গাহিতে গাহিতে তাঁহার সমাধি হয়। ভাগিনেয় হৃদয় মুখোপাধব্যায় ওঁ শব্দ উচ্চারণ

করিতে থাকেন এবং সকলকে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। পরমহংসের চোখ দিয়া আনন্দাশ্রুর উদগম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিলেন, পরিশেষে সমাধি ভঙ্গ হইল। এ ব্যাপারে প্রচারকবর্গের মনে কোনো ভাবোদয় হয় নাই। পরিশেষে তিনি যখন সাধারণ উপমাযোগে অধ্যাত্ম তত্ত্ব সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকলে অবাক হইয়া গেলেন। "যখন লুচি ভাজা যায়, তখন টগবগ করিয়া ওঠে, ক্রমে অধিক জ্বাল হইলে আর শব্দ বাহির হয় না। এইরূপ জ্ঞান পরিপক্ক হইলে আর আড়ম্বর থাকে না, অল্প জ্ঞানেই আড়ম্বর।" "বানরের ছানা মা'র বুক জড়াইয়া থাকে, বিড়ালের ছানা ম্যাও ম্যাও করিয়া থাকে। প্রথমটি নির্ভয়ের ভাব, দ্বিতীয়টি প্রার্থনার ভাব।" "ব্যাঙাচির ল্যাজ খসিয়া গেলেই ব্যাঙ হইয়া লাফাইয়া বেড়ায়। সেইরূপ আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হইলেই সামান্য মানুষ মুক্তিলাভ করে।"

এইরূপ অনেক কথা কহিয়া পরিশেষে প্রথমে তাঁর প্রতি যে প্রকার ব্যবহার হইয়াছিল পরে যে প্রকার ব্যবহারে হইল তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "গরুর পালে কোনও কোনো জন্তু আসিয়া ঢুকিলে, সকল গরুতে মিলিয়া তাকে গুঁতাইয়া তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু কোনও গরু আসিলে প্রথমে গা শোঁকাশুঁকি করে। পরে আপনার জাতি জানিয়া গা চাটাচাটি করিয়া থাকে, ভক্তে ভক্তে এইরূপ মিলন হয়।"

অভিনব চরিত্রের মানুষটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে কেশবচন্দ্র মুগ্ধ হলেন। তাঁর ধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে হিন্দুধর্মও আছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো পরম্পরাগত হিন্দুদের দেখলেই দাঁতে দাঁত পিষতেন না। সুতরাং তিনি মনস্থ করলেন রামকৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন।

কেশবচন্দ্রের নিজস্ব কাগজ 'ইন্ডিয়ান মিরর'এ ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ শে মার্চের সংখ্যায় কয়েক লাইনের এক সংবাদ ছাপা হলো:

একজন হিন্দু সন্ত—আমরা কিছুদিন আগে একজনের (এক হিন্দু সাধকের) সাক্ষাতলাভ করেছি এবং তাঁর আত্মার গভীরতা, ভেদ্যতা ও সরলতার দ্বারা মুগ্ধ হয়েছি। তিনি অনর্গল উপমা ও তুলনা সহকারে কথা বলেন, যা সুপ্রযুক্ত ও সুন্দর। তাঁর মানসিকতা পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর ঠিক বিপরীত। প্রথমজন ধীর, কোমল ও ধ্যা নমগ্ন, দ্বিতীয়জন শক্তপোক্ত, পৌরুষযুক্ত ও তার্কিক। হিন্দুধর্মের মধ্যে নিশ্চয় সত্যতা, সৌন্দর্য ও শিবত্ব আছে, যা এমন মানুষদের অনুপ্রেরণা প্রদান করে।

এর পর ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ই মে তারিখের বাঙ্গলা 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় রামকৃষ্ণ পরমহংসের একটি জীবনী প্রকাশিত হলো। আকার ছোট, মোটে পাতা দুয়েকের। কিন্তু তার মধ্যে রামকৃষ্ণের সব মহিমাই বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ করার বিষয় যে, এই ক্ষুদ্র লেখাতেও তাঁর আল্লা জপ করার কথা আছে। শেষে বলা হয়েছে, "একজন লোক লেখাপড়া না জানিয়াও কেবল অনুরাগের বলে কতদূর ধার্মিক হইতে পারে রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ....এই স্বার্থপর সংসারে তাঁহার মতো একজন বৈরাগী সাধক অতি বিরলদৃশ্য সন্দেহ নাই।

এর পরে ১৮৭৬ এর ২০ শে ফেব্রুয়ারী 'ইন্ডিয়ান মিরর' এ আবার বেরুলো শ্রীরামকৃষ্ণের সংবাদ। এখন ব্রাহ্ম প্রচারকরাও দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাত করতে।

এইভাবে কলকাতার শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসাধকের কথা প্রচারিত হলো তাঁর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সমেত। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীও আলাদাভাবে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হলো ব্রাহ্ম দের দ্বারা।

ওদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও যাচ্ছেন কেশবচন্দ্রের বাড়িতে। কখনও বা বেলঘরিয়ার বাগান বাড়িতে। ব্রাহ্ম দের বিভিন্ন উৎসবেও যাচ্ছেন। তাঁর বাছবিচার নেই। ভগবৎপ্রেমিক মানুষ, ব্রহ্ম শব্দটি শুনেই ভেবেছেন, এরা ভগবানের আরাধনা করেন। গল্প আছে আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে কেশবচন্দ্রকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, এঁর ফাৎনা ডুবেছে।

ফাৎনা ডোবেনি, আসলে উর্দ্ধতন চতুর্দশ পুরুষকে ডুবিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র। বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান, কোথায় কৃষ্ণ নাম করবেন, তা নয় তিনি কখনও খ্রিষ্টনাম, কখনও আল্লানাম করে পিতৃপুরুষের ধর্মকে দূষণ করেছেন।

আর গদাধর হলেন সেই ধর্মভীরু মানুষ, যিনি শিবলিঙ্গ চেনেন না, শালগ্রাম শিলাও চেনেন না। সুতরাং নুড়ি পাথর দেখলেই প্রণাম করেন। প্রতিটি ব্রাহ্মে র মাথায় যে বাইবেল ঢোকানো আছে, আর বাইবেলে প্রতিটি হিন্দুদের ধরে ধরে খ্রিষ্টান করার কথা আছে, 'অবতার' পুরুষ হয়েও এ খবর তাঁর জানা ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্ম দের সঙ্গে তিনি বেশ মিশে গিয়েছিলেন। গ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন কেশবচন্দ্রের সর্ব ধর্ম সমন্বয় দ্বারা। তারই ফসল ধ্বংসাত্মক যত মত তত পথ।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখেছেন :

"১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম কলকাতার অন্তর্গত সিন্দুরিয়াপট্টির শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে। সে বাড়িতে ব্রাহ্ম সমাজ ছিল....ইহার পর এক দিন তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ-উপাসনালয়ে অকস্মাৎ উপস্থিত হন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভাগিনেয়। সেদিন উপাসনা করিতেছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। সঙ্গীত করিতেছিলেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত। .....তৃতীয়বার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম কলিকাতার উত্তর দিকে পাইকপাড়ার নিকটবর্তী সিঁথির একটি উদ্যানে। উদ্যানের মালিক ছিলেন বেনীমাধব পাল। রাধাবাজারে তাঁহার একটি দোকান ছিল। প্রতিবৎসর তাঁহার উদ্যানে ব্রহ্মোৎসব হইত। এখানে মহাসমারোহে উৎসব ও ভোজন হইত। পরমহংসদেব প্রতি বৎসরই এই উৎসবে আসিতেন এবং আনন্দের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিতেন। এই উদ্যানে আমি তাঁকে তিন-চার বার দেখিয়াছি। তিনি সকালে আসিতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তথায় থাকিতেন। এই উদ্যানে মধ্যাহ্নকালে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা হইত। পরমহংসদেব নানা গল্প করিতে করিতে ভোজন করিতেন। আমাদের অপেক্ষা তিনি অনেক বেশী খাইতে পারিতেন। আহারান্তে ধর্ম প্রসঙ্গ হইত।"

যেহেতু ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে ব্রহ্ম শব্দটি আছে, আর পাঁচ জনের মতো শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবতেন এটা একটা হিন্দু ব্যাপার। তিনি বলতেন, ব্রাহ্ম রা হচ্ছে 'অরূপের থাক'। যারা অরূপের থাক, তারা আবার 'অচিন্ত্যর থাকও'। অচিন্ত্য ব্রহ্মে র গুণকীর্তন হয় না, এ বোধ তাঁর ছিল না। ব্রাহ্ম দের মাথায় যে বাইবেল পোরা আর বাইবেলের প্রত্যাদেশগুলি প্রতিমাপূজকদের ধ্বংস করার জন্য নির্মিত, অনেকগুলি আবার রোমক সম্রাট কনস্টানটাইনের তৈরী, এসব গুরুতর সংবাদ গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের জানার কথা নয়। তিনি কথাবার্ত্তায় মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করতে পারতেন, গান গাইতে পারতেন, সুতরাং এক আকর্ষণীয় চরিত্র ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক পিকনিকে।

এখন, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর ভক্তরা তো তাঁকে অবতার বানিয়ে দিয়েছেন। এটা ভারতের সর্বত্রই হয়। যতগুলি ভক্তমণ্ডলী ততগুলি ভগবান। শ্রীরামকৃষ্ণ নাকি নিজেই বলেছেন, যেই রাম সেই কৃষ্ণ, তিনিই ইদানীং এই শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণ। কেউ যদি তাঁর গুরুদেবকে অবতার বানায় তাহলে আমার বিষয় সম্পত্তির হানি হয় না। আমার ধর্ম — আমার সম্প্রদায়ের কোনও হানি হয় না। কিন্তু, অসুবিধা হয় সেই অবতার যদি বলেন মধ্যপ্রাচ্যের জমি দখলেন রাজনীতিগুলি যা, হিন্দু ধর্মও তাই। সবই জলের মতো সহজ, জলের যেমন বিভিন্ন নাম, ধর্মগুলিরও তেমন বিভিন্ন নাম, তাহলে প্রচার করা হয় একটা ধ্বংসাত্মক তত্ত্ব।

আমরা আগেই দেখিয়েছি উনিশ শতকের ধর্মদূষণ শুরু হয় রামমোহন রায়ের দ্বারা। হিন্দুদের 'পৌত্তলিকতার' অপবাদটি প্রথম আরোপ করেন কেরী সাহেবের মুন্সী রাম রাম বসু। তিনি নিজে আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিষ্টান না হলেও মানসিকভাবে ধর্মান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে 'পৌত্তলিকতার' বিরুদ্ধে একটি পুস্তক লেখেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চত্বরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় রামমোহনের। রামমোহন তাঁর মতবাদ দ্বারা গ্রস্ত হন। এরপর রামমোহন আর্বী ভাষা শিখে কুরআনও পড়েন। তার ফলে এক একেশ্বরবাদী ধর্মমতের দ্বারা তিনি বিকারগ্রস্ত হন। তারপর তিনি কীভাবে সেই একেশ্বেরবাদকে ভুলভাবে শনাক্ত করেন উপনিষদের মধ্যে, তা আগেই আলোচনা করেছি। রামমোহন আবার ধর্মের সর্বজনীনতা দ্বারাও গ্রস্ত হন। খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম যে নিরঙ্কুশবাদী ধর্ম, তারা অন্য ধর্মকে বরদাস্ত করতে রাজী নয়, এ চিন্তা তাঁর মাথায় আসেনি। দেবেন্দ্রনাথ 'পৌত্তলিকতা' বিরোধী হলেও ধর্মের সর্বজনীনতায় বিশ্বাস করতেন না। খ্রিষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে লাগাতার যুদ্ধ করেছিলেন তিনি।

কিন্তু কেশবচন্দ্রের মাথায় আবার ধর্মের সর্বজনীনতার পোকা ঢুকেছিল। তাঁর মাথাতেও ঢোকেনি যে খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম নিরঙ্কুশবাদী ধর্ম। দুই আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় খ্রিষ্টানরা সেখানকার আদি অধিবাসীদের মেরে মেরে শেষ করে খ্রিষ্টধর্মের বিজয় নিশান উড়িয়েছে।

আর ইসলামের ব্যাপার তো আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই পাচ্ছি। ধর্মের সর্বজনীনতা প্রচার করার অর্থ বিধর্মের জয়পতাকায় বাতাস দেওয়া, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা ধ্বংস হওয়া।

বিভিন্ন রামকৃষ্ণজীবনী অবলম্বন করে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছেন কল্যাণ মণ্ডল। আমরা সেই জীবনী অনুসরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীচিত্র অঙ্কন করবো।

সমৃদ্ধ হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামের একষট্টি বছরের বৃদ্ধ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পক্ষের পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক স্ত্রী চন্দ্রমণি ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী একটি পুত্রের জন্ম দিলেন। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের শীতে ক্ষুদিরাম তাঁর কন্যা ক্যাত্যায়নীর ভূতাবেশ থেকে মুক্তির জন্য পিতৃপুরুষের পিণ্ড দান করতে গয়া গিয়েছিলেন। ফিরে এসে শুনলেন তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী। ব্যাপারটা কিছুটা রহস্যময়। রহস্যটা আরও একটু অন্ধকার করে ফেললেন চন্দ্রমণি স্বয়ং। তিনি প্রতিবেশিনীদের জানালেন, স্বামীসঙ্গ ছাড়াই তাঁর গর্ভের সঞ্চার হয়েছে।

কিন্তু শিশুটির জন্মসূত্র জানা গেল একটু বড় হতেই। বিভিন্ন স্থানে অজ্ঞান হয়ে পড়তে লাগলো বালক গদাধর চট্টোপাধ্যায়। দত্যিদানোয় পাওয়া ছেলের জন্য যথারীতি ঝাড়ফুঁক চললো। এই সংজ্ঞাহীনতা দেখিয়ে দিল পারিবারিক সূত্র। সবাই নানাবিধ মস্তিষ্ক জনিত অসুখ দ্বারা গ্রস্ত। পিসীমা রামশীলা দেবীর হয় শীতলার আবেশ। দিদি ক্যাত্যায়নীকে ভূতে পায়। ভাইঝি লক্ষ্মীমণিও কালীর আবেশে সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়। এ সবই এক স্নায়ুঘটিত ব্যাধির শৃঙ্খল। সুতরাং গদাধর ক্ষুদিরামেরই সন্তান। পরে আমরা দেখবো, এই স্নায়ুঘটিত ব্যাধিই হবে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সমাধি'। শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকার করেছিলেন যে ব্যাপারটা ব্যাধি, এর মধ্যে বিন্দুমাত্র দিব্যত্ব নেই। কিন্তু ভক্তদের কাছে এটাই মহাপুরুষত্বের লক্ষণ। ভাগিনেয় হৃদয়রাম এটাকেই কাজে লাগাতেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যত্ব হিসাবে। তিনি সকলকে এইসময় ওঁ উচ্চারণ করতে বলতেন।

গদাধরের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের সংসারে সচ্ছলতা ছিল না। সম্বল ভিটেবাড়ী ছাড়া বিঘাখানেক ধানি জমি। অথচ সংসার ছোট নয়। তিন ছেলে (রামকুমার, রামেশ্বর, গদাধর), দুই মেয়ে (ক্যাত্যায়নী ও সর্বমঙ্গলা), নিজেরা দুজন। তার উপর রামকুমার আবার বিবাহিত। সুতরাং গদাধরের দাদারা এবং ক্ষুদিরাম যজমানি করতেন বাধ্য হয়ে। অনটনের সংসার হলেও শেষ বয়সের সন্তান গদাধর বেশ আদরে ছিল। হেসে খেলে, মাটির পুতুল গড়ে, যাত্রা দেখে, কথকতা শুনে আর এখানে ওখানে ঘুরে বড় হচ্ছিল গদাধর। গ্রামের কোনও অতিথিশালায় তীর্থযাত্রী সাধু দেখলেও আলাপ করতো গদাধর। তাদের কথা, গান, আলোচনা সবই আগ্রহ নিয়ে শুনতো।

গদাধরের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় লাহাদের পাঠশালায়; সেখানে পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। কিন্তু নিয়মমাফিক পড়াশুনায় গদাধরের মন ছিল না। সাত বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পরেও সে কিছুদিন পাঠশালায় গিয়েছিল। তারপর দেখা যায়

সামান্য বিদ্যা নিয়েই গদাধর প্রতিবেশী মহিলাদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাচ্ছে। হাতে লিখে কিছু বইয়ের নকলও করেছিল গদাধর। ছবি আঁকা, পুতুল তৈরী করা, অভিনয় করা— এই সবও আয়ত্ত করেছিল।

ন বছর বয়সে উপনয়ন হয় গদাধরের; সেই সময় প্রথা ভেঙ্গে নিজের ধাই-মা ধনী কামারনীকেই ভিক্ষা মা করে গদাধর।

১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দ। গদাধর এখন সতেরো বছরের যুবক। দাদা রামকুমারকে সাহায্য করার জন্য, আর নিজের একটা জীবিকার তাড়নায় রামকুমারের সঙ্গে কলকাতার ঝামাপুকুর অঞ্চলে চলে এলেন তিনি।

এখানে রামকুমারের কথাও কিছু বলতে হয়। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে স্ত্রীর অকালবিয়োগের পর আর্থিক দুর্দশাক্লিষ্ট রামকুমার কলকাতায় চলে এলেন। ঝামাপুকুর অঞ্চলে যজমানি আর টোলে পড়িয়ে যা আয় হতো তাতে মুখে অন্ন জোগাতে হিমশিম খেতে হতো। ভাই গদাধর তাঁকে যজনযাজনের কাছে সহায়তা করেন বটে, তাতেও কিছু হয় না। এই সময় ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে রামকুমারের সামনে এক অভাবিত সুযোগ এসে গেল। জানবাজারের রাণী রাসমনি ন লক্ষ টাকা ব্যয়ে দক্ষিণেশ্বরে একটি অপূর্ব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা-পূজকের দায়িত্ব তিনি অর্পণ করতে চাইলেন রামকুমারকে। রাণী রাসমণি অর্থবান জমিদার। কিন্তু তিনি জাতে কৈবর্ত, তায় দরিদ্র হারু ঘরামীর কন্যা, পীতে মাড়ের পুত্রবধূ। সুতরাং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণরা তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পূজারী হতে পারেন না।

কিন্তু দরিদ্র রামকুমারের কাছে ক্ষুধা প্রথম ধর্ম। জীবন ও জীবিকার তাগিদে রাণীর প্রস্তাব হেলাফেলা করতে পারলেন না তিনি। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ শে মে মন্দির প্রতিষ্ঠার পূজা করলেন রামকুমার। প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশাল উৎসব হলো। উৎসব শেষে রাসমনির অনুরোধে 'বড় ভট্টাচার্য' উপাধি নিয়ে রাসমনির কালীমন্দিরের স্থায়ী পূজারীর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন রামকুমার।

কিন্তু শূদ্র যজমান গ্রহণ করায় রামকুমারের উপর ক্ষুব্ধ হলেন রামকৃষ্ণ। রামকুমারের কাজকর্ম তাঁর কাছে কুলধর্ম ও পিতৃআচরণের অবমাননা বলেই বোধ হলো। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন দক্ষিণেশ্বরে গেলেন রামকৃষ্ণ, তবে সেখানকার কিছুই স্পর্শ করেন নি। নিজের পয়সায় মুড়ি কিনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার পর কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু দিন কয়েক একা কাটানোর পর যখন দেখলেন রামকুমার কলকাতায় ফিরছেন না তখন নিজেই উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু তিনি এককথায় শূদ্রের যজমানি করতে রাজী নন। ঔচিত্য নিয়ে তর্ক বাঁধলো দাদার সঙ্গে। শেষে ঠিক হলো একটা লটারী করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। লটারীতে জিতলেন রামকুমার। রামকৃষ্ণ মেনে নিলেন শূদ্রযাজিত্ব। কিন্তু তিনি মন্দিরের প্রসাদগ্রহণ করতে রাজী হলেন না। স্থির হলো, তিনি সিধে নিয়ে গঙ্গার কূলে নিজের হাতে রান্না করে খাবেন। গঙ্গার কূলে কোনও বস্তুই অশুচি হয় না। মানুষের স্বভাবে জাত্যাভিমান ক্রিয়াশীল থাকলেও ক্ষুধা সর্বগ্রাসী, সে সব অভিমানকে গ্রাস করে।

কিন্তু রাসমনির মন্দিরে আরও ব্রাহ্ম ণ চাই। কিছুদিনের মধ্যে শিহড় থেকে চলে এলো রামকৃষ্ণের প্রায় সমবয়সী ভাগনে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়। তিনিই হলেন মামার একান্ত বন্ধু এবং ভবিষ্যতের জন সংযোগ অফিসার। শ্রীরামকৃষ্ণের সব মহিমার দ্রষ্টা ও বর্ণনাকারী হৃদয়।

এর মধ্যেই রাসমনির জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস রামকৃষ্ণকে মন্দিরে চাকরী দেবার প্রস্তাব করলেন। রামকৃষ্ণ শুধু নিজেই রাজী হলেন না, হৃদয়েরও চাকরীরও ব্যবস্থা করে ফেললেন। রামকৃষ্ণ হলেন কালীর বেশকারী, আর হৃদয়রাম রামকুমার ও রামকৃষ্ণ, উভয়ের সাহায্যকারী। এই ঘটনার কিছুদিন পরে দক্ষিণেশ্বরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পদচ্যুত হলে রামকৃষ্ণ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। হৃদয়রাম পেলেন মা ভবতারিণীর বেশবাসের দায়িত্ব। রাধাগোবিন্দজীর পূজার দায়িত্বের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ তার দাদার কাছ থেকে কালীপূজার পদ্ধতি শিখতে লাগলেন। রামকুমারের স্বাস্থ্য তখন ভেঙ্গে পড়ছে। তিনি ভাইয়ের হাতে মূল মন্দিরের দায়িত্ব দিয়ে অবসর নিতে চাইছিলেন। সুতরাং কলকাতার বৈঠকখানা নিবাসী তান্ত্রিক কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে রামকৃষ্ণ কালীপূজার ভার নিলেন। রাধাগোবিন্দ মন্দিরের দারিত্বে গেলেন রামকুমার। সময়টা ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দ। কিন্তু কয়েকমাস পুজা করেই কালীপূজার গুরু দারিত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন রামকৃষ্ণ। ততদিনে রামকুমার প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর একগাদা আত্মীয় স্বজন ঢুকে পড়েছে রাসমনির মন্দিরে। তাদের চালক শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁরই ইচ্ছানুসারে কখনো হৃদয়রাম, কখনো ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয় বা রামলাল ভবতারিণীর পূজার দায়িত্ব নিলেন। আরও আত্মীয়স্বজন মন্দিরে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আর পূজা করেন নি। পূজা না করলেও সাত টাকা মাসিক বেতন তিনি বরাবরই পেয়ে যেতেন। সে টাকা তিনি জমাতেন। মন্দির থেকে আরও কিছু আয় হতো। সবই জমতো একটি কাঠের বাক্সে। সেই টাকা থেকেই তিনি পরবর্তীকালে সারদামণির জন্য গহনা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাতে খরচ হয়েছিল দু শো টাকা। বাকী একশো টাকা তিনি স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত রাখেন।

শিশুকাল থেকেই যে বংশগত ব্যাধির দ্বারা গ্রস্ত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, সেটি মাঝে মাঝে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যাওয়া ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা। এটা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সারাজীবনের সঙ্গী। তিনি চার বছর দক্ষিণেশ্বরে কাটানোর পর যখন মানসিক ভারসাম্য হারানোর লক্ষণগুলি ভেসে উঠছে, তখন ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কিছুদিনের জন্য কামারপুকুর চলে গেলেন। চন্দ্রমনি দেবী ভূতগ্রস্ত সন্তানকে সুস্থ করে তোলার মানসে দেবদেবী ও ওঝার শরণাপন্ন হলেন। রামকৃষ্ণের বয়স তখন তেইশ। একটু সুস্থ হতেই তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করা হলো। জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর ছ' বছরের কন্যা সারদামণির সঙ্গে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বিয়ে হয়ে গেল তাঁর। বিয়ের পর সারদামণিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বাপের বাড়িতে। তারপর প্রায় দেড় বছর কামারপুকুরে কাটিয়ে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন রামকৃষ্ণ।

ফিরে এসে উন্মাদ রোগের দ্বারা দারুণভাবে আক্রান্ত হলেন রামকৃষ্ণ। সেবারে রোগের প্রকোপ এতই বেশী ছিল যে অধিকাংশ সময় তাঁর জ্ঞান থাকতো না। সব রকম বাছবিচার লোপ পেয়ে গিয়েছিল। শূদ্রের রান্না শুধু নয়, ফেলে দেওয়া এঁটো পাতা থেকে অন্ন কুড়িয়ে তিনি খেতেন। গলার পৈতে, পরণের কাপড় সব ফেলে দিতেন। এই সব উপসর্গের সঙ্গে যোগ হয়েছিল গায়ে জ্বালা ও অনিদ্রা। তখন তিনি নিজের লম্বা চুলের জটা দিয়ে বিষ্ঠাও পরিষ্কার করতেন। বিষ্ঠা খেতেন, বিষ্ঠা চন্দনের মতো মাখতেন গায়ে। সব সময় তিনি মা মা করে চিৎকার করতেন। ধর্মাধর্মজ্ঞান, জাতবিচারী স্বভাব, খাদ্যাখাদ্যজ্ঞান সবই লোপ পেয়েছিল।

কিন্তু এই অবস্থা থেকে মুক্ত হলেই তাঁর যাবতীয় বিচারবোধ ফিরে আসতো। তখন তিনি ব্রাহ্মণ হলে, আচারী হলে, ঠাকুরের ভোগ হলে তবে ভাত খেতেন। কৈবর্তের অন্ন খাওয়ার আক্ষেপ তাঁর মুখে বার বার শোনা গেছে। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বাবুর সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়ে এই কারণেই তাঁর আর কলকাতায় ফিরে আসার ইচ্ছা ছিল না। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও শূদ্র শ্রেণীর লাটু মহারাজ ও গোপালকে বিছানা থেকে নামিয়ে দিয়ে তবে তিনি পায়েস খেয়েছেন। ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ সবার বাড়িতে ভাত খেতেন না। তিনি বলতেন, লুচি তরকারী খাওয়া যায়, কিন্তু অন্ন নয়। ব্যতিক্রম ছিল অল্প কয়েকজন। যেমন, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ও বলরাম বসু। কারণ, বাবুরামের (প্রেমানন্দ) হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ, নরেন হলো শুদ্ধসত্ত্ব আধার। অন্যদিকে বলরাম বসু কুলপ্রথায় জগন্নাথ স্বামীকে অন্ন ভোগ দেন বলে তা শুদ্ধান্ন, তাছাড়া ঐ অন্ন পাক করেন এক ব্রাহ্মণ মহিলা।

সজ্ঞানে থাকলেও রামকৃষ্ণ প্রায়শই পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে যেতেন। এবং তাঁর অনুগতদের নগ্ন হতে নির্দেশ দিতেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর স্মৃতিকথাতে এই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও আরও অনেকে জীবনের বহুসময় উলঙ্গ হয়ে কাটিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে। আর স্বামী ব্রহ্মানন্দ শুধু উলঙ্গই হতেন না, মাঝে মাঝে ছুটে গিয়ে রামকৃষ্ণের কোলে বসে তাঁর স্তন চুষতেন। শুধু নগ্ন হয়ে ধ্যান করা নয়, রামকৃষ্ণ নিজে উলঙ্গ হয়ে কখনও ব্রহ্মানন্দকে, কখনও অখণ্ডানন্দকে এবং সম্ভবতঃ আরো অনেক যুবককে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে কোলের মধ্যে নিয়ে রাতে শুতেন।

জীবনের নানা পর্বে রামকৃষ্ণ নানা গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে বিচিত্র মত ও পথের সাধনা করেছেন। এর শুরু ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে। ঐ বছর দক্ষিণেশ্বরে এলেন এক ভৈরবী ব্রাহ্মণী, নাম যোগেশ্বরী। রামকৃষ্ণ এই তন্ত্রসাধিকার কাছে দীক্ষা নিয়ে তন্ত্রসাধনা শুরু করলেন। যোগেশ্বরীর নির্দেশ অনুযায়ী উলঙ্গ যুবতীর কোলে উলঙ্গ হয়ে বসে থেকেছেন। সম্পূর্ণ নগ্ন যুবক-যুবতীর সঙ্গমক্রিয়া নিরীক্ষণ করেছেন নির্বিকারচিত্তে। মানুষের মাথার খুলিতে করে মাছ খেয়েছেন। এমনকি মানুষের মাংস পর্যন্ত খেয়েছেন। এই ভৈরবীই তাঁকে প্রথম অবতার বলে ঘোষণা করেন। এবং সবার কাছে প্রচার করতে আরম্ভ করেন তাঁর কথা।

ভৈরবী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতেই থাকতেন এবং পঞ্চবটী নামক স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অধিকাংশ সময় কাটাতেন। পরে তিনি আড়িয়াদহের দেবমণ্ডল ঘাটের চাঁদনীতে বাস করতে চলে গেলেন। কিন্তু রোজই দক্ষিণেশ্বরে আসতেন।

দেখে শুনে টনক নড়লো মথুরানাথের। ব্যাপারটা নিয়ে তো মন্দিরের মাহত্ম্য বৃদ্ধি করা যায়। এতদিন পাগল ঠাকুরকে তিনি প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন, তার কথা প্রচার করেছেন ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে যে এতো সম্ভাবনা তা তাঁর জানা ছিল না। তিনি ভৈরবীর কথার বিচার করার জন্য ভক্তি ও তন্ত্রশাস্ত্রে শিক্ষিত দুই পণ্ডিতকে নিয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। দুই পণ্ডিত হলেন বৈষ্ণব চরণ ও গৌরীকান্ত। ব্যাপারটা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে কমিশন গঠনের মতো। বিচারপতি আগে থাকতেই বুঝে যান মন্ত্রী মশাই কমিশনের কী রায় চান। সুতরাং এই দুই পণ্ডিত ভৈরবীর মতকে সমর্থন করে রায় দিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার লক্ষণাক্রান্ত।

এর পর মথুরবাবু উঠে পড়ে লাগলেন। সভাসমিতির আয়োজন করতে লাগলেন। মন্দিরের প্রতিটি উৎসবের ব্যয় বেড়ে গেল। অতিথিশালার ব্যয় বাড়িয়ে দিলেন। অন্নকুট উৎসব করে প্রচুর দান খয়রাত করা হলো। আগত সাধুদের শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে বস্ত্র, কম্বল ও কমণ্ডলু প্রভৃতি দান করা হতে লাগলো। কামারপুকুরের গদাধর দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ হবার পথে হাঁটতে শুরু করলেন।

যোগেশ্বরী ১৮৬১ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলে ছিলেন এবং তাঁর নিত্য যোগাযোগ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ জটাধারী নামক এক রামায়েৎ সাধুর কাছ থেকে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বাৎসল্যরসের সাধনা করে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শান্ত, সখ্য ও দাস্য ভাবের সাধনা তিনি আগেই করেছেন। যোগেশ্বরী সবরকম সাধনপ্রণালীতেই সিদ্ধ ছিলেন। বাৎসল্যভাবের সাধনা সমাপ্ত হবার পরে মধুর ভাবের সাধনাও করলেন রামকৃষ্ণ।

এই সমস্ত সাধনা সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলেছিলেন, যে যখন যা বলতো তিনি তাই করতেন।

১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে দক্ষিণেশ্বরে এলেন তোতাপুরী নামক এক অদ্বৈতবাদী নাগা সন্ন্যাসী। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অদ্বৈতসাধনার জন্য গোপনে বিরজা হোম করে সন্ন্যাসদীক্ষা নিলেন তোতাপুরীর কাছে। তখন থেকে তাঁর নামের সঙ্গে ‘পরমহংস’ শব্দটি জুড়ে যায়। ভৈরবী রামকৃষ্ণের এই অদ্বৈতসাধনাকে ভালোভাবে নেন নি।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সব সাধনা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথার কোনও কারণ নেই। আমাদের মাথা ব্যথা ১৮৬৬ বা ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি ‘ক্ষত্রিয়কুলজাত গোবিন্দ রায় নামক এক ‘ধর্মান্তরিত সুফি দরবেশের’ কাছ থেকে তিনি ‘ইসলাম ধর্মে দীক্ষা’ নিলেন।

প্রথম কথা গোবিন্দ রায় নামক ধর্মান্তরিত হিন্দু যখন সুফী দরবেশ হবেন তখন তাঁর অমন হিন্দু নাম থাকবে না। তাঁর একটি ইসলামী নাম হবে।

দ্বিতীয়ত, সুফিবাদ ও কুরআন-হাদিশ ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক ইসলাম এক নয়। সুফীবাদ অদ্বৈতবাদ, আর ইসলাম কঠোর দ্বৈতবাদ। সুফিবাদ ইসলাম-বহিস্থ ব্যাপার। সুসি

তৃতীয়ত, ইসলামে দীক্ষা মানে তিনজন মুসলমান সাক্ষীর উপস্থিতিতে কালিমা মন্ত্র উচ্চারণ করা। এই মন্ত্র উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে রান্না করা গোমাংস খাইয়ে দেওয়া হয়। লিঙ্গত্বক ছেদনের কথা বাদই দিলাম। একবার ইসলাম গ্রহণ করার পরে তা ত্যাগ করলে ইসলামত্যাগীকে হত্যা করাই বিধান।

নামাজ ত্রিসন্ধ্যা পড়ে না, দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তে হয়। নামাজ পড়া বেশ শক্ত, আর্বী ভাষায় অনেক মন্ত্র উচ্চারণ। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সব মুসলমান নামাজ পড়াও জানতো না। যে রামকৃষ্ণ নরেন কে 'লরেন' বলতেন, তাঁর পক্ষে নামাজ পড়া অসম্ভব ব্যাপার। মুসলমানদের উপাসনা মানে নামাজ পড়া। ইসলাম সাধনা বলে কোনও ব্যাপার নেই। ইসলাম প্রবৃত্তিধর্ম, এর গতি স্বর্গ-নরক। সুতরাং এর দ্বারা কেউ ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করতে পারে না।

এটা হতে পারে রামকৃষ্ণ কারও পরামর্শ শুনে কিছুদিন আল্লা আল্লা বলে চিৎকার করেছিলেন। বাকীটা সবই হৃদয় মার্কা প্রচার। শ্রীরামকৃষ্ণ গো-মাংস খেয়ে মুসলমান হলে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঠাঁই হতো না। মথুরবাবুর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ তুরুপের তাস ছিলেন ঠিকই; কিন্তু তা মন্দির অপবিত্র করে নয়। পরবর্তীকালে অক্ষয় কুমার সেন উৎকট পদ্য লিখে প্রচার করেছিলেন, 'ইসলাম সাধনাকালে' শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গায় মরা গরু ভাসতে দেখে কুকুর হয়ে সেই গরুর মাংস খেয়েছিলেন।

সন্নিকটে কূলে লাগে তরঙ্গ আঘাতে।
আইল কুকুর এক লাগিল খাইতে।।
বুঝি বা কি ভাবে মগ্ন হৈলা নারায়ণ।
কুকুরের এক সঙ্গে আস্বাদনে মন।।

এ প্রসঙ্গে জানা দরকার, মুসলমানদের মরা জন্তুর মাংস খেতে নিষেধ। কোনও মুসলমান নদীতে ভেসে আসা মরা গরুছাগলের মাংস খায় না।

পরবর্তীকালে ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ শম্ভুচরণ মল্লিক নামক দক্ষিণেশ্বরের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাগানবাড়িতে গিয়ে রামকৃষ্ণ খ্রিষ্টধর্মের কথা শুনতেন। শম্ভুচরণ খ্রিষ্টধর্ম সংক্রান্ত বই পত্র থেকে মাঝে মাঝে পাঠ করে শোনাতেন রামকৃষ্ণকে। কিন্তু তিনি খ্রিষ্টান হয়েছিলেন, এমন গল্প নেই। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, একবার আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ খ্রিষ্টান পাদ্রী বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া গেলাম;তিনি আমার মুখে রামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। আমি গিয়া যেই বলিলাম, মশাই, এই আমার একটি খ্রিষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন।

অমনি রামকৃষ্ণ প্রণত হইয়া মাটিতে মাথা দিয়া বলিলেন, যিশুখ্রিষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।

আমার খ্রিষ্টান বন্ধুটি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মশাই যে যিশুর চরণে আপনি প্রণাম করছেন, তাঁকে আপনি কি মনে করেন?

উত্তর—কেন, ঈশ্বরের অবতার।

খ্রিষ্টীয় বন্ধুটি বললেন, ঈশ্বরের অবতার কিরূপ? কৃষ্ণাদির মতো?

রামকৃষ্ণ—হাঁ, সেইরূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য, যিশুও এক অবতার।

খ্রিষ্টীয় বন্ধু—আপনি অবতার বলতে কি বোঝেন?

রামকৃষ্ণ—সে কেমন তা জানো? আমি শুনেছি কোনো কোনো স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মতো হলো। অবতার যেন, কতকটা সেইরূপ।

লক্ষ্য করার বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে অবতার বললেন না। বললেন না, যিনিই রাম তিনিই কৃষ্ণ, ইদানীং তিনিই এই শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণ।

খ্রিষ্টান পাদ্রী সাত সমুদ্র পার হয়ে এ দেশে এসেছেন হিন্দুদের খ্রিষ্টান করার ব্রত নিয়ে। ওঁর খরচ খরচা জোগাচ্ছে স্বদেশের ধনী মানুষরা। দু-দশজনকে খ্রিষ্টান করতে না পারলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে দেশে ফিরে। পাদ্রী মহাশয় হিদেন রামকৃষ্ণের পাগলামো দেখে মনে মনে বেশ মজা পেলেন নিশ্চয়।

১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ভৈরবী যোগেশ্বরীকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য কামারপুকুরে যান রামকৃষ্ণ। তখন দীর্ঘকাল বাদে সারদামণিকে বাপের বাড়ি থেকে আনা হলো। তখন সারদামণি চোদ্দ বছরের কিশোরী। সেই সারদামণির প্রতি স্বামীর কর্তব্য করতে দেখে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হলেন ভৈরবী। ব্যাপারটা নিয়ে ছোটখাটো ঝঞ্ঝাটও ঘটে। তারই পরিণামে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে চিরবিদায় নেন ভৈরবী। এরপর রামকৃষ্ণ কয়েকমাস কামারপুকুরে কাটিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। তখন ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে দেখলেন, মথুরবাবু চলেছেন তীর্থ করতে। তিনি যোগ দিলেন সেই দলে। সে যাত্রায় বৈদ্যনাথ ধাম, প্রয়াগ, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান তিনি দর্শন করেন। কাশীতে সাক্ষাত হয় সাধক ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে। বৃন্দাবনের নিধুবনে সাধিকা গঙ্গামায়ীর সঙ্গে আলাপ এত নিবিড় হয়ে উঠেছিল যে তিনি চিরদিনের মতো সেখানেই থেকে যাবার সংকল্প করেছিলেন। মথুরবাবু ও হৃদয় অনেক সাধ্যসাধনা করে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। ফেরার পথে রামকৃষ্ণ কদিন কাশীধামে ছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে ভৈরবী যোগেশ্বরীর দেখা হয়ে যায়। যে কদিন কাশীতে ছিলেন সে কদিনই ভৈরবীর কাছে যেতেন। দীর্ঘ ভ্রমণের শেষে দক্ষিণেশ্বরের ফেরার পর তিনি একটি দারুণ মানসিক আঘাত পান। তাঁর চোখের সামনেই ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যু ঘটে ১৮৬৯ এ।

শোকগ্রস্ত রামকৃষ্ণকে নিয়ে মথুরবাবু নিজের জমিদারী এলাকায় ভ্রমণ করতে বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরে এলেন কালনা, খুলনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান। কালনায় বৈষ্ণব সাধু ভগবানদাস বাবাজীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়।

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের মুরুব্বি রাসমনি-জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসের মৃত্যু হলো।

রামকৃষ্ণের স্ত্রী সারদামনি এতদিন বাপের বাড়ীতেই ছিলেন। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত।

রামকৃষ্ণ একটু অস্বস্তিতে পড়লেন বটে, কিন্তু যুবতী স্ত্রীকে অবহেলা করলেন না। পথযাত্রাক্রান্ত স্ত্রীকে নিজের কাছে রেখে সুস্থ করে তুললেন। পরে এক ফলহারিণী কালীপূজার রাতে 'ষোড়শী পূজা' করে তাঁর ভগবতী হওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিলেন।

কিন্তু সারদামণি সম্ভবত ভগবতী হতে চান নি। তিনি সাধারণ রমণী হয়ে ঘরকন্না করতে চেয়েছিলেন। তাই আর পাঁচটা যুবতীর মতো স্বামীকে 'ওষুধ' করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের অভিপ্রায় অন্য। তিনি সারদামণিকে 'ওষুধ' করতে নিষেধ করতেন। উত্তরকালে রামকৃষ্ণ যেমন ঠাকুর ও অবতার হয়েছেন, সারদামণিও ভগবতী হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ যেমন স্ত্রীর দেখভালের জন্য কিছু সঞ্চয় করেন, শ্রীরামকৃষ্ণও নিজের গহনা—যা তিনি মথুরবাবুর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন সখীভাবে সাধনা করার সময়, সেগুলি বিক্রি করে চারশো টাকা বলরাম বসুর জমিদারীতে খাটানোর জন্য জমা করেছিলেন। তা থেকে তিরিশ টাকা করে সুদ আসতো সারদামণির খরচের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে সারদামণিকেও বলতেন, তোমার ভক্তরা যে যেখানেই আদর করে রাখুক না কেন, কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি নষ্ট করবে না।

সাধক রামকৃষ্ণ নারীদের সংসারের জঞ্জাল মনে করলেও নিজের স্ত্রীর প্রতি যেভাবে কর্ত্তব্য পালন করেছেন তা চিন্তা করে অভিভূত হতে হয়।

এই মানুষই বলতেন, স্ত্রীলোক গায়ে ঠেকলে অসুখ হয়, যেখানটায় ঠেকে শরীরের সেই অংশটি ঝনঝন করে, মনে হয় সিঙ্গি মাছ কাঁটা মেরেছে। সাধারণভাবে স্ত্রী-জাতি সম্পর্কে এরকম অবজ্ঞা প্রকাশ করলেও মা চন্দ্রমণি দেবী ও স্ত্রী সারদামণিকে রামকৃষ্ণ বরাবর দেখাশুনা করেছেন। চন্দ্রমণিকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি নহবৎ খানার ঘরে থাকতেন। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পুত্রের কাছেই ছিলেন। সারদামণি এলে তাঁর জন্য একটি কুটিরের ব্যবস্থা করেছিলেন শম্ভুচন্দ্র মল্লিকের মাধ্যমে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে ঠাকুর হলেও স্বজনদের কথা স্মরণে রাখতেন সর্বদা। সুযোগ পেলেই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের একটা না একটা কাজে তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। এইভাবেই দক্ষিণেশ্বরের কাজে এসেছে হলধারী, রামেশ্বর, অক্ষয়, রামলাল, লক্ষ্মীমণি দেবী। আর হৃদয়রামের তো আগমন অনেক আগেই হয়েছে।

'কামিনী-কাঞ্চন' দোষে দুষ্ট হয়ে হৃদয় ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর থেকে বিতাড়িত হন মথুরবাবুর পুত্র ত্রৈলোক্য নাথের দ্বারা। ত্রৈলোক্যনাথ ক্রুদ্ধহয়ে রামকৃষ্ণ দেবকেও বহিষ্কার

করতে চেয়েছিলেন। পরে নিরস্ত হন। বিতাড়নের পরে হৃদয়রাম একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে বলেছিলেন, তোমাকে রামকৃষ্ণ করলো টা কে? আমিই।

সত্যিই, রামকৃষ্ণ সম্পর্কে সব উদ্ভট গুজবের সূত্র হৃদয়।

হৃদয় দক্ষিণেশ্বর থেকে বিতাড়িত হলেও রামকৃষ্ণের তেমন অসুবিধা হলো না। কেশবচন্দ্র সেন পত্র-পত্রিকায় তাঁর কথা ব্যাপকভাবে প্রচারের ফলে একটা হুজুগের সৃষ্টি হলো। দলে দলে লোক দক্ষিণেশ্বরে আসতে লাগলো শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার জন্য। কোচবিহার বিবাহকে কেন্দ্র করে যখন কেশবচন্দ্র একঘরে ও কোণঠাসা হয়ে গেলেন তখন তাঁর তুরুপের তাস হলো শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার।

বেশ কিছু প্রভাবশালী মানুষও শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হলেন। যেমন, রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র ও সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। এঁরা সভাসমিতি, আলোচনা ও নগরসংকীর্ত্তনের মাধ্যমে রামকৃষ্ণের মহিমা চতুর্দিকে প্রচার করতে লাগলেন। এঁরাই শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে প্রচার করলেন। ফলে দিনে দিনে রামকৃষ্ণের ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ব্রাহ্ম সমাজের কিছু যুবকও শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ নিল। কারণ, ব্রাহ্ম ধর্মের অসারত্ব;কিছু বাছা বাছা সংস্কৃত শ্লোক —সত্যম জ্ঞানমনন্তম ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতম যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতম, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ইত্যাদি উচ্চারণ তো একটা ধর্ম হতে পারে না। ব্রাহ্ম ধর্মের আকর্ষণ শুধুমাত্র ব্রহ্ম সঙ্গীতের মধ্যে। এইসব যুবকদের মধ্যে প্রধান হলেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত। গানের মানুষ নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম দের সঙ্গে মিশেছিলেন প্রাথমিকভাবে গানের টানে ও সমাজ সংস্কারের তাগিদে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ভগবানকে পাওয়াই মানুষের জীবনের প্রাথমিক লক্ষ্য। উনি সবাইকেই ভগবান পাওয়াতেন—মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রিষ্টান সবাই ভগবানকে পাবে। যদিও ভগবানকে পাওয়া সব ধর্মের বিশ্বাসের মধ্যে আছে কি না তা তাঁর জানা ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের বিশ্বাস সম্পর্কেও তাঁর কিছু জানা ছিল না। আর বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম সম্পর্কে কোনও উচ্চারণ তিনি করেন নি। অবতারপুরুষ ঐ দুই ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

হুজুগে মাতা বাঙ্গালীর স্বভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ হুজুগে বাঙ্গালীরা মেতে আছে বা ছিল এর অর্থ এই নয় যে বাঙ্গালীরা খুব সৎ প্রকৃতির। তমোগুণপ্রধান বাঙ্গালীরা সর্বদা একজন নেতার ছাতার তলায় থাকতে চায়। সেই নেতা জনপ্রিয় হলেই হলো। শ্রীরামকৃষ্ণের অসংখ্য উপদেশ তারা মেনে চলে এমন ব্যাপার কদাচ নয়। এখন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত হওয়া একটা ফ্যাসানের ব্যাপার।

উনবিংশ শতাব্দীর বেশ কয়েকজন শিক্ষিত ব্যাক্তির সঙ্গে শ্রী রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেইসব সাক্ষাৎকার কোনও পক্ষের কাছেই সুখকর হয় নি। জল ও ওয়াটার এক হলেও খ্রিষ্টান মধুসূদনের সঙ্গে কথা বলতে শ্রীরামকৃষ্ণের বেঁধেছে। কে যেন তখন তাঁর জিভ টেনে ধরেছে। অথচ এই শ্রীরামকৃষ্ণই যিশুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছেন। তিনি যিশুকে অবতার

জ্ঞান করতেন। বিদ্যাসাগরকে তিনি এককথায় চিনে ফেলেছেন। তাঁর বুদ্ধির দৌড়ও বুঝে নিয়েছেন। বুঝেছেন, বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য থাকলেও অন্তর্দৃষ্টি নেই। বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর নকল মাণিক বোধ হয়েছে। কারণ ঠিক মাণিক জলে ভাসে না। রামকৃষ্ণর মুখে এসব কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন, তিনি নিরুপায়; কারণ, তাঁর পিঠে শোলা বাঁধা আছে।

একদিন ভক্তশিষ্যরা শ্রীরামকৃষ্ণকে বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী পড়ে শোনাচ্ছিল। প্রসঙ্গ ছিল, নায়িকা প্রফুল্লকে সাংখ্য-বেদান্ত-ন্যায় পড়ানো হচ্ছে। রামকৃষ্ণ বঙ্কিমের ভাবনা দেখে রেগে গিয়ে বললেন, 'এর মানে কি জানো। না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না। যে লিখেছে, এইসব লোকের এই মত। এরা ভাবে আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর। ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই।'

শুধু লেখাপড়া করে বা মেধা দিয়ে যে ঈশ্বর উপলব্ধি হয় না, সে বোধ বঙ্কিমচন্দ্রের খুব ভালোই ছিল। উপনিষদ তিনি পড়েছিলেন এবং আত্মস্থ করেছিলেন। তিনি এও লিখে গেছেন, নিরাকার, অচিন্ত্য ব্রহ্মে র উপাসনা হয় না। আর রামকৃষ্ণ ভাবতেন নিরাকার ব্রহ্মে র উপাসনা হয়, অচিন্ত্য ব্রহ্মে র সঙ্গীত রচনা সম্ভব।

বেদ-উপনিষদ, কুরআন-বাইবেল এগুলি ধর্মশাস্ত্র। এই ধর্মশাস্ত্রগুলির পুঁথি অছে। সেইসব পুঁথি মানুষ পড়ে। বা, গুরু মুখে ধর্মের বাণী শুনতে হয়। তবে বিধাতাকে জানা যায়। সেই জ্ঞানটুকু না থাকলে কোনটা শালগ্রাম শিলা, কোনও সামান্য নুড়ি পাথর তা জানা যায় না। জানা যায় না কোনটা প্রবৃত্তি ধর্ম কোনটা নিবৃত্তি ধর্ম। কোনটা ধর্মের নামে রাজনীতি আর কোনটা ধর্ম তাও জানা যায় না। তখন জল আর পানি একাকার করে বসে মানুষ। ঈশ্বর লাভ সব ধর্মের বিষয়বস্তুও নয়। দ্বৈতবাদী ইসলামে আল্লাহ্ মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচারক মাত্র। হিন্দুধর্মও বলেনি সবাইকে ঈশ্বর লাভ করতে হবে। সংসারী হিন্দু পুরুষ চর্তুবর্গ সাধন করেন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। তাঁরা আগে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন;পরে মনের মধ্যে তিতিক্ষা জন্মালে মোক্ষ নিয়ে মাথা ঘামান। একজন হিন্দুর কাছে ধর্ম শব্দটির প্রাথমিক অর্থ ন্যায়। অন্যায় না করে জীবন যাপন করাটাই ধর্ম। আর শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান সম্পর্কে যা যা শিখেছেন তা যাত্রা, কথকতা থেকে বা অন্যের মুখ থেকে। ধর্মতত্ত্ব তাঁর মনের মধ্যে আপনি আপনি জন্মায়নি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শ্রীমদ্ভগবৎগীতা—এগুলি সবই পড়তে হয়;তবেই কি লেখা আছে জানা যায়। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে যে বাইবেলের প্রত্যাদেশ পোরা আছে তা তিনি জানতেন না। ধনী ব্রাহ্মদের বাৎসরিক পিকনিকে যোগ দিয়ে পেট ভরে আহার করে আসতেন। তাঁর সরলতা আর কথকতা আকৃষ্ট করতো মানুষদের। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্রাহ্মরাও ঈশ্বর লাভ করবে। আর, ব্রাহ্মরা বিশ্বাস করতো উপনিষদের কিছু শ্লোক নিত্য আবৃত্তি করলেই ব্রহ্ম উপলব্ধি হবে। এর জন্য নিষ্কাম হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারীতে অন্যায়ভাবে প্রজানিপীড়ন করতেন আর কলকাতায় বসে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করতেন। যেন প্রজারা মনুষ্যেতর কোনও জীব। তাদের পীড়নে পাপ নেই।

অন্যান্য জমিদাররা যে প্রজাদের কাছ থেকে আইনমাফিক খাজনা আদায় করতেন, এমন ব্যাপার নয়। উল্লেখ্য যে বাগবাজারের বলরাম বসুও জমিদার ছিলেন। তাঁর জমিদারী ছিল উড়িষ্যায়।

যাই হোক কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য ব্রাহ্মদের সঙ্গে ঢলাঢলি করে ভালোই চলছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। অনুরাগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছিল। ব্রাহ্মদের মধ্যে একটা রামকৃষ্ণ হুজুগ সৃষ্টি হয়েছিল। এর একটা কারণ হলো ব্রাহ্ম ধর্মের শুষ্ক সংস্কৃত শ্লোক এক নাগাড়ে উচ্চারণ আর বেদীতে বসে উপদেশ সব ব্রাহ্মের মনস্তুষ্টি করতে পারছিল না। কেবলমাত্র সঙ্গীতই সবাইকে আকৃষ্ট করতো। বেদীতে বসা দেবেন্দ্রনাথ বা কেশবচন্দ্রের চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেক বেশী পুতচরিত্রের ঈশ্বরভক্ত বলে মনে হয়েছিল বহু ব্রাহ্মের। বস্তুত ব্যাপারটা ছিল তাই-ই। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে বিধর্ম উন্মাদ কেশবচন্দ্র 'নববিধান' ঘোষণা করলেন। এটা হলো অনেকগুলি ধর্মকে এক হাঁড়িতে পুরে একটা ব্যাঞ্জন রান্নার প্রচেষ্টা। সেখানে এক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের সাপে নেউলে, সিংহ মেষের সম্পর্ক বা কুকুর শেয়াল সম্পর্ক। নির্বোধ কেশবচন্দ্র কলকাতায় বসে ভাবলেন, এতেই পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম সমস্যার অবসান ঘটলো। এখন সারা পৃথিবী জোড়া ইসলামী চার্চ (মিল্লত) আর খ্রিষ্টান চার্চ 'নববিধান' মেনে চলে নিজেদের বিলুপ্ত করে দেবে নির্বোধ কেশবচন্দ্রের পায়ের তলায়। কাছাখোলা কালিদাস আর কাকে বলে!

এদিকে উত্তর প্রদেশের আলিগড়ে সিপাহী বিদ্রোহে পরাজিত হতাশাগ্রস্ত মুসলমানদের সংহত করতে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ মোহমেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেছেন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হিন্দু মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্ব ঘোষণা করবেন। ওয়াহাবী আন্দোলনের রেশ তখনও মিলিয়ে যায় নি। ফরাজী আন্দোলন সম্পর্কে একই কথা; দুদু মিঞার পুত্র নোয়া মিঞা ফরাজীদের হাল ধরেছেন। সারা বাঙ্গলা জুড়ে মুসলিমরা সচেতন হচ্ছে নিজেদের বিচ্ছিন্নতাবাদী সত্তা নিয়ে। বিধর্মউন্মাদ কেশবচন্দ্র একটা নেশাগ্রস্ত হয়ে আছেন। সোনার পাথরবাটি তিনি সৃষ্টি করবেনই।

শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্যই গ্রস্ত হলেন 'ফ্যাৎনা ডোবা' কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' দ্বারা। কেশবচন্দ্র অনুসারী সহ দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্লোগান দিতেন, 'নববিধানের জয়'। আর নববিধানের জীবন্ত দেবতা তো স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রিষ্টান সবাইকেই 'ঈশ্বর' পাইয়ে দিতেন।

বিধর্ম-পাগল হলেও কেশবচন্দ্র বিষয়ী ছিলেন। সুনীতির পরে আরও এক কন্যাকে কোচবিহার রাজপরিবারে বিয়ে দিলেন। অন্য এক কন্যাকেও বিয়ে দিলেন ময়ুরভঞ্জের এক রাজ পরিবারে।

উনিশ শতকের কুৎসিত ধর্ম দূষণকারী কেশব চন্দ্র দীর্ঘজীবী ছিলেন না। নববিধান করতে করতেই তিনি রোগগ্রস্ত হলেন। সেকালের মারণ রোগ ডায়াবেটিস হলো তাঁর।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের জন্য মায়ের কাছে ডাব চিনি মানত করলেন। কিন্তু মা অবতার পুরুষের কথা রাখলেন না। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ছে-চল্লিশ বছর বয়সে দেহান্ত হলো এই বিধর্ম-উন্মাদ মানুষটির।

শ্রীরামকৃষ্ণও বেশীদিন বাঁচলেন না। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গলায় ব্যাথা অনুভব করতে থাকেন। কয়েকমাস পরেই গলা দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করলো। কলকাতার ডাক্তাররা পরীক্ষা করে জানালেন তাঁর ক্যান্সার হয়েছে। চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার সুবিধার জন্য জীবনের শেষ দিনগুলিতে তাঁকে রাখা হলো কাশীপুরের এক বাগানবাড়িতে। তাঁর চিকিৎসক ছিলেন বিখ্যাত মহেন্দ্রলাল সরকার। সারাক্ষণ তাঁর দেখভাল করতে লাগলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ একদল তরুণ ভক্ত। এই কাশীপুরের বাগানবাড়িতেই ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগষ্ট, সোমবার শ্রীরামকৃষ্ণ ইহলীলা সংবরণ করেন।

রামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই কাশীপুর বাগানবাড়ির খরচ কমানোর প্রসঙ্গ নিয়ে ভক্তরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যান। গৃহী ও ত্যাগী। গৃহীদের মুখপাত্র ছিলেন নরেন্দ্রের আত্মীয় ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত, যিনি নরেন্দ্রকে রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অন্যদিকে ত্যাগীদের মুখপাত্র ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু কিভাবে খরচ কমানো হবে তাই নিয়ে লাগলো বিবাদ। পরিস্থিতি এমন এক জটিল অবস্থায় পৌঁছলো যে ক্যান্সার রোগগ্রস্ত রামকৃষ্ণকে হস্তক্ষেপ করতে হলো শান্তি ও ঐক্য রক্ষার তাগিদে।

এর পরের বিবাদ লাগলো শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর চিতাভস্মের ব্যবস্থা নিয়ে। এ ব্যাপারেও বিবাদ ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত বনাম নরেন্দ্রনাথ। গৃহীরা ঠিক করলেন রামচন্দ্রের খরিদ করা কাঁকুড়গাছির বাগানবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্মাধার সংরক্ষিত হবে। অন্যদিকে এ ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানালেন নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা। অধিকাংশ ভক্তের সায় ছিল রামচন্দ্রের প্রস্তাবে। যখন দেখা গেল কাঁকুড়গাছিতে ভস্মাধার নিয়ে যাবার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভক্তদের বিরোধিতা করা যাবে না। তখন গোপনে ভস্মাধার থেকে কিছু ভস্ম নরেন্দ্রনাথের দুই বিশ্বস্ত অনুগামী শশী ও নিরঞ্জন একটি ভস্মাধারে ভর্তি করে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে লুকিয়ে রাখলেন। পরবর্তীকালে এই চিতাভস্মই বেলুড় মঠে রক্ষিত হয়েছিল।

কথামৃততে শ্রীম লিখেছেন, "ঠাকুর কাহাকেও সন্ন্যাসীর বাহ্য চিহ্ন (গেরুয়া) ধারণ করিতে অথবা গৃহীর উপাধি ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন নাই। তাহারা লোকের কাছে দত্ত, ঘোষ, চক্রবর্তী ইত্যাদি উপাধিযুক্ত হইয়া পরিচয় ঠাকুর অদর্শনের পরও কিছুকাল দিয়াছিলেন।"

সুতরাং রামকৃষ্ণের প্রয়াণের পর স্বাভাবিকভাবেই গৃহী ভক্তরা বললেন, সন্ন্যাস গ্রহণের কোনও তত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার করে যাননি। গেরুয়া পরাকে শ্রীরামকৃষ্ণ সবসময় ত্যাগের বহিঃ প্রকাশ বলে স্বীকার করতেন না।

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বাদশ ভক্তদের গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করেন নি। তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামী বুড়ো গোপাল বস্তুগুলি কিনে এনেছিলেন এবং তাঁরই অনুরোধে তিনি এ কাজ করেছিলেন। এই দ্বাদশ জন ছিলেন—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, তারক, শরৎ, শশী, কালী, লাটু ও বুড়ো গোপাল। অবশিষ্ট বস্ত্রখানি পেয়েছিলেন একমতে গিরিশ অন্য মতে ছোট গোপাল। শেষোক্ত দুজনের কেউই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি।

পরবর্তীকালে যে গল্প তৈরী হলো তাতে এই ঘটনাকে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান বলেই বর্ণনা করা হলো। তবে নরেন্দ্র ভ্রাতা মহেন্দ্র নাথ দত্ত লিখেছেন, বরাহনগরে মঠ প্রতিষ্ঠা করার পর নরেন্দ্রনাথ সহ অন্যান্য ভক্তরা বাইরের দিকের বেলগাছতলায় নিয়ম অনুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, প্রাচীন মুনি-ঋষিরা সবাই বিবাহিত ছিলেন। তাঁরা সংসার-জীবনকে ঈশ্বর সাধনের প্রতিবন্ধক মনে করতেন না। আদি শঙ্করাচার্যই প্রথম দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পত্তন করেন। দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হতে হলে সন্ন্যাসী গুরুর কাছেই দীক্ষা নিতে হয়—নিজেরা নিজেরা বিরজা হোম করলেই হলো না। নরেন্দ্রনাথরা সব নিজেরাই করেছেন।

মঠ স্থাপনের ক্ষেত্রেও নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সহযাত্রীদের একাংশের বিরোধিতা ঘটেছিল। বরাহনগরের ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছিলেন স্বয়ং রামচন্দ্র দত্ত ও তাঁর অনুগামীরা। তাঁদের বক্তব্য ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ এ ধরণের কোনও ইচ্ছা কোনও দিন প্রকাশ করে নি। মঠে একসঙ্গে থাকার প্রয়োজনটা কি? ঈশ্বরোপলব্ধি ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ ব্যাপারে সমষ্টির কোনও স্থান নেই।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, বিবেকানন্দের মানুষকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করার ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ কতটা সহমত পোষণ করতেন?

বিখ্যাত কৃষ্ণদাস পালকে শ্রীরামকৃষ্ণ শুধিয়েছিলেন, আচ্ছা, জীবনের উদ্দেশ্য কি? কৃষ্ণদাস পাল বলেছিলেন, আমার মতে জগতের উপকার করা, জগতের দুঃখ দূর করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, তোমার ওরকম রাঁঢ়ীপুঁতী বুদ্ধি কেন? জগতের দুঃখনাশ তুমি কি করবে? জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় জানো? এইরকম অসংখ্য জগৎ আছে। এই জগতের পতি যিনি, তিনি সকলের খবর নিচ্ছেন। তাঁকে আগে জানা এই জীবনের উদ্দেশ্য। তারপর যা হয় করো।"

এ ধরণের কথা আমাদের শোনা। জগতের পতি যখন সবার সংবাদ রাখেন, তখন তো সবার হাত পা কোলে করে বসে বসে শুধু হরিনাম করলেই চলবে। তাতেই যদি পুত্র-কন্যাদের খাওয়া জুটতো, তবে রামকুমার শুধু হরিনাম করে জীবন কাটিয়ে দিলেন না কেন? তিনি কেন প্রথা ভেঙ্গে মাড়েদের কালী মন্দিরে পূজা করতে এলেন?

একথা সত্য, কৃষ্ণদাস পালের কথার মধ্যে ঔদ্ধত্যের প্রকাশ রয়েছে। তিনি পশ্চিমী দর্শন দ্বারা গ্রস্ত। বিশ্বাস করেন হিতবাদী দর্শনে—বিশ্বাস করেন সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের কল্যাণে। তাই স্পর্ধা করেন জগতের উপকারের।

কিন্তু পরোপকার ধার্মিক মানষের সহজাত। দুপুরে নিরন্ন মানুষ অতিথি হয়ে এলে গৃহস্থ তাকে কলাপাতা কেটে এনে বসতে বলেন। অতিথিকে অন্তত ভাত ডাল দেন। প্রয়োজন হলে নিজেরা আবার ভাত চড়ান। তাঁরা ভগবানের দোহাই দিয়ে প্রার্থীকে ফেরান না। এর মধ্যে অহংবোধ খোঁজা বৃথা। দুদিন পরে তাঁরা ভুলেও যান এসব ঘটনা। বাস্তবিক, ছোটখাটো

দানের ঘটনা, মানুষের উপকারের ঘটনা, মানুষ বেশীদিন মনে রাখে না। টাকা বেশী হলে মানুষ গ্রামের বিদ্যালয়ের জন্য দান করে। এই দান করাটা কর্তব্য বলেই মনে করে।

অন্যত্র জনৈক শম্ভু মল্লিকের উদাহরণ দিয়ে রামকৃষ্ণ বলেছেন—শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণীর কথা বলছিল। আমি বললাম—সম্মুখে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেটাই নিষ্কাম হয়ে করতে হয়। ইচ্ছে করে বেশী কাজে জড়ানো ভালো নয়। ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই করতে লাগলো। কালীদর্শন আর হলো না।(হাস্য) আগে তো যো সো করে ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন করতে হয়, তারপর দান করো আর না করো। ইচ্ছা হয় খুব করো। ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম। শম্ভুকে তাই বললাম,—যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি বলবে কতগুলো হাসপাতাল ডিসপেনসারী করে দাও (হাস্য) ভক্ত কখনও তা বলে না। বরং বলবে—ঠাকুর! আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্বদা রাখো, পাদপদ্মে শ্রদ্ধাভক্তি দাও।

এ সবও শাস্ত্রজ্ঞানহীন শ্রীরামকৃষ্ণের অলীক কথা। ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারই শেষ কথা হিন্দুধর্মের। তিনি অর্ন্তযামী। তাঁকে একটি কথাও বলার প্রয়োজন করে না। তাঁর সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হয়েছে, এটাই যথেষ্ট, এটাই চূড়ান্ত, এর পরে আর কিছু নেই।

কেন উপনিষদে আছে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার কাছে যক্ষ রূপে দেখা দিয়েছিলেন ব্রহ্ম। এইসব দেবতাদের বহু বৎসরের তপস্যার ইতিহাস ছিল।

হাসপাতাল-ডিসপেন্সারী স্থাপন করা মানুষের মনুষ্যোচিত কাজ। এটা ভগবানের কাজ নয়। সবাই অহংকারের বশবর্তী হয়ে একাজ করে—এমন ধারণা সঠিক নয়। আর, এক জনের অহংকারে যদি দশ হাজার জনের উপকার হয়, আমি তাতে বাদ সাধবো কেন? মানুষের উপকারই তো শেষ কথা মানুষের কাছে।

আর গোটা উত্তর ভারত জুড়ে মন্দিরের কাছে ভিক্ষুকদের জমায়েত দেখা যায়। মন্দিরের ঢোকার আগেই প্রতিমা দর্শনার্থী ভিক্ষুকদের পয়সা দেন। এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম ভিক্ষাপ্রদানকারীকে। উত্তর এসেছিল, ওরাই তো আসল ভগবান বাবু। ওদের দু-এক পয়সা না দিয়ে তো দেওতা দর্শন করার ফল হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের এইসব কথার নিরিখে অন্তত এ কথা বলা যেতে পারে তিনি বিবেকানন্দের মতো বিশ্বাস করতেন না জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। তিনি উপনিষদের বাণী জানতেন না, এমন কথা বললাম না। নর ই নারায়ণ, এটা উপনিষদ না পড়েও মানুষ জানে। তাই দরিদ্র নারায়ণ সেবা বলে একটা কথা আছে হিন্দু সমাজে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন শেষের এক মর্মস্পর্শী বিবরণ রেখে গেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি লিখেছেন, রামকৃষ্ণের জীবনের শেষ কয়েক বৎসর আমার সহিত তাঁহার খুব কম দেখা হয়—অবশ্য তাহার পিছনে ছিল দুইটি কারণ। প্রথমতঃ, এ সময়ে তাঁহার নিকট কয়েকজন

নূতন ভক্ত আসেন এবং তাঁহাদের মাধ্যমে তাঁহার সহিত রঙ্গমঞ্চের দু'একটি অভিনেতার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মে। উক্ত ব্যক্তিদের আমি মোটেই পছন্দ করিতাম না। সুতরাং উহাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা আমার মনে তিক্ততারই সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্য তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। আমি এই মতবাদ কোন সময়েই মানিতে পারি নাই। পাছে এই প্রসঙ্গ লইয়া অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এই আশঙ্কায় আমি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত বন্ধ করি।

অনেকদিন পরের কথা। একদিন আমারই এক বিশেষ পরিচিত ব্যক্তির নিকট রামকৃষ্ণের অসুখের সংবাদ পাইয়া বিচলিত হইয়া পড়ি। সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া তখনই আমি দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করি। তখন তাঁহাকে চিকিৎসার্থ স্থানান্তরিত করার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। আমাকে দেখিয়া তো কিছুক্ষণ তিনি রুদ্ধঅভিমানে চুপ করিয়া রহিলেন। আমি কেন তাঁহার এত অসুখেও দেখিতে আসি নাই ইহা লইয়াও বার বার অনুযোগ করিতেও ছাড়িলেন না।

আমার ব্যবহারে তিনি আন্তরিক দুঃখ পাইয়াছেন দেখিয়া আমিও দুঃখিত না হইয়া পারি নাই। আমি অকপটে তাঁহাকে না আসিবার কারণ দুইটি জানাইয়া দিলাম;আরও বলিলাম—আপনার শিষ্য ও ভক্তরা আপনাকে ঈশ্বরের এক নূতন সংস্করণরূপে যেভাবে প্রচার আরম্ভ করেছে, তাতে—আমি সাধারণ মানুষ, ঈশ্বরের এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে ভরসা পাইনে।

সরল অনাবিল হাস্যে সমস্ত কক্ষটি মুখরিত করিয়া রামকৃষ্ণ বলিলেন—একবার ভেবে দেখ, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর গলার ক্যান্সারে মরতে বসেছে!

তারপর উৎসাহী ভক্তদের উদ্দেশ্যে স্বগতোক্তি করিলেন—বোকার অশেষ গুণ।"

চার

এবার বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ নিয়ে আলোচনার অসুবিধা এই যে, আমাদের দেশের জীবনীকাররা জীবনী লিখতে গিয়ে গল্প লেখেন;আর গল্প-কবিতা লিখতে গিয়ে কপি করেন বিদেশী সাহিত্যের। গাধা নিয়ে কবিতা প্রকাশ করলেন দুজন। একই বক্তব্যের কবিতা। একজন অন্যকে দোষারোপ করলেন তার কবিতা চুরি করার জন্য। অন্যজন বললেন, চুরি যদি করে থাকি তবে তা অমুক সাহেবের কবিতা, তোমার কবিতা নয়।

আর প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী পড়ে জানা যায় উনিশ শতকের বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁরা দেওয়ান ও সেরেস্তাদারের কাজ করতেন তাঁরা সবাই প্রচুর পরিমাণে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করতেন। আর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে যাঁরা জমিদার হয়েছিলেন তাঁরা প্রজাদের উপর অবৈধ অতিরিক্ত কর (আবওয়াব) বসিয়ে অবৈধ ভাবে ধনী হয়েছিলেন। অর্থাৎ, দেওয়ালে যাদের ছবি আমরা টাঙিয়ে রাখি, তাঁরা অনেকেই জঘন্য চরিত্রের মানুষ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ লিখতে গিয়ে সমস্যা প্রচুর। দুজনেই এখন গল্পের নায়ক। প্রচলিত গল্প যে শ্রীম রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ ডায়েরীতে লিখে রাখতেন। সুতরাং কথামৃতের সব কথাই সত্য। কিন্তু এটার মধ্যে একটা প্রতারণা আছে। ডায়েরীর পাতায় লিখলেও শ্রীম ছোট ছোট নোট রাখতেন মাত্র। ডায়েরী লেখা বলতে যা বোঝায় তা করতেন না। আমাদের সংগ্রহের মধ্যে শ্রীম'র একদিনের ডায়েরীর পাতার একটি ফটোকপি আছে। সেই পাতা অবলম্বনে শ্রীম বহুদিন পরে কথামৃতের চারটি অধ্যায় লিখেছিলেন। সুতরাং কথামৃত প্রচুর ফেনানো ব্যাপার। ফেনাতে গিয়ে প্রচুর নিজের কথা ঢুকিয়েছেন শ্রীম। সুতরাং কথামৃত আমাদের বিবেকানন্দ জীবনী রচনায় খুব বেশী সহায়তা করবে না।

বিবেকানন্দের পিতা ছিলেন অ্যাটর্নী বিশ্বনাথ নাথ দত্ত আর মা ভুবনেশ্বরী দেবী। নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ই জানুয়ারী উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন।

সেদিন ছিল মকর সংক্রান্তি। তবে বিশ্বনাথ বেশীদিন অ্যাটর্নী হন নি। বিবেকানন্দ যখন তিন বছরের শিশু তখন তিনি অ্যাটর্নীশিপ পরীক্ষায় পাশ করেন। তার আগে তাঁর কষ্টের জীবন ছিল;অল্পবয়সে বাবা সন্ন্যাসী হয়ে যান। কাকার কাছেই তিনি অবহেলায় বড় হন।

বিবেকানন্দ ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তার দশ বছর পরে ইংরেজীতে বিবেকানন্দের প্রথম জীবনী The Life of Swami Vivekananda প্রকাশিত হয়। বিবেকানন্দ নিজের বাল্যকথা কখনও লিখে যান নি। বাল্যকাল সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জীবনীকাররা সংগ্রহ করেন নরেন্দ্র মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর কাছ থেকে। কারণ তিনি ১৯১১ সাল অবধি জীবিত ছিলেন। যদিও তাঁর পুত্র যৌবনে 'পৌত্তলিকতা-বিরোধী' ব্রাহ্ম হয়ে যান, কিন্তু যখন সন্তানের মৃত্যু হয় তখন তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু নেতা, সুতরাং ভুবনেশ্বরী দেবী শিশুপুত্রকে পরম ধার্মিক হিন্দু হিসাবে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করবেন, এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই।

প্রিয়নাথ সিংহ ছিলেন নরেন্দ্রনাথের পাড়ার লোক। সেই সঙ্গে সহপাঠী বন্ধুও। নরেন্দ্রনাথের যৌবনের এক অন্তরঙ্গ ছবি এঁকেছিলেন প্রিয়নাথ :

নরেন্দ্রনাথ হেদোর ধারের জেনারেল এসেম্বলিজ কলেজে পড়েন। এফ.এ. সেখান থেকেই পাশ করেছেন। তঁর অসংখ্য গুণে সহপাঠীরা অনেকে বড়ই বশীভূত। তাঁরা তাঁর গান শুনতে, মিষ্টি কথাবার্তা, সুযুক্তিপূর্ণ তর্ক শুনতে এতই ভালবাসতেন যে অবসর পেলেই নরেনের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতেন। সেখানে বসে একবার তাঁর তর্কযুক্তি বা গানবাজনা আরম্ভ হলে সময় যে কোথা দিয়ে চলে যেত তা বুঝতে পারতেন না।

নরেন্দ্র এখন তাঁর পিত্রালয়ে দুবেলা কেবল আহার করতে যান। আর সমস্ত দিবারাত্র নিকটে রামতনু বসুর গলিতে মাতামহীর বাড়িতে থেকে পাঠাভ্যাস করেন। পাঠাভ্যাসের খাতিরেই যে এখানে থাকেন তা নয়। নরেন্দ্র নিভৃতে থাকতে ভালোবাসেন। বাড়িতে অনেক লোক, বড় গোলমাল, নিশীথে ধ্যান জপের বড়ই ব্যাঘাত। মাতামহীর বাড়িতে লোক বেশী নয়, দু একজন যাঁরা আছেন তাঁদের দ্বারা নবেনের কোন ব্যাঘাত ঘটেনা। কচিকাঁচা ছেলেদের দ্বারাই অধিক গোলমাল হয়, এখানে একটিও নাই। যে ঘরটিতে নরেন থাকেন তা বারবাড়ির দোতলার, সম্মুখেই উপরে উঠবার সিঁড়ি। অন্দরমহলের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব নেই। সুতরাং তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা যার যখন ইচ্ছা এসে উপস্থিত হন। নরেন নিজে এই অপূর্ব ছোট ঘরটির নাম রেখেছিলেন 'টঙ'। কাউকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যেতে হলে বলতেন, চল টঙে যাই।

ঘরটি বড়ই ছোট, প্রস্তে চার হাত, দৈর্ঘে প্রায় তার দ্বিগুণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটি ক্যাম্বিসের খাট, তার উপর ময়লা একটি ক্ষুদ্র বালিশ। মেঝের উপর একটি ছেঁড়া সপ পাতা। এক কোণে একটি তম্বুরা। তারই কাছে একটি সেতার ও একটি বাঁয়া। বাঁয়া কখনও ঐ মাদুরের উপর পড়ে থাকে, কখনও বা ঐ খাটিয়ার নিচে পড়ে থাকে, কখনো বা তার উপর চড়ে বসে থাকে। ঘরের এক পাশে একটি থেলো হুঁকো, তার কাছে একটি তামাকের গুল আর ছাই ঢালবার একখানি সরা। তারই কাছে তামাক টিকে ও দেশলাই রাখবার একটি

মাটির পাত্র। আর কুলুঙ্গিতে, খাটের উপর হেথা সেথা ছড়ানো পড়বার পুস্তক। একটি দেওয়ালে একটি দড়ি খাটানো। তাতে কাপড়, পিরাণ ও একখানি চাদর ঝুলছে। ঘরে দু-একটা ভাঙ্গা শিশিও রয়েছে। সম্প্রতি তাঁর পীড়া হয়েছিল, তারই নজির। নরেন মনে করলেই বাড়ি থেকে পরিষ্কার বালিশ, উত্তম বিছানা, ও একটু ভালো দ্রব্যাদি এনে দু-একটি ছবি দিয়ে আপনার ঘরটি বেশ সাজাতে পারতেন। করতেন না যে, তার কারণ তাঁর ও সমস্ত দিকে কোন প্রকার খেয়ালই ছিল না। সেজন্য ঘরের সর্বত্র একটা বাসাড়ে বাসাড়ে ভাব। প্রকৃত কথা, আত্মতৃপ্তির বাসনা তাঁর বাল্যাবস্থা থেকেই কোন বিষয়ে দেখা যেত না।

নরেন্দ্র আজ মনোনিবেশ করে পাঠ করছেন। এমন সময় বন্ধুর আগমন হলো। বেলা এগারোটা। আহারাদি করে নরেন্দ্র পাঠ করছেন। বন্ধু এসে নরেনকে বললেন, "ভাই , রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা।" অমনি নরেন পড়বার বই মুড়ে একধারে ঠেলে রাখলেন। ......বন্ধু মাঝে মাঝে তামাক সেজে নরেনকে খাওয়াচ্ছেন ও নিজে খাচ্ছেন। সেটা কেবল বাজানো থেকে একটু অবসর না নিলে হাত যে যায়। নরেন্দ্রের কিন্তু গানের কামাই নেই। হিন্দী গান হলে নরেন তার মানে বলছেন ও তার অন্তর্নিহিত ভাবতরঙ্গের সঙ্গে সুর লয়ের অপূর্ব ঐক্য দেখিয়ে বন্ধুকে বিমোহিত করছেন। দিন কোথা দিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যা এল, বাড়ির চাকর এসে একটা মিটমিটে প্রদীপ দিয়ে গেল। ক্রমে রাত্রি দশটার সময় দুজনের হুঁশ হলে সেদিনকার মতো পরস্পর বিদায় নিয়ে নরেন্দ্র পিত্রালয়ে ভোজনের জন্য গেলেন।"

প্রিয়নাথ সিংহের বর্ণনায় আমরা এক আবেগপ্রবণ যুবকের ছবি পাচ্ছি, যিনি গান গাইতে গাইতে আত্মহারা হয়ে যান, পড়াশুনা ফেলে বই সরিয়ে রেখে গান শুরু করেন বন্ধুর অনুরোধে। তাঁর ছোট্ট ঘরটি অগোছালোই থাকা স্বাভাবিক। গোছালো হলে তা নরেন্দ্রের পাটোয়ারী মানসিকতার পরিচয় প্রদান করতো।

নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ৫১.৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম ডিভিশনে এন্ট্রান্স পাশ করেন। তারপর এফ এ পড়তে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে, ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে। এই সময় ম্যালেরিয়ার দরুণ অনেকদিন ক্লাস করতে পারেন নি। ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে এফ এ পরীক্ষায় বসতে দিতে চায় নি। কিন্তু কাছাকাছি কলেজ জেনারেল এসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশন তাঁকে পরীক্ষায় বসবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে জেনারেল এসেম্বলিজে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের শেষে এফ এ পরীক্ষায় বসেন।

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম ডিভিশনে পাশ করলেও এফ এ ও বি এ পরীক্ষায় নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় ডিভিশনে পাশ করেন।

বিভিন্ন পরীক্ষায় তাঁর প্রাপ্ত নম্বর হলো,

এন্ট্রান্স : ইংরেজী-৪৭/১০০; দ্বিতীয় ভাষা, (বাঙ্গলা)-৭৬/১০০; ইতিহাস-৪৫/১০০; গণিত-৩৮/১০০; মোট ২০৬ (প্রথম ডিভিশন) ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ

ফাস্ট আর্টস : ইংরেজী-৪৬/১০০; দ্বিতীয় ভাষা-৩৬/১০০; ইতিহাস-৫৬/১০০; গণিত-৪০/১০০; লজিক-১৭/৫০; সাইকোলেজি-৩৪/৫০; মোট-২২৯ (দ্বিতীয় ডিভিশন) ১৮৮১

ব্যাচেলর অব্ আর্টস: ইংরেজী ৫৬/১০০; গণিত-৬১/১০০; দ্বিতীয় ভাষা-৪৩/১০০; ইতিহাস-৫৬/১০০; ফিলোসফি-৪৫/১০০; মোট-২৬১ (দ্বিতীয় ডিভিশন) ১৮৮৩।

সুতরাং ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন নিতান্তই মাঝারী। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে বিবেকানন্দ বইয়ের পোকা ছিলেন না। আর গান ছিল তাঁর প্রথম প্রেম। অনায়াসে পড়া ছেড়ে গান গাইতে শুরু করতেন তিনি। পরবর্তীকালে তিনি প্রমাণ দেবেন ইংরেজী আর সংস্কৃত তিনি ভালোই শিখেছিলেন, আর পারঙ্গম ছিলেন বিতর্কে। হিন্দু শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব তিনি ইংরেজীতে প্রকাশ করেছেন অবহেলায়।

এই যুবক সমসাময়িক হুজুগ অনুযায়ী ব্রাহ্ম, তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। সেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমল থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে স্বাক্ষর করে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করতে হতো। বর্তমানে ব্রাহ্ম সমাজের ওয়েবসাইট আছে, ডব্লু ডব্লু ডব্লু দি ব্রাহ্ম সমাজ। এতে ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়।

যাই হোক, নরেন্দ্রর সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ দুটিরই সুসম্পর্ক ছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের 'নববৃন্দাবন' নামক নাটকে যেমন তিনি এক যোগীর ভুমিকায় অভিনয় করেছিলেন তেমনই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্রহ্ম সঙ্গীত গাইতেন তিনি। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থ কন্যা লীলার বিয়ে তে তিনি রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরে গান করেন, এ সংবাদ আছে।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ মন্ত্র ছিল ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা। ঐ সমাজ তৈরী হয়েছিল খ্রিষ্টমার্কা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙ্গে। সুতরাং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যদি কিছু ধর্মতত্ত্ব থেকে থাকে তা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের তত্ত্বই। তা সব ধরণের মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারছিল না। তার ফলেই ব্রাহ্ম দের মধ্যে একটি রামকৃষ্ণ হুজুগ সৃষ্টি হয়। রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ খ্রিষ্টপ্রেমী ছিলেন। তবে তাঁদের এই খ্রিষ্ট কদাচ বাইবেলের যিশু নন, সম্পুর্ণ কাল্পনিক যিশু। বিবেকানন্দ বিদেশে একের পর এক এক চার্চে বক্তৃতা দেবেন, ঐ কাল্পনিক যিশুকে সম্মান জানিয়ে। পাদ্রীরা সন্তুষ্ট থাকবেন তাতেই। ঐ নকল খ্রিষ্টকে সম্মান দিতে দিতে প্রতিমাপূজারীটি একসময় বাইবেলের খ্রিষ্টকে সম্মান জানিয়ে খ্রিষ্টান হবেন, এই প্রত্যাশায়।

শাস্ত্রজ্ঞানহীন শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্ম দের 'অরূপের থাক' বলতেন। অর্থাৎ, তিনি বিশ্বাস করতেন অরূপের উপাসনা করা যায়। যে ব্রহ্ম অরূপ সেই ব্রহ্ম অচিন্ত্যও। কিন্তু, শুধু মাত্র ওঁ উচ্চারণ ছাড়া অচিন্ত্য ব্রহ্মে র উপাসনা করা সম্ভব নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত। তিনি নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়ও বটে। ১৮৮৫-১৮৮৭ সালে তাঁর লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রথম বই 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' প্রকাশিত হয়। সেটি শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি-প্রধান বই। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যা করেন ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত 'তত্ত্বসার' বইটিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম বিস্তারিত জীবনী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৯০) এর লেখকও রামচন্দ্র দত্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের ৩০০ উক্তি বেছে নিয়ে রামচন্দ্র এরপর একটি ৪৬০ পাতার ব্যাখ্যা লেখেন; সেটির নাম 'তত্ত্বপ্রকাশিকা'(১৮৯১) রামচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের নানাদিক নিয়ে ১৮ টি ভাষণ প্রস্তুত করেন। সেগুলি 'রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী' নামে প্রকাশিত হয়।

রামচন্দ্রের রচনাবলী থেকে প্রতীয়মান যে শ্রীরামকৃষ্ণের উপমাবহুল উপদেশ ও ছোট ছোট গল্পই মানুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতো। সেটাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অভিজ্ঞান। এই নিরিখে তিনি অন্যসব গুরু থেকে আলাদা।

শ্রীম তাঁর কথামৃতের প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে। সুতরাং কথামৃত তুলনামূলকভাবে অনেক নবীন। এই রামচন্দ্র দত্তের প্রভাবেই নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবকে দেখতে যান। নরেন্দ্র ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, নরেন্দ্রনাথের ততোটা যাবার ইচ্ছা ছিল না, রামচন্দ্র তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে, এমনকি রসগোল্লা খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেখানে যেতে রাজী করান। রামচন্দ্র ছিলেন নরেন্দ্রনাথের চেয়ে কয়েক বছরের বড় এবং মাতৃ সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথের দাদু হতেন। কিন্তু, রামচন্দ্র দত্তের বইতে নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখই পাওয়া যায় না।

সারদানন্দ যখন লীলাপ্রসঙ্গ লিখতে শুরু করেন তখন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সংক্রান্ত বহু বই লেখা হয়ে গেছে।

যাই হোক, সারদানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'তে নরেন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাতের বিবরণ আছে। সারদানন্দের লেখনীতে নরেন্দ্র বলছেন,

"সহসা আমার হাত ধরিয়া পূর্ব পরিচিতের ন্যায় আমাকে পরম স্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন পরে আসিতে হয় ? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই ? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝলসিয়া যাইবার উপক্রম হইরাছে;প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পারিয়া আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে!' ইত্যাদি কতো কথা বলেন ও রোদন করেন। পরক্ষণেই আবার আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দেবতার মত আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 'জানি আমি প্রভু তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ,জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ' ইত্যাদি।

এই গল্প এখন একটু নুন দিয়ে খাওয়া যাক। স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন বয়সের বহু ছবি আমাদের দেখা আছে। অতি সুপুরুষ চেহারা। বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ। আর শ্রীরামকৃষ্ণ

তখন প্রৌঢ়। তাঁকে ধর্মশিক্ষক বলা যেতে পারে। একজন শিক্ষক এরকম এক তরতাজা সুপুরুষ যুবককে দেখে স্বভাবতই খুব খুশী হন; শ্রীরামকৃষ্ণও তাই হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এমন একজন যুবককেই তিনি বহুদিন ধরে খুঁজছেন। সেইজন্যই তাঁর নরেন্দ্রকে দেখে উৎসাহ। নরেন্দ্র যদিও কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে গিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর পূর্ব দিকের ঝাঁপঘেরা বারান্দায় নরেন্দ্রকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাখন, মিছরি ও সন্দেশ খাইয়েছিলেন।

'পরে হাত ধরিয়া বলিলেন, 'বল তুমি শীঘ্র এখানে আমার নিকট একাকী আসিবে?'

'তাঁহার এইরূপ একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা 'আসিব' বলিলাম এবং তাঁহার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক সঙ্গীদিগের নিকট উপবিষ্ট হইলাম' ।

প্রথম দিনের সাক্ষাতের পর নরেন্দ্রের মনে হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ আধপাগল কিন্তু ঈশ্বরমুখী মানুষ। এর মাসখানেক পরে তিনি আবার দক্ষিণেশ্বরে যান, তবে একাকী। অনেকটা পথ হেটে অবসন্ন শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে উপস্থিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে একাই ছিলেন। নরেন্দ্রকে দেখে তিনি স্বাভাবিকভাবেই আনন্দিত হন।

নরেন্দ্র বলেছেন : 'আমাকে দেখিবামাত্র সাহ্লাদে নিকটে ডাকিয়া উহারই এক প্রান্তে বসাইলেন। বসিবার পরই কিন্তু দেখিলাম তিনি একপ্রকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন এবং অস্পষ্ট স্বরে আপনা আপনি কি বলিতে বলিতে স্থির দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে সরিয়া আসিতেছেন। ভাবিলাম পাগল বুঝি পূর্বদিনের ন্যায় আবার কোনরূপ পাগলামি করিবে। ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণ পদ আমার অঙ্গে স্থাপন করিলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব উপলব্ধি হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমস্ত বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে! দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল—আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ আমার সম্মুখে—অতি নিকটে। সামলাইতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ওগো তুমি আমার একি করলে, আমার বাপ মা যে আছেন! অদ্ভুত পাগল আমার ঐ কথা শুনিয়া খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং হস্তদ্বারা আমার বুক স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'তবে এখন থাক, একেবারে কাজ নাই, কাল হইবে! আশ্চর্যের বিষয়, তিনি ঐরূপ স্পর্শ করিয়া ঐকথা বলিবামাত্র আমার সেই অপূর্ব প্রত্যক্ষ এককালে অপনীত হইল; প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং ঘরের ভিতরের ও বাহিরের পদার্থসকলকে পূর্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিতে পাইলাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রমাণের জন্যই এই ঘটনার বর্ণনা। এখন ধরা যাক, এই ঘটনাটি সত্য। তাহলে নরেন্দ্রের প্রতিক্রিয়া কি হওয়া সঙ্গত?

তিনি ভাবতে পারতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যাদু জানেন। অথবা, তিনি ভাবতে পারতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ।

প্রথম ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে এড়িয়ে যেতেন। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের চিরসঙ্গী হয়ে থাকতেন সব কিছু ফেলে।

দুটির কোনটাই হয় নি। শুধু নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অনুরাগী ভক্ত হয়েই ছিলেন। কারণ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হলেও নরেন্দ্রের ধর্মানুরাগ ব্রাহ্ম সমাজকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর মনে একটা প্রশ্ন ছিল বরাবরই। অথচ, দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী অনুসারে ব্রাহ্ম মতে তিন বছর দেবেন্দ্রনাথের বাছাই করা কিছু শ্লোক প্রতিদিন প্রভাতে একমনে উচ্চারণ করলেই ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব।

রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় কথামৃত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রের কথাবার্তা হয় ১৮৮২ তে পাঁচবার, ১৮৮৩ তে দু-বার, ১৮৮৪ তে চারবার, ১৮৮৫ এ নয়বার এবং ১৮৮৬ তে তেরোবার। আর, উপরের কথাবার্তাগুলি সবসময় দক্ষিণেশ্বরে নয়, কলকাতার ভক্তদের বাড়িতেও নরেন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাত হতো। এর ব্যাখ্যা, নরেন্দ্র ঐ সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা গ্রস্ত হয়ে যান নি। তিনি একজন ব্রাহ্ম যুবকের মতো স্বাভাবিক গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতেন।

এমনকি ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ই জুলাই রথযাত্রার দিন বলরাম বসুর বাড়িতে নরেন্দ্র ও সমবেত ভক্তদের সঙ্গে দুপুরে প্রসাদ খান। আহারের পরে দুপুর একটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নরেন্দ্রকে গান গাইতে অনুরোধ করেন, তখন নরেন্দ্র বলেন, ঘরে যাই, অনেক কাজ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে বিরক্ত হয়ে বললেন, তা বাছা, আমাদের কথা শুনবে কেন? যার আছে কানে সোণা, তার কথা আনা আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা, তার কথা কেউ শোনে না। তুমি গুহদের বাগানে যেতে পারো। প্রায় শুনি, আজ কোথায়, না গুহদের বাগানে! — এ কথা বলতাম না, কিন্তু তুই কেঁড়েলি করলি—

নরেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'যন্ত্র নেই, শুধু গান—'

শেষ পর্যন্তনরেন্দ্র গান করেছিলেন। প্রথমে দুটি গান, পরে রথ টানার পর আরও চারটি গান।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়াও নরেন্দ্রর অন্যরকম আকর্ষণও ছিল।

আর ১৮৮৩ তে মাত্র দুবার দেখা হওয়ার কারণ, বিবেকানন্দ ঐ বছর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের 'নববৃন্দাবন' নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক যোগীর ভুমিকায় অভিনয় করেছিলেন;কেশবচন্দ্র অভিনয় করেছিলেন পওহারী বাবার ভূমিকায়।

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত আকস্মিকভাবে হৃদরোগে পরলোক গমন করেন। ঐ সময় নরেন্দ্রনাথ বাড়ি ছিলেন না। বরাহনগরে সাতকড়ি মিত্র ও দাশরথি সান্যালের সঙ্গে গল্পগুজব করছিলেন।

বিশ্বনাথ যথেষ্ট ঋণ রেখে মারা গিয়েছিলেন। ফলে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরিবার কষ্টে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে পরিজনদের রুজু করা মামলাতেও পড়লো পরিবারটি। ঐ পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র একটি চাকরী পাবার জন্য প্রচুর ঘোরাফরা করেন বিভিন্ন লোকের কাছে। চাকরী না হওয়াতে তিনি আইন পরীক্ষা দিয়ে পিতার মতো অ্যাটর্নী হওয়ার চেষ্টা করেন। তা শেষ পর্যন্ত অবশ্য হয়ে ওঠেনি।

বলরাম বসুর বাড়ীতে উপরোক্ত কথামৃতে দেখা যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের অহংবোধে আঘাত লাগায় তিনি নরেন্দ্রকে 'বেঁড়েল' বলছেন। ঐ শব্দটি উনিশ শতকে ব্যবহৃত হতো। অর্থ, যে অল্পবয়সী বেশী বয়সীদের মতো কথা বলে। আধুনিক ভাষায়, যে পাকামো করে।

সুতরাং, নরেন্দ্র কোনও দিনই শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে গ্রস্ত হয়ে যান নি—তাঁকে গায়ে পা দিয়ে 'জগত সংসার ভুলিয়ে দেবার' পরেও। সুতরাং কোনটা গল্প, কোনটা ঘটনা তা রামকৃষ্ণ সাহিত্য পড়ে বলা সম্ভব নয়।

বস্তুত নরেন্দ্রের কয়েকটি বিয়ের সম্বন্ধও হয়। এমনকি বলরাম বসুর মেয়ের সঙ্গেও নরেন্দ্রের বিয়ের কথা উঠেছিল। চাকরী না জোটায় ও আইন পরীক্ষায় বসতে না পারার দরুণ বিয়ে করা নরেন্দ্রের শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।

আগেই বলেছি, ব্রাহ্ম দের শ্রীরামকৃষ্ণ 'অরূপের থাক' বলতেন। নরেন্দ্র 'অরূপের থাকের' মানুষ ছিলেন। সেই রকমই ছিলেন ভবনাথ। কিছু ভক্তকে 'ঈশ্বরকোটি' বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই কোটি অর্থ লক্ষ-অযুত নিযুত কোটি নয়—শ্রেণী। ভবনাথকেও শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মত্রে 'ঈশ্বরকোটি' বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ভবনাথ বিয়ে করবে না। ভগবানকে পাবার জন্য তপস্যা করবে। পরে দেখা যায় ভবনাথ বিয়ে করেছিল। তখন আর তাঁকে ঈশ্বরকোটি বলতেন না। যাদের যাদের শ্রীরামকৃষ্ণ 'ঈশ্বরকোটি' বলে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা হলেন, নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন, বাবুরাম, নিরঞ্জন, পূর্ণ ও ভবনাথ। কিন্তু এই তালিকা থেকে 'অরূপের থাক' ভবনাথ যেমন বাদ পড়েছে, তেমনই বাদ পড়েছে পূর্ণ, বিয়ে করার কারণে। রাখাল ও যোগীন বিয়ে করলেও পরে সন্ন্যাসী হন। নরেন্দ্র, বাবুরাম ও নিরঞ্জন বিয়ে করেন নি। ঈশ্বরকেটিদের মধ্যে যে পাঁচজন সন্ন্যাসী হন, তাঁরা সবাই শ্রীরামকৃষ্ণের হাত থেকে গেরুয়া বস্ত্র পান। গিরিশচন্দ্র সাধু হবেন এমনটা কেউ আশা করেন নি। কিন্তু তাঁর গেরুয়া বস্ত্র পাবার অর্থ তাঁকে সম্মান দেওয়া। উপরের পাঁচজন ছাড়াও যাঁরা গেরুয়া পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন, শশী, শরৎ, কালী, লাটু, তারক ও বুড়ো গোপাল। এই এগারো জনই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ সময়ের বারো জন সেবকের মধ্যে দেখা যায়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে সারদাপ্রসন্ন, হরিনাথ, গঙ্গা ধর, তুলসী, সুবোধ এবং হরিপ্রসন্ন শ্যামপুকুরবাটী বা কাশীপুর বাগানবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেন নি।

কাশীপুর বাগানবাড়ীতে তরুণ সেবকেরা

কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথ অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করার জন্য বাস করতে থাকেন। শ্যামপুকুর বাটীতেও নরেন্দ্র উপস্থিত থাকতেন। অভেদানন্দের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় কাশীপুরে নরেন্দ্রের প্রধান কাজ ছিল নিজের আইন পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করা। শেষে রামকৃষ্ণ তাঁকে ভর্ৎসনা করায় তিনি ধীরে ধীরে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৮৮৬ র জুলাইয়ের শেষদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল ফিস ফিস করে কথা বলতে পারতেন। শেষ কিছুদিন তাঁর ভাবী সন্ন্যাসী শিষ্যদের অনেক উপদেশ দেন। রবিবার ১৫ই আগষ্ট তাঁর শরীরটা বেশ খারাপ যাচ্ছিল। রাত একটা নাগাদ তাঁর দেহান্ত হয়। তিনবার কালীর নাম করে তিনি শুয়ে পড়েন;আর সাড়া পাওয়া যায় নি। ভক্তেরা ওঁকার উচ্চারণ করতে থাকেন। কারণ, তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে ঠাকুরের দেহান্ত হয়ে গেছে। পরের দিন সকালেও অনেক চেষ্টা করা হয়। সকাল দশটার সময় মহেন্দ্র লাল সরকার এসে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

১৬ ই আগস্ট বিকালে কাশীপুর শ্মশানঘাটে তাঁকে দাহ করা হয়। ভস্মাবশেষ একটি কলসী ভরে এনে রাখা হয় তাঁরই ঘরে।

বরাহনগর মঠ

কাশীপুরের বাড়িটি আগষ্টের শেষ পর্যন্ত ভাড়া রাখা হয়েছিল। কাশীপুরের ঐ বাগানবাড়িতে লাটু, তারক ও বুড়োগোপাল থেকে গিয়েছিলেন। বাকীরা সব চলে গিয়েছিলেন যে যার বাড়ীতে;নরেন্দ্র বাড়ি ফিরে আইন পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করতে থাকেন। পরে তারক কাশীপুর থেকে চলে যান বারানসীতে আর লাটু যান বৃন্দাবনে। অভেদানন্দও বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। কয়েক মাস পরে ভবনাথ বরাহনগরের পরামাণিক ঘাট রোডে একটি পোড়ো বাড়ি আবিষ্কার করেন। বাড়িটি টাকীর জমিদারদের। সুরেশ বাবু (সুরেন্দ্রনাথ মিত্র) অর্থ সাহায্য করতে এগিয়ে এলে ঐ বাড়িটি এগারো টাকায় ভাড়া নেওয়া হয়। বুড়ো গোপাল এসে ওঠেন ঐ বাড়িতে। বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে শুনে অভেদানন্দ বৃন্দাবন থেকে চলে আসেন। চলে আসেন লাটুও। শুধু নরেন্দ্র নয়, নরেন্দ্র, শরৎ ও শশীও ঐ সময় নিজেদের বাড়িতেই থাকতেন। নরেন্দ্র ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে আবার আইনের বই পড়তেন। শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রকে বরাহনগরের মঠে যোগদান করতে হলো। তিনি একাই যোগদান করলেন না। বাকী সবাইকে টেনে আনলেন মঠে। তবে আত্মীয় স্বজনরা যখন ভুবনেশ্বরী ও তাঁর ছেলে মেয়েদের নামে মামলা ঠোকেন, তখন আবার নরেন্দ্রকে কয়েকদিনের জন্য বাড়িতেথাকতে হয়েছিল।

১৮৮৬ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বাবুরামের মা এই নবীন সন্ন্যাসীদের তাঁর আঁটপুরের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নরেন্দ্র, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর ও সারদাপ্রসন্ন একসঙ্গে ট্রেনযোগে তারকেশ্বর, তারপর সেখান থেকে হেঁটে হরিপাল হয়ে আঁটপুরে

পৌছন। ২৪ শে ডিসেম্বর রাতে তাঁরা একটি আগুনের ধারে বসে সন্ন্যাস জীবনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারীর কোনও একটি দিনে রামকৃষ্ণ শিষ্যরা একটি বিরজা হোম অনুষ্ঠিত করে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নবীন সন্ন্যাসীরা নতুন করে একটি একটি নামও গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রর নাম হয় বিবিদিষানন্দ, রাখাল চন্দ্র ঘোষ- ব্রহ্মানন্দ, বাবুরাম ঘোষ-প্রেমানন্দ, শশীভূষণ চক্রবর্তী-রামকৃষ্ণানন্দ, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী-সারদানন্দ, কালীপ্রসাদ চন্দ্র-অভেদানন্দ, সারদাপ্রসন্ন মিত্র- ত্রিগুণাতীতানন্দ।

এর কিছুদিন পরে তারকনাথ ঘোষাল ও গোপাল ঘোষ (বুড়ো গোপাল) একটি হোমের মাধ্যমে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁদের নাম হয় যথাক্রমে শিবানন্দ ও অদ্বৈতানন্দ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর লাটুর নাম হয় অদ্ভুতানন্দ। এই বুড়ো গোপাল ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের থেকেও দু বছরের বড়। যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বৃন্দাবন থেকে ফিরে সন্ন্যাসী হন। তাঁর নাম হয় যোগানন্দ।

বিরজা হোমের মাধ্যমে সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্যে নিজের শ্রাদ্ধ করার ব্যাপার আছে। নিয়ম, সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী পুর্ব জীবন ভুলে যাবেন। অস্বীকার করবেন পূর্বতন গৃহস্থ জীবনের সবকিছুকে।

উপরোক্ত সন্ন্যাসীদের সবাই কাশীপুরে থেকে অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন। পরে যাদের শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী শিষ্য বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে সারদাপ্রসন্ন, হরিনাথ, গঙ্গাধর, তুলসী, সুবোধ ও হরিপ্রসন্ন অসুস্থ গুরুকে শ্যামপুকুরে বা কাশীপুরে সেবা করেন নি।

সারদা প্রসন্ন পরবর্তীকালে ত্রিগুণাতীতানন্দ নাম গ্রহণ করেন। হরিনাথ পরবর্তীকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে পরিচিত হন। গঙ্গাধর হন অখণ্ডানন্দ, সুবোধ হন সুবোধানন্দ। হরিপ্রসন্ন হন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

আগেই আমরা জেনেছি, নরেন্দ্র নাথ ব্রাহ্ম ছিলেন। সেই রকমই ব্রাহ্ম ছিলেন ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, শিবানন্দ ও রামকৃষ্ণানন্দ। এবং এঁরা সবাই ছিলেন কেশব সেনের অনুগামী। এটা তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ, কেশবচন্দ্র প্রথম থেকেই বিশ্বাস করতেন সব ধর্মের মধ্যেই কিছু সত্য আছে। যদিও 'সত্যটা' কি তা তিনি কখনও পরিষ্কার করে বলেন নি।

বরাহনগর মঠের জন্য সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (সুরেশবাবু) প্রথমে তিরিশ টাকা করে দিতেন। পরে সেটা বাড়িয়ে একশো করেন। তবে এ টাকা এতগুলি যুবকের আহারের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে নবীন সন্ন্যাসীরা প্রায়ই ভিক্ষায় বেরুতেন। ভিক্ষার চাল সিদ্ধ করে নুন ও লঙ্কা দিয়ে খেতেন। যাঁরা ভিক্ষায় বেরুতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অভেদানন্দ, শিবানন্দ, লাটু ও অদ্বৈতানন্দ।

বরাহনগর মঠের এই সময়ের বিবরণ দিতে গিয়ে প্রমথনাথ বসু লিখেছেন : "বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রকৃত একনিষ্ঠ তপশ্চর্য্যার সুযোগ পাইয়াছিলেন।"

এই বিবরণের মধ্যে গানটাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। আমরা তো জানি, নরেন্দ্র একবার গান গাইতে শুরু করলে নিরবচ্ছিন্নভাবে গান গেয়ে চলতে পারতেন। তবে তপস্যা বলতে কালী প্রসাদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ) অল্পবয়স থেকেই শাস্ত্রজ্ঞ ও ধার্মিক ছিলেন। তিনি যোগচর্চাও করেছিলেন। বরাহনগর মঠে যোগ-ধ্যান ইত্যাদিতে নেতৃত্ব ও পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই ছিল। প্রমথনাথ মিত্র বর্ণনা করেছেন যে কালীপ্রসাদ অধিকাংশ সময় নিজেকে একটি ঘরে আবদ্ধরেখে নানাবিধ শাস্ত্র আলোচনা করতেন। নব ব্রহ্ম চারীদের আত্মীয়-স্বজন ও শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তরা প্রায়ই বরাহনগর মঠে উপস্থিত হতেন।

তবে তপশ্চর্যার বিবরণের মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্ম মুহূর্তে নরেন্দ্রের 'জাগো জাগো সবে অমৃতের অধিকারী' গানের মধ্য দিয়ে সবাই শয্যা ত্যাগ করতেন। তারপর ধ্যান করা, দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ভজন ও সৎপ্রসঙ্গে আলোচনা। তার পর 'ইতিহাসের প্রসঙ্গ আলোচনা'। কখনও বা 'জোয়ান অফ আর্ক' বা ঝাঁসীর রাণীর কথা আলোচনা হতো। কখনও বা বিবিদিষানন্দ উনিশ শতকের ফ্যাসীবাদী লেখক টমাস কার্লাইলের 'ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস' থেকে সুদীর্ঘ অংশসমূহ আবৃত্তি করতেন। এবং সবাই সমস্বরে দুলতে দুলতে 'সাধারণতন্ত্রের জয় হোক, সাধারণতন্ত্রের জয় হোক' বলে সমস্বরে জয়ধ্বনি করতেন। অর্থাৎ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের গদ এই নবীন হিন্দু সন্ন্যাসীদলের 'তপস্যার' মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্তমান ছিল। এই যুবক সন্ন্যাসীদলের খাওয়ানোর ভার নিজের হাতে নিয়েছিলেন শশী বা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। তিনি রান্না করতেন, সবাইকে ডেকে ডুকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। ঠাকুরের পূজার ভোগ-আরতি ও পূজার ভারও নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন শশী মহারাজ।

'সাধনার' মধ্যে মঠের বড় একটি ঘরে ধর্ম ও সঙ্গীতের সঙ্গে দর্শন, ইতিহাস, জড় বিজ্ঞান। সমাজ বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা। গীতা-উপনিষদ যেমন পড়া হতো তেমনই পড়া হতো কান্ট, মিল, স্পেন্সার ও হেগেল। এমনকি নাস্তিক ও জড়বাদীদের মতামতও পড়া হতো। এ বিষয়ে মূল আলোচক হতেন স্বামী বিবিদিষানন্দ। ষড় দর্শন নিয়েও আলোচনা হতো।

এদিকে মঠের বাইরে শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণ প্রসন্ন সেন ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্যোগে যে হিন্দু জাগরণ শুরু হয়েছিল, সে বিষয়ে বরাহনগর মঠের 'ফরাসী বিপ্লবের' সন্ন্যাসীরা অবগত ছিলেন না। দেশ জুড়ে ব্রাহ্ম রা ব্যাপকভাবে হিন্দুধর্মে ফিরে আসছিল। হিন্দুদের খ্রিষ্টান করার গোপন চক্রান্ত বলে প্রতিভাত হচ্ছিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ। প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল নতুন নতুন হরিসভা ও সনাতন ধর্ম প্রচার সভা। এর ফলে ১৯০১ এর জনগণনায় ব্রাহ্মদের সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় কিঞ্চিৎ অধিক পাঁচ হাজারে।

আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "বাঙ্গলায় নতুন ও আগ্রাসী হিন্দুধর্মের প্রথম দার্শনিক উদ্গাতা হলেনপণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথমজন 'বিজ্ঞানের' সাহায্য গ্রহণ করলেন এই বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য যে হিন্দু ধর্মীয় আচারের ফলে আকাশ ও

মাটি থেকে দেহে বিদ্যুত আহরণ হয়। এটা নিঃসন্দেহে অপবিজ্ঞান। কিন্তু তাঁর শ্রোতারা এর থেকে বেশী বিজ্ঞান জানতেন না। নিজের সন্তুষ্টি ও তাঁর অর্দ্ধশিক্ষিত শ্রোতাদের উল্লাসের মধ্যে তিনি প্রমাণ করতেন যে মানুষের দেহমনের সম্পূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র ভারতেই সম্ভব। কারণ, এখানে ঋতুর পরিবর্ত্তন নিয়মিত;জলবায়ুও প্রশম—না খুব গরম না খুব শীত। জমি উর্ব্বর, জলসম্পদও পর্যাপ্ত। গোটা বিশ্বজুড়ে বিদ্যুতের প্রবাহ হয় নীচে থেকে উপরে এবং উপর থেকে নীচে। রক্ষণশীল ব্রাহ্ম ণের শিখার মধ্য দিয়ে বিদ্যুত প্রবাহের ফলে তাঁদের দেহের মধ্য দিয়ে বিদ্যুত প্রবাহিত হয়। তাঁর শ্রোতারা কি দেখেন নি, গবেষণাগার পরীক্ষায় একটা ঘোড়ার লোমের বুরুষের সাহায্যে বিদ্যুত বহে নিয়ে যাওয়া হয়? সুতরাং অন্য সমস্ত ধর্ম হিন্দুধর্মের তুলনায় অবৈজ্ঞানিক, অসম্পূর্ণ, ত্রূটিপূর্ণ ও ক্ষতিকর।

"এই সমস্ত তত্ত্ব আজকের দিনে হাসির উদ্রেক করবে। কিন্তু তখন এই কথার ফল হয়েছিল বিস্ময়কর। পণ্ডিত সুবক্তা ছিলেন না;সুমিষ্ট ছিল না তাঁর গলার স্বরও। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল নতুন, তখনও জনপ্রিয় নয়। কিন্তু শত শত কেরাণী, স্কুলশিক্ষক, কম্পোজিটার, এবং দোকানের কর্মচারীরাও সারাদিনের পরিশ্রমের পর কর্ম্মস্থল থেকে ফেরার পথে বক্তৃতাকক্ষে উপস্থিত হতেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে শশধরের বক্তৃতা শুনতেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো। শীঘ্রই এই ধর্ম আন্দোলন বাঙ্গলার রাজধানী থেকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়লো। একটি করে নতুন হিন্দু সংস্থা গড়ে উঠলো সর্বত্র। পরিব্রাজক ধর্ম প্রচারকরা কাজটি সমাপন করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৪৯-১৯০২) তাঁর আবেগপূর্ণ বাগ্মিতায় সবকিছু প্রতিবন্ধকতা জয় করলেন। পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তাঁর সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য, চিন্তার অভিনবত্ব ও বাগ্মীতায় গভীর ছাপ ফেললেন শ্রোতার হৃদয়ে।

একই ছাপ ফেললেন বঙ্কিমচন্দ্র, ধনী ও কিছু উচ্চশিক্ষিত হিন্দুর মনে কৃষ্ণচরিত রচনা করে। এটি রেভারেন্ড হেষ্টি ও কে এস ম্যাকডোনাল্ডের বিতর্কিত খ্রিষ্টীয় প্রবন্ধাদির উত্তর বিশেষ।"

বরাহনগর মঠের অন্ধকারের মধ্যে বসে এই সব নবীন স্বয়ং সন্ন্যাসীদের মাথার মধ্যে খেলা করছিল কেশবচন্দ্রের প্রেত আর কৃষ্ণকুমার মিত্রের ফরাসী বিপ্লবের চোঁয়াঢেকুর।

প্রমথনাথ মিত্র লিখেছেন, সব আলোচনাই শেষ হতো শ্রীরামকৃষ্ণে এসে। নরেন্দ্রনাথ দেখাতেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বর্তমান হিন্দুজাতির উপর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের প্রভাব কতটা এবং সে প্রভাবের মূল্য কতটা। তিনি দেখাতেন যে, ছিন্নমূল হিন্দুধর্ম বাত্যাতাড়িত সমুদ্রবক্ষে কাণ্ডারীবিহীন জীর্ণতরীর মতো ক্রমাগত ভেসে চলছিল; পরমহংসদেবের চরণ স্পর্শে সেই এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে এবং গন্তব্যের দিশা খুঁজে পেয়েছে।

ভুল, দারুণ ভুল! পরমহংস সব ধর্মকে এক থাকে বসিয়ে পবিত্র হিন্দুধর্মকে দূষিত করেছেন। সেই দূষিত ধর্মই এখন এই দেশ থেকে হিন্দুদের বিদায় জানাচ্ছে। বস্তুত বরাহনগর মঠের বাইরে বিশাল সংখ্যক ব্রাহ্ম রাই শ্রীরামকৃষ্ণের গুণগ্রাহী ছিল। আর ছিল কিছু সংখ্যক গৃহী হিন্দু। হিন্দুধর্মকে তখন বাস্তব পথ দেখাচ্ছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুগামী চন্দ্রনাথ

বসু, অক্ষয়কুমার সরকার প্রভৃতি বুধ মণ্ডলী, যোগেন্দ্র নাথ বসু ও 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা। অন্যদিকে কৃষ্ণ প্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণি।

প্রমথনাথ মিত্র আরও লিখেছেন, হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সভ্যতার মূল কোথায় সে সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ বেশ একটি উদার ধারণা জন্মিয়ে দিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শ্রীকৃষ্ণ থেকে সম্রাট আকবর পর্যন্ত প্রত্যেক ভারত সন্তান কেমন করে এ দেশে জাতি গঠনের চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে কিভাবে জাতীয় জীবন গঠিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে তা তিনি আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতেন।

ভুল! এ ব্যাপারটা নরেন্দ্রনাথ নিজেই বুঝতেন না। আকবর ছিলেন নিপুণ সাম্রাজ্যবাদী। তিনি একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তিনি একজন দখলকারী মুসলমানই ছিলেন। হিন্দুতীর্থ প্রয়াগের নাম পাল্টে ইসলামের জয় ঘোষণা করার জন্য তিনি নাম দিয়েছিলেন এলাহাবাদ। হিমুর মুণ্ডু কেটে তিনি গাজী হয়েছিলেন। ধর্মের ব্যাপারে তাঁর যেটুকু উদারতা তা একান্তই রাজনৈতিক। এর মধ্যে 'জাতি গঠনের' কোনও ব্যাপার নেই।

কিন্তু 'জাতিগঠন' ব্যাপারটা তখনকার সাম্প্রতিক চিন্তা। বছর তিরিশ আগে ঘটে যাওয়া সিপাহী বিদ্রোহে সমবেত সিপাহীরা কোনও জাতীয় নেতা উৎপন্ন করতে পারেন নি। বৃদ্ধ, অথর্ব পেনসনভোগী মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে তারা তখতে বসাবার চেষ্টা করে আবার মুগল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল। কোনও জাতীয় প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি হয় নি।

এর পরে মিত্র মহাশয় লিখেছেন, ভারতীয় সভ্যতার ঐক্য সম্পর্কে নরেন্দ্রের ধারণা এমন দৃঢ় ছিল যে, অনেক সময় মুসলমান জাতীয় কোনও লোককে সম্মুখে দেখবামাত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন করতেন। তাঁর মনে হতো, সে ব্যক্তিও ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার একটি অঙ্গ বিশেষ।

কাছাখোলা কালিদাসের একশেষ! যে ধর্ম ভারতীয় সভ্যতার সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে, মন্দিরের পর মন্দির ভেঙ্গেছে এবং ভারতীয় সভ্যতা ধ্বংস করে ইসলামের জয় ঘোষণা যাদের অভীষ্ট লক্ষ্য, সেই ধর্মের অনুসারীকেই ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গ হিসাবে গণ্য করছেন নরেন্দ্রনাথ। 'নববিধান' এর পচা দুর্গন্ধ!

পরে অবশ্য বিবেকানন্দ নিজেকে সংশোধন করে নেবেন।

এর পরে বরাহনগর মঠের সাধুদের কঠোর তপস্যার এক বিবরণ দিয়েছেন প্রমথনাথ মিত্র। গেরুয়া পরা হিন্দুধর্মের সন্ন্যাসীরা জয় ঘোষণা করছেন যিশুখৃষ্টের!

"তাদের কল্পনা সুদূর বেথলেহাম নগর পর্যন্ত প্রসারিত হতো। এবং তাঁরা সাধু শিরোমণি ঈশার জীবনলীলা আদ্যোপান্ত মানস নেত্রে প্রত্যক্ষ করতেন।"

নরেন্দ্রনাথ নাকি কাকে বলেছিলেন, 'যদি আমি খ্রিষ্টের সময় প্যালেস্টাইনে জন্মাতুম, তা হলে শুধু নয়নের জলে নয় হৃদয়ের শোণিতধারায় যিশুর পাদ প্রক্ষালন করতাম।' আজকের বাইবেলে যে যিশুর কথা পাওয়া যায় তা কতটা কল্পনা কতটা বাস্তব তা নির্ণয় করাই সম্ভব নয়।

যিশু কবে জন্মেছিলেন কোথায় জন্মেছিলেন, সেটাই কেউ সঠিক ভাবে জানে না। ম্যাথু ও লুক বেথলেহেম শহরে যিশুর জন্মের কথা বললেও জন ও মার্কের মতে যিশু ন্যাজারেথে জন্মেছিলেন। বেথলেহেম থেকে ন্যাজারেথের দূরত্ব অনেক।

আর জন্মদিন প্রসঙ্গে কেউ বলে এপ্রিলের ১৯ তারিখের কথা, কেউ ১০ই মে'র কথা; আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট বলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৩ অব্দের ১৭ ই নভেম্বরের কথা।

৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে রোমের গীর্জাগুলি ২৫ শে ডিসেম্বর খ্রিষ্টের জন্মদিন পালন করে। ঐ দিনটি রোমে মিথ্রাসিমবাদীরা সূর্যের জন্মদিন পালন করতো। ভারত থেকে মিত্রাবরুণের উপাসনা পারস্য হয়ে ইউরোপে পৌছয়। যাই হোক নরেন্দ্রনাথ যখন যিশুকে নিয়ে 'কঠিন তপস্যায়' মাতোয়ারা তখন কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে বহু পাদ্রী ও অন্যান্য খ্রিষ্টানরা কি করে গোটা প্রতিমাপূজক হিন্দু জাতটিকে খ্রিষ্টানে পরিবর্তিত করা যায় সেই পরিকল্পনায় বিভোর ছিল। ব্রিটিশ সরকার সেই কবে থেকে ভারতবাসীদের টাকায় ভারতবাসীদের খ্রিষ্টান করার জন্য পাদ্রী পুষতেন।

বড়দিনের সময় আমাদের জাতধর্ম নষ্টকারী গেরুয়া বসন পরা 'হিন্দু' সাধুরা একটা ধুনি জ্বালিয়ে তার পাশে আধশোয়া অবস্থায় যিশুর জন্মকথা ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করতেন।

কেশবসেনী ব্রহ্ম জ্ঞানীদের একবার গুডফ্রাইডে করার বাতিক চেপেছিল। প্রমথনাথ বসু বর্ণনা দিয়েছেন, সেদিন সারাদিন উপবাস-উপাসনা করে গোটা কয়েক আঙ্গুর মেশানো জল সবাই এক চুমুক করে পান করেছিলেন। হঠাৎ দরজার কড়া নাড়া : কে আছ, খ্রিষ্টের দোহাই, দরজা খোল—

দেখা গেল, অতিথি একজন সাহেব। সবাই আনন্দে আত্মহারা; খ্রিষ্টানের মুখ থেকে ঐ দিনের মাহাত্ম্য জানবেন। কিন্তু সাহেব সালভেশন আর্মির লোক; যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কথা জানেন, কিন্তু গুড ফ্রাইডের ব্যাপারে কিছু জানেন না। তাঁরা দুটি পর্ব পালন করেন : একটি খ্রিষ্টের জন্মদিন, অন্যটি জেনারেল বুথের জন্মদিন।

আমাদের হিন্দুধর্মের ভবিষ্যৎ ধ্বজা যাঁরা ধারণ করবেন, তাঁরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন এ হেন সংবাদে। শুধালেন, সেকি যেদিন তোমাদের প্রভু ক্রুশবিদ্ধ হলেন সে দিনের বিষয়ে কিছু জান না!

সালভেশন আর্মির লোকেরা গুড ফ্রাইডের কথা যেমন জানতেন না, আমাদের কঠিন তপস্যাকারী সাধুরাও সালভেশন আর্মির কথা জানতেন না। সালভেশন আর্মি ভারতে এসেছে স্রেফ হিন্দুদের বোকা বানিয়ে খ্রিষ্টান করার মানসে।

সালভেশন আর্মি উনিশ শতকের ইংলন্ডের এক প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলন। এই আন্দোলনের সৃষ্টিকর্ত্তা উইলিয়াম বুথ নামক এক পাদ্রী ও তাঁর স্ত্রী। তিনি সেনাবাহিনীর আদলে তাঁর সংস্থা গড়ে তোলেন। তিনি নিজে ছিলেন সেনাপতি : জেনারেল বুথ। বুথ ধর্মান্তর প্রসঙ্গে বলেছিলেন, সেবা হচ্ছে মানুষ ধরার চার আর বড়শি হচ্ছে 'ত্রাণ' যা দিয়ে মানুষ ধরতে হবে।

ইংলন্ড থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে সালভেশন আর্মি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তারমধ্যে প্রতিমাপূজক অধ্যুষিত ভারতবর্ষেও। আমাদের কাছাখোলা কালিদাস হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারীরা তখন যিশু ভজনে মত্ত।

আবার কখনও নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী ভাইদের 'সোসাইটি অফ জেসাস' এর গল্প শোনাতেন। এটি একটি রোমান ক্যাথলিক আন্দোলন—দেশ বিদেশের প্রতিমাপূজকদের ধরে ধরে খ্রিষ্টান করার জন্য। প্রতিষ্ঠাতা ইগনেশিয়াস লয়োলা। আর সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার গোয়ার হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে বের করে জোর করে খ্রিষ্টান করতেন। 'সোসাইটি অফ জেসাস' একদা পরিচিত ছিল গুণ্ডা মিশনারী বলেই। গোয়াতে একটি গীর্জায় ফ্রান্সিস জেভিয়ারের দেহ রাখা আছে। এইসব ক্যাথলিকদের নিয়ে হিন্দু সন্ন্যাসীদের মাতার মতো নিন্দনীয় কাজ আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু এটাই বিবেকানন্দ জীবনীকার গর্বের মনে করেছেন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে বরাহনগরের ঐ পোড়ো বাড়ির মধ্যে নিজেদের ঘরে আগুন লাগানোর জন্য তৈরী হচ্ছেন একদল সন্ন্যাসী।

আবার পাদ্রীরা যখন হিন্দুধর্মকে নস্যাৎ করার জন্য এসে বিতর্ক জুড়েছে,তখন নরেন্দ্রনাথ পাদ্রীদের পরাস্ত করেছেন। করার পরে আবার 'তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় খ্রিষ্টহৃদয়ের অদ্ভুত প্রেমের অপূর্ব ব্যাখ্যা করিতেন।'

বলা বাহুল্য, 'খ্রিষ্টহৃদয়ের অদ্ভুত প্রেম' আমাদের মতো প্রতিমাপূজকদের জন্য নয়। 'নব বিধান' মার্কা ব্রাহ্ম দের তা খেয়াল ছিল না। আমাদের খ্রিষ্টের স্মরণ নেওয়া ছাড়া গতি নেই!

সুতরাং, এ ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে, বরাহনগর মঠের মধ্যে একদল হিন্দুদ্রোহী কালাপাহাড়ের জন্ম হচ্ছিল।

প্রাক আমেরিকা পর্বে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমা

যদিও একজন হিন্দুকে তীর্থ দর্শন করতে হবে—এমন বার্তা হিন্দু ধর্মে নেই; কিন্তু হিন্দুরা হামেশাই তীর্থ দর্শন করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারত জুড়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিস্তৃত হওয়ার ফলে কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ সাধারণ গৃহীর নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। মথুর বাবুর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কাশী, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থ ঘুরে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পরে তাঁর যুবক ভক্তরাও বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীদের তীর্থভ্রমণ মোটামুটি একটি চালু প্রথা। একঘেয়েমী দূর করতে তাঁরা প্রায়শই ঘুরে ঘুরে বেড়ান।

কিছুদিন বরাহনগর মঠে বাস করার পর নবীন সন্ন্যাসীরা একে একে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেন। প্রথমে স্বল্প দূরত্বে ও পরে বেশী দূরত্বে। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের একটি ফটোগ্রাফ সকলের কাছে খুবই পরিচিত। সেটি 'পরিব্রাজক' ভঙ্গীতে তোলা একটি স্টুডিওর ছবি। মুণ্ডিত মস্তক বিবেকানন্দ একটি লম্বা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যে লাঠিটা তাঁর প্রায় নাক অবধি পৌঁছেছে। পিছনে একটি জলাশয়। এ ছবিটি প্রথম ছাপা হয় The Life of Swami

Vivekananda পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রধান ছবি হিসাবে। ছবিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা ভাব চলে আসে। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হিন্দু জাতিকে নতুন দিশা দেখানোর জন্য পায়ে হেঁটে মাইলের পর মাইল ভ্রমণ করেছিলেন।

রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় গবেষণা করে দেখিয়েছেন, ছবিটি পথে তোলা নয়, স্টুডিয়োর মধ্যে সযতনে তোলা। অবশ্য প্রমথনাথ মিত্রের বইতে ছবিটি জয়পুরের এক স্টুডিওতে তোলা বলেই বলা হয়েছে।

রাজাগোপাল বিবেকানন্দের ভ্রমণের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যেসব যায়গায় হাঁটা ছাড়া গতি ছিল না, সেই সব জায়গাতেই তিনি পদব্রজে গিয়েছিলেন। আর, সাধারণভাবে গৃহস্থের বাড়িতেই তিনি উঠতেন।

প্রাক আমেরিকা পর্বে ১৮৮৬ থেকে তিনি প্রথমে স্বল্পদৈর্ঘে ও পরে দূরে দূরে ভ্রমণ করতে থাকেন।

যেমন, ১৮৮৬ র মার্চের শেষে বা এপ্রিলের প্রথমে ট্রেনে চড়ে তিনি গিয়েছিলেন গয়াতে। অতিথি হয়েছিলেন, উমেশবাবু নামক একজনের বাড়িতে। সেখান থেকে বোধ গয়ায়—যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা জানেন, জায়গাটা নিকটেই। এখন টাঙ্গা চড়েই যাওয়া যায়। নরেন্দ্র দত্ত গিয়েছিলেন পদব্রজে ও গরুর গাড়ীতে। উঠেছিলেন সেখানকার ধর্মশালায়। তবে খাওয়াটা ভিক্ষা করেই। ফিরে এসে আবার উঠেছিলেন উমেশ বাবুর বাড়িতে।

ঐ বছরেরই ডিসেম্বরে গিয়েছিলেন আঁটপুরে;উঠেছিলেন বাবুরামের বাড়ী।

পরের বছর ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন দেওঘর ও শিমুলতলায়। দুটি জায়গাতেই বাঙ্গালীদের বাস ছিল প্রচুর। সেখানে আত্মীয়দের বাড়ীতেই উঠেছিলেন।

তাঁর দূরপাল্লার ভ্রমণ শুরু হয় ১৮৮৭খ্রিষ্টাব্দের শেষে বা ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দর প্রথম থেকে। ঐ বছর তিনি ট্রেনে চড়ে যান, বারাণসী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রাতে। তবে আতিথ্য শুধু মিলেছিল বারাণসীতে প্রমদাদাস মিত্রের বাড়িতে। তবে শয়ন ও ভোজন সম্ভবত মেলেনি কোনও গৃহে। ধর্মশালা বা অন্যত্র থেকে ভিক্ষা করে তাঁকে থাকতে হয়েছিল।

১৮৮৬ র আগস্টে সেই ট্রেনে চড়েই যান অযোধ্যায় ও বৃন্দাবনে। অযোধ্যায় আশ্রয় না জুটলেও বৃন্দাবনে বলরাম বসুদের মন্দিরে আশ্রয় জোটে।

পরে সেপ্টেম্বরে হাটরাস। স্টেশনে রেল কর্মচারী শরৎচন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে আলাপ হওয়ায় তাঁরই অতিথি হলেন। পরে ব্রজেন বাবু নামক এক পূর্ব পরিচিতের গৃহে আশ্রয় নিলেন। পরে অক্টোবরে ঐ শরৎচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে গেলেন হৃষিকেশে। রইলেন গঙ্গাতীরের কুটিরে। খাওয়া শরৎবাবুর অর্থে। এ যাত্রায় কিছুটা হাঁটতে হয়েছিল। ম্যালেরিয়াও ধরেছিল তাঁর। ট্রেনে করে ফিরে অসুস্থ অবস্থায় দিদার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন অক্টোবর নভেম্বরে। বিরজা হোম করে সন্ন্যাস নেওয়াটা একটা প্রহসনে দাঁড়াল। এই সময় তাঁর স্বাস্থ্য এমনই শোচনীয় হয়েছিল যে ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

১৮৮৯ এ পরিব্রাজকের যাত্রা শুরু হলো ফেব্রুয়ারী মাসে। হেঁটে গেলেন আঁটপুর কামারপুকুর জয়রামবাটি। আঁটপুরে তো বাবুরামের বাড়ি; কামারপুকুর ও জয়রামবাটীতে অবশ্যই উঠেছিলেন রামকৃষ্ণদেব ও সারদামায়ের বাড়িতে; তবে, কতক্ষণ ছিলেন বা কোথায় অন্ন জুটেছিল, সে খবর নেই। তবে এ সময়ে ও তিনি নানা রকম রোগে ভোগেন। পরে জুন-জুলাই এ গেলেন শিমুলতলায়। উঠলেন আত্মীয়ের বাড়ি। সেখানেও শরীর ভালো যায় নি। প্রমদাদাস মিত্রকে চিঠিতে সেই রকমই জানিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ।

শীত পড়তে ডিসেম্বরের শেষে বেরুলেন নরেন্দ্রনাথ। প্রথমে ট্রেনে দেওঘর; উঠলেন পূর্ণবাবুর বাড়ি। সেখান থেকে আবার ট্রেনে এলাহাবাদ। উঠলেন গোবিন্দ চন্দ্র বসুর বাড়িতে। সেখানে রইলেন ১৮৯০ এর ২১ শে জানুয়ারী অবধি। তারপর ট্রেনে গেলেন গেলেন গাজীপুর। সেখানে আশ্রয়দাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গগন চন্দ্র রায়। খাদ্য অবশ্য সবসময় জোটেনি; মাঝে মাঝে ভিক্ষা করতে হয়েছে। গাজীপুরে তিনি পওয়ারী বাবার কাছে দীক্ষা নিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে রামকৃষ্ণের কথা মনে হতে ঐ দীক্ষা নেওয়া থেকে বিরত হন।

গাজীপুর থেকে বরাহনগর মঠে ফিরে এলেন বিবিদিষানন্দ। তারপর বেরুলেন আবার আগস্টের শুরুতে। সঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ। এবার গন্তব্য ভাগলপুর। ট্রেন থেকে নেমে আশ্রয় নিলেন মন্মথনাথ চৌধুরীর বাড়িতে। ঐ মাসেই ফিরে এলেন দেওঘরে। সেখানে আস্তানা ও আহার দুটিই জুটেছিল। পরে সেপ্টেম্বরে বারানসী, অযোধ্যা ও নৈনিতাল। বারানসীতে তো প্রমদাদাস মিত্রের আশ্রয় ছিলই। অযোধ্যাতে সম্ভবত ধর্মশালাই একমাত্র আশ্রয়। তবে নৈনিতালে আশ্রয় জুটেছিল রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের গৃহে। তবে সেখানে যাওয়ার জন্য কিছুটা হাঁটতে হয়েছিল। নৈনিতাল থেকে হিমালয়ের মধ্যে ঢুকলেন স্বামী বিবিদিষানন্দ। ঐ সেপ্টেম্বরেই হাঁটাপথে পৌঁছলেন আলমোড়া; আশ্রয় দিলেন লালা বদ্রী শাহ। আলমোড়া থেকে হেঁটে কর্ণপ্রয়াগ। কিছুটা ডান্ডিতে চড়তে হয়েছিল। সেখানে আশ্রয় দিলেন সরকারী ডাক্তার।

সেখান থেকে রুদ্রপ্রয়াগ; হেঁটে ও ডান্ডিতে চড়ে। আশ্রয়দাতা বদ্রীদত্ত জোশী। অক্টোবরে শ্রীনগর; আশ্রয়দাতা রঘুনাথ ভট্টাচার্য। কিন্তু ভিক্ষা করেছিলেন দুজন। শ্রীনগর থেকে তেহরি। রইলেন অক্টোবরের দশ তারিখ অবধি। আশ্রয় গঙ্গাতীরের কুটীর। তবে ভিক্ষা করেই আহার জুটেছিল। পাহাড় থেকে নামলেন ঘোড়ার পিঠে, দেহরাদুনে। অক্টোবরের ১৪ থেকে নভেম্বরের ৫ তারিখ পর্যন্ত দেহরাদুনে কাটালেন। আশ্রয়দাতা পণ্ডিত আনন্দ নারায়ণ। সেখান থেকে এলেন হৃষিকেশে, রইলেন নভেম্বরের ৬ তারিখ থেকে ১৪-১৫ পর্যন্ত। বাসস্থান গঙ্গাতীরের কুটীর। এই হৃষিকেশে নরেন্দ্রনাথ প্রবল জ্বরে পড়েছিলেন। এক সাধু মধু ও পিপুলপাতা মেড়ে খাইয়ে কমিয়েছিলেন তাঁর জ্বর। নভেম্বরের শেষের দিকে দুজনে এলেন মীরাটে। প্রথমে উঠলেন ত্রৈলোক্য নাথ ঘোষের বাড়িতে। পরে শেঠজীর বাগানে। শেঠজীর বাগানে থাকাকালে সম্ভবত ভিক্ষাই ছিল গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়। এইখানে অন্যান্য গুরুভ্রাতারাও সমবেত হয়েছিলেন।

মীরাটে শেঠজীর বাগানে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যন্ত ছিলেন বলেই ধারণা। এরপর তাঁরা আসেন দিল্লীতে, ফেব্রুয়ারীর শেষে বা মার্চের প্রথম থেকে দিন দশেক থাকেন দিল্লীতে।

দিল্লী থেকে বিবেকানন্দ গুরুভাইদের সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং একাই আলওয়ারে এসে ডাঃ গুরুচরণ লস্করের বাড়িতে ওঠেন। এপ্রিলের ১০ তারিখ অবধি আলওয়ারেই থাকেন; তবে তখন আশ্রয়দাতা পণ্ডিত শম্ভুনাথ ও দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী। তারপর আলওয়ার থেকে তিনি যান আজমীরে। কোথায় থাকেন তার সংবাদ নেই, তবে আহার ও আশ্রয় দুটিই জুটেছিল। তবে দারুণ গরমের মধ্যে তিনি আজমীরে বেশীদিন থাকলেন না। এপ্রিলের ১৪ থেকে জুলাইয়ের ২৪ পর্যন্ত তিনি আবু পাহাড়ের ঠাণ্ডাতেই কাটালেন। সেখানে তাঁর আশ্রয় হয়েছিল গুহায় ও এক মুসলিম উকিলের বাড়িতে। এই আবু পাহাড়েই তাঁর আলাপ হয় খেতড়ীর রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে। তাঁরই সঙ্গে জয়পুরে এসে থাকলেন ২৫ শে জুলাই থেকে ৩ রা আগস্ট পর্যন্ত। সেখান থেকে ট্রেন ও ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে ক্ষেত্রী। রইলেন অজিত সিংহের প্রাসাদে, ৭ ই আগস্ট থেকে অক্টোবরের সাতাশ তারিখ পর্যন্ত। ক্ষেত্রী থেকে আজমীর; সেখানে রইলেন বিখ্যাত 'সর্দা আইন' খ্যাত হরবিলাস সর্দার বাড়িতে। পরে নভেম্বরে ৬ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত বিখ্যাত বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার আশ্রয়ে।

আজমীর থেকেআমেদাবাদ। নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের গোড়া পর্যন্ত। প্রথমে হয় তো কোনও ধর্মশালায় ছিলেন, পরে আশ্রয় মেলে লালশঙ্কর উমিয়াচাঁদের আলয়ে। ডিসেম্বরে লিমডিতে। প্রথমে আশ্রমে পরে ঠাকুর সাহেব বোয়েমিয়াচাঁদের বাড়িতে। ঐ ডিসেম্বরেই জুনাগড়ে; রাজ্যের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাই এর ভবনে। পরে ডিসেম্বরেই গির্ণার পর্বতে; হরিদাসের ব্যবস্থায় এক গুহায়।

১৮৯২ এর জানুয়ারীতে আবার হরিদাস দেশাইয়ের কাছে, জুনাগড়ে। তারপর ঐ জানুয়ারীতেই ভুজে, রইলেন কচ্ছের দেওয়ানের কাছে। সেখান থেকে এপ্রিলের আগে সম্ভবত গিয়েছিলেন ভেরাবলে। সেখানে থাকার ব্যবস্থা কি ছিল তা জানা যায় না। সেখান থেকে আবার ফিরে এলেন জুনাগড়ে। সেই জুনাগড় থেকেই গিয়েছিলেন, পোরবন্দর, দ্বারকা, মাণ্ডবী। পোরবন্দরে অতিথি সৎকার করেছিলেন শঙ্কর পাণ্ডুরাঙ্গ। দ্বারকায় শঙ্করাচার্য মঠ, আর মাণ্ডবীতে আশ্রয় এক ভাটিয়া শেঠের গৃহে। সেখান থেকে নারায়ণ সরোবর, আশাপুরী, পলিতানা। কোথায় ছিলেন তার সংবাদ নেই। পরে ফিরে আসেন ভুজে। সেখান থেকে এপ্রিলের ছাব্বিশ তারিখের আগে ফিরে আসেন জুনাগড়ে। জুনাগড় থেকে নাদিয়াদ— হরিদাস দেশাইয়ের আত্মীয়ের আতিথ্য। নাদিয়াদ থেকে এপ্রিলের শেষে বরোদা হয়ে বোম্বাই, সেখান থেকে মহাবালেশ্বর। সব জায়গাতেই আতিথ্য জুটেছিল কোন না কোন মানুষের গৃহে। যেমন মহাবালেশ্বরে অতিথি ছিলেন নরোত্তম এম গোকুলদাসের বাড়িতে। মহাবালেশ্বর থেকে পুণায় গেলেন মে মাসের ৪ তারিখে। ঠাকুরসাহেব বোহেমিয়াচাঁদের বাড়িতে রইলেন ২৫ তারিখ পর্যন্ত। তারপর আবার মহাবালেশ্বরে এসে রইলেন জুনের শেষ পর্যন্ত।

জুনের শেষে গেলেন খাণ্ডোয়া ও ইন্দোরে। খাণ্ডোয়াতে অতিথি হরিদাস চ্যাটার্জীর বাড়িতে। তারপর জুলাইয়ের শেষ থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত রইলেন বোম্বাইতে শেঠ রামদাস ছবিদাসের আশ্রয়ে।

বোম্বাই থেকে পুণায়;সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে অক্টোবরের ৪ তারিখ। এবার আশ্রয়দাতা বিখ্যাত দেশনেতা বালগঙ্গাধর তিলক।

পুণা থেকে গমন কোহলাপুর, অক্টোবরের ৫ থেকে ১১। আশ্রয়দাতা শ্রী গোভালকার। কোহলাপুর থেকে বেলগাঁও । সেখানে বাস অক্টোবরের ১২ থেকে ১৭; আশ্রয়দাতা প্রথমে জি এস ভাটে। অক্টোবরের ১৮ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত আশ্রয় পেয়েছিলেন হরিপদ মিত্রের আলয়ে। বেলগাঁও থেকে এরপর মাড়গাঁও, সেখান থেকে ব্যাঙ্গালোর। ব্যাঙ্গালোরে অতিথি সৎকার করেছিলেন পি পালপু।

ব্যাঙ্গালোর থেকে মহিসুর শহর; নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের শুরু অবধি অতিথি ছিলেন কে শেষাদ্রী আয়ারের গৃহে। মহীসুর থেকে ট্রেনপথে ও গরুর গাড়ীতে ত্রিবান্দম; সেখানে রইলেন কে সুন্দরামা আয়ারের গৃহে। সেখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে কন্যাকুমারী; সেখানে ডিসেম্বরের ২৪-২৫ তারিখে রইলেন একদা সহপাঠী, তৎকালে মাদ্রাজের ডেপুটি অ্যাকাউন্ট জেনারেল মন্মথ নাথ ভট্টাচার্যের আস্তানায়। কন্যাকুমারী থেকে রামনাডে পৌঁছলেন ডিসেম্বরের শেষে। সেখানে আশ্রয় মিললো রাজা ভাস্কর সেতুপতির গৃহে। রামনাডের রাজা তাঁকে চিকাগোর মেলায় পাঠাতে উৎসুক। রামনাড থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে ১৮৯৩ র জানুয়ারীর শুরুতে রামেশ্বরম। সেখানে আশ্রয় জুটলেও অন্ন ভিক্ষা করতে হয়েছিল। রামেশ্বরম থেকে ঘোড়ার গাড়ী চড়েই ৬ ই জানুয়ারী মাদুরাই। এখানে আশ্রয় দিলেন পূর্বোক্ত মন্মথ নাথ ভট্টাচার্য। এরপর থেকে মন্মথ নাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গেই পণ্ডিচেরী এসে থাকলেন জানুয়ারীর ৭ তারিখ থেকে ১২ তারিখ। পণ্ডিচেরী থেকে মাদ্রাজে এসে থাকলেন ১৩ই জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারীর ১০ পর্যন্ত। তারপর ট্রেনযোগে হায়দ্রাবাদে গিয়ে মধুসূদন চ্যাটার্জীর বাড়িতে কাটালেন ফেব্রুয়ারীর ১১ থেকে ২৫ অবধি। তারপর আবার মাদ্রাজ—ফেব্রুয়ারীর ২৬ থেকে এপ্রিলের ১০ তারিখ অবধি।

মাদ্রাজ থেকে বোম্বাই;১২ই থেকে ১৬ই এপ্রিল। অতিথি হলেন দক্ষিণেশ্বরের পরিচিত কালীপদ ঘোষের বাড়িতে। বোম্বাই থেকে ট্রেন ও ঘোড়ার গাড়ীতে খেতরীর রাজা অজিত সিংহের প্রাসাদে। সেখানে রইলেন ১০ই মে পর্যন্ত। সেখান থেকে আমেরিকার পথে আবার বোম্বাই—১৬ থেকে ৩১ মে।

প্রমথনাথ বসুর বইতে অবশ্যই নরেন্দ্রনাথকে অতিমানব রূপে অভিক্ষেপ করা হয়েছে। আসল কথা, কথা বলা পুতুলের মতো ইংরেজী বলা সাধু দেখে সবাই বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর, উদাত্ত গলায় সঙ্গীত, সুন্দর একজোড়া চোখ সবাইকে আবিষ্ট করতো। পরিব্রাজনের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথ যেমন বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা করছিলেন, তেমনই বিভিন্ন

পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপের মধ্যে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করছিলেন। বিতর্কে স্বচ্ছন্দ নরেন্দ্রনাথ জানতেন কীভাবে দুর্বলতা খুঁজে নিয়ে মানুষকে বিতর্কে পরাজিত করতে হয়। আর হিন্দুদের নিজের ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান চিরকালই অল্প। তারা নানা রকম ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বাস করে।

রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় বিবেকানন্দের প্রথম ভারত পরিক্রমা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে বলেছেন, নরেন্দ্রনাথ সেই জায়গাগুলিতেই পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন, যেগুলিতে হাঁটা ছাড়া গতি ছিল না। আজও গৌরিকুণ্ড থেকে কেদারনাথ হেঁটে যেতে হয়। অন্যত্র তিনি সাধারণভাবে রেলপথেই গিয়েছিলেন। এমন জায়গা ছিল, যেখানে রেলগাড়ী ছিল না। কিন্তু গরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ী ছিল। আশ্রয়ের ব্যাপারে তিনি নানা পূর্বপরিচিত ব্যক্তি ও রাজা-মহারাজার প্রাসাদে, বা রাজার মন্ত্রী-দেওয়ানের গৃহে আশ্রয় নিতেন। বিরজা হোম করে সন্ন্যাস নেওয়া মানুষের পক্ষে পূর্বাশ্রমের পরিচিতদের স্বীকার করাটা নীতিসম্মত নয়।

বিবেকানন্দের স্বাস্থ্য মোটেই কষ্ট স্বীকার করার মতো মজবুত ছিল না। ১৮৮৬ তে অভেদানন্দের সঙ্গে গয়া গিয়ে বিবেকানন্দ প্রবল বদহজমে ভোগেন। ১৮৮৭র গ্রীষ্মকাল ও বর্ষার প্রথমদিকে তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। ভুগেছিলেন জ্বর, টাইফয়েড ও প্রস্রাবের ব্যাধিতে। ১৮৮৯ র ফেব্রুয়ারীতে অনেকের সঙ্গে তিনি জয়রামবাটি-কামারপুকুর যান। কিন্তু সেখানেও জ্বর ও ভেদবমি হয় তাঁর। ফেব্রুয়ারী-মার্চে তাঁর জ্বর হতেই থাকে। তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য জুন-জুলাই এ শিমুলতলায় যান এক আত্মীয়ের বাংলোতে। কিন্তু সেখানেও তাঁর উদরাময় হয়। পরে ডিসেম্বরে তিনি দেওঘরে যান। কিন্তু সেখানেও তিনি বদহজমে ভোগেন। তারপর ১৮৯০ তে হৃষিকেশে তো তিনি জ্বরে সংজ্ঞাহীন হয়ে যান।

এলাহাবাদে তিনি কোমরের বাতে ভোগেন। এই রোগটি তাঁর বহুদিন ছিল; ফলে বেশী হাঁটা ছিল তাঁর সাধ্যাতীত।

তারপর দিল্লী থেকে তিনি যে একাকী ভ্রমণ শুরু করেন ১৮৯৩ র সমুদ্রযাত্রা পর্যন্ত, সেই ভ্রমণে তিনি প্রায়শই রাজা, দেওয়ান বা মধ্যবিত্ত মানুষের বাড়িতে আশ্রয় নিতেন। এই আশ্রয় দাতারা অনেক সময় তাঁর পূর্বাশ্রমের পরিচিত। এই পরিক্রমার সময়ে তিনি নিজের নাম পাল্টান। বিবিদিষানন্দ হন সচ্চিদানন্দ, শেষে চিকাগো যাত্রার সময় তাঁর শিষ্য খেতরীর রাজা অজিত সিং এর প্রস্তাব অনুযায়ী নাম গ্রহণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ। আগে অজিত সিং এর পরামর্শেই তিনি মাথায় পাগড়ী পরা আরম্ভ করেন।

পরিব্রজনের সময় তিনি গুজরাটী ও দক্ষিণ ভারতীয় খাবার খেতে পারতেন না। মাদ্রাজে থাকাকালীন তিনি পূর্বতন বন্ধু মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যেতেন মাছ-ভাত খাওয়ার জন্য। এই নিয়ে মাদ্রাজীদের প্রচুর ক্ষোভ ছিল।

প্রমথনাথ বসু প্রাক-আমেরিকা পর্বে নরেন্দ্রনাথের ভারত পরিক্রমার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। আমরা সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। কিন্তু কিছু অসম্ভব বিবরণের

প্রতিবাদ করতে হয়। তিনি লিখেছেন, "মিঃ আবদুল রহমান সাহেব নামে মহীশূররাজের একজন মুসলমান সভাসদ স্বামীজীর নিকট কোরানের কয়েক স্থলের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন ও তৎসম্বন্ধে তাঁহার যে যে সন্দেহ ছিল তাহা মিটাইয়া লইলেন।"

এর আগে বিবেকানন্দের শিক্ষাদীক্ষার যা আলোচনা হয়েছে তাতে কখনও বলা হয় নি যে নরেন্দ্র আর্বী ভাষা শিখে কুরআন পড়েছেন। বস্তুত কুরআন তিনি ইংরেজী অনুবাদেও পড়েছেন এমন তথ্য তাঁর রচনাবলীর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রাকটিক্যাল বেদান্ততে কুরআনের যে আয়াত পাওয়া যায় তা রামমোহন রায়ের 'তুহ্‌ফৎ-উল-মুওয়াহিদিন' এর ইংরেজী অনুবাদ থেকে নেওয়া বা অন্য কোনও সূত্র থেকে নেওয়া।

বিবেকানন্দ চিকাগো বিশ্বধর্ম মেলায় যোগদানের অনেক পরে যখন কলকাতায় ফিরে আসেন তখন শীর্ষস্থানীয় হিন্দুদের অনেকে তাঁকে হিন্দু সন্ন্যাসী বলে মানতে রাজী হন নি। যেমন, হাইকোর্টের দুই জজ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সারদাচরণ মিত্র। উত্তর পাড়ার রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় শোভাবাজার রাজবাটীতে তাঁর সম্বর্দ্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করতে রাজী হলেও স্বামী বিবেকানন্দ না বলে 'ব্রাদার বিবেকানন্দ' বলেছিলেন। বিবেকানন্দের জন্মের সার্দ্ধ শতবর্ষ বর্ষে যে হুজুক চলছে তাতে 'মহামানবের' এই 'বিড়ম্বনায়' ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু নরেন্দ্রের সন্ন্যাসজীবন কী প্রশ্নাতীত ছিল ?

চিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ

মাদ্রাজে পৌঁছাবার পর মন্মথ ভট্টাচার্যের বাংলোতে 'ইংরেজী বলা সাধুকে' দেখতে বেশ কিছু দক্ষিণ ভারতীয় যুবকের ভিড় হয়েছিল। আগেই বলেছি ব্যাপারটা কথা বলা পুতুলের মতোই বিস্ময়কর। এইসব যুবকদের অনেকেই ছিলেন ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সম্মেলনের সদস্য। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মণ্ডম চক্রবর্তী আলাসিঙ্গা পেরুমল। তাঁর নেতৃত্বেই বিবেকানন্দের (তখন নাম সচ্চিদানন্দ) পাশ্চাত্য গমনের জন্য টাকা পয়সা তোলা হয়। টাকার মোটামুটি হিসেব হচ্ছে, মন্মথ ভট্টাচার্য পাঁচশো টাকা, রামনাডের রাজা ভাষ্কর সেতুপতি পাঁচশো টাকা। জাস্টিস সুব্রহ্মন্যম আয়ার পাঁচ শো টাকা, মহীশূরের রাজা এক বা দেড় হাজার টাকা। ঐ টাকা দিয়ে সম্ভবত জাহাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেনা হয়। পরে খেতড়ীর রাজা অজিত সিং আরও টাকা দিয়ে তা প্রথম শ্রেণীতে রূপান্তরিত করেন। কারণ, পূর্বে একটি পুত্র সন্তানের জন্য স্বামীজীর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন তিনি। সেই প্রার্থিত পুত্র তিনি লাভ করেছিলেন। এছাড়া অজিত সিং সার্কুলেটরী নোট হিসাবে তিন হাজার টাকা দেন। এইগুলি পরে স্বামীজী হারিয়ে ফেলেন। এ ছাড়া অজিত সিং জগমোহনলাল নামক একজনকে বোম্বাইতে পাঠিয়েছিলেন বিবেকানন্দের যাত্রার জন্য উপযুক্ত পোষাক ও অন্যান্য জিনিষপত্র কিনে দেওয়ার জন্য।

বোম্বাই থেকে একটি জাহাজে বিবেকানন্দ চীন, জাপান হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে ১৮৯৩ সালের ২৫শে জুলাই কানাডার ভাঙ্কুভার বন্দরে পৌছান। সেখান থেকে ট্রেনে চিকাগো পৌছান জুলাই মাসের তিরিশে। কোনও রকম আমন্ত্রণপত্র বা পরিচয়পত্র ছাড়াই তিনি ধর্ম মহাসভায় যোগ দিতে এসেছিলেন। এ ব্যাপারটা মাদ্রাজের উৎসাহী যুবকেরা চিন্তা করে দেখেন নি। চিকাগো মহামেলায় গিয়ে তিনি শুনলেন, প্রতিনিধি হওয়ার নাম দাখিল করার শেষ দিনটিও পেরিয়ে গেছে। সুতরাং তাঁর পক্ষে মহাসভায় বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব নয়। ট্রেনে আসার সময় ক্যাথারিণ সানবর্ণ নাম্নী এক বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বিবেকানন্দের। ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের মেটকাফ শহরে এক খামারবাড়ি ছিল ভদ্রমহিলার। সেখানে বিবেকানন্দকে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। বিবেকানন্দ সেই আমন্ত্রণের সদ্ব্যবহার করলেন। আগস্টের ১৮ তারিখের আগেই তিনি পৌছে যান মেটকাফ শহরের খামারবাড়িতে। সেখানে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যলয়ের অধ্যাপক জন হেনরী রাইটের খোঁজ পান। রাইটের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি আগস্টের ২৬-২৭ তারিখে শনি-রবির ছুটিতে সমুদ্রতটের শহর অ্যানিসকোয়ামে আসতে বলেন। বিবেকানন্দ যথাদিনে সেখানে উপস্থিত হন। এখানেও গৈরিক পোষাক পরা সুন্দর ইংরেজী বলা হিন্দু সন্ন্যাসীকে দেখে রাইট যেন কথা বলা পুতুলই দেখলেন। রাইট ছিলেন গ্রীক ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক। হিন্দু ধর্ম তাঁর চর্চার বিষয় ছিল না। রবিবার অ্যানিসকোয়ামে একটি চার্চে বিবেকানন্দ বক্তৃতা দেবার পরে চিকাগো সংক্রান্ত সমস্যার কথা জেনে অধ্যাপক রাইটের মনে হলো, এই বাগ্মী সন্ন্যাসী ধর্ম মহাসভা থেকে বঞ্চিত হলে ঠিক হয় না। তিনি ধর্ম মহাসভার উদ্যোক্তাদের একটি চিঠি দেন যাতে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের একজন প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হন।

কিন্তু গল্প হচ্ছে, পরিচয়পত্র নেই শুনে অধ্যাপক রাইট বলেছিলেন, আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণ বিকিরণের কি অধিকার আছে তা জিজ্ঞাসা করা একই কথা।

রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় এই কথার প্রতিবাদ করেছেন। কারণ, বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে গ্রীক ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক মুগ্ধ হতেই পারেন;তাঁর মনে হতে পারে, সন্ন্যাসী উচ্চ শিক্ষিত, কিন্তু বিবেকানন্দের শাস্ত্রজ্ঞান বিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। 'চিকাগো টাইমস' এর প্রতিবেদনে ছাপা হয়েছে, রাইট বলেছেন, 'বিবেকানন্দ পৃথিবীর একজন উত্তম শিক্ষিত মানুষ।' এটাই কথা বলা পুতুল দেখে মুগ্ধ রাইট লিখতে পারেন।

তবে কিছু কিছু কাগজে ছাপা হয়েছিল, রাইট বলেছিলেন, 'বিবেকানন্দের পাণ্ডিত্য আমাদের সকলের পাণ্ডিত্যের যোগফলের চেয়ে বেশী।'

এমনতর কথার প্রতিবাদ করেছেন রাজাগোপাল। তাঁর অভিযোগ, এগুলি বিবেকানন্দেরই রটনা। সংবাদ দু রকমভাবে সংগ্রহ হয়। হয় সংবাদদাতা সরাসরি বক্তার নিকট উপস্থিত থাকেন। যদি সংবাদদাতা বক্তার নিকট সেই সময় উপস্থিত না থাকেন, তবে পরে বক্তার মুখে শুনে বা

বক্তৃতাটি যদি লেখা থাকে তা দেখে সংবাদপত্রে সংবাদ ছাপা হয়। দ্বিতীয় ধরণের বক্তব্য যেসব সংবাদপত্র ছেপেছিল তারা বিবেকানন্দের কাছ থেকে রাইটের বক্তব্য জেনেছিল।

রাজাগোপাল জানিয়েছেন, সংবাদ অতিরঞ্জনের ঘটনা বার বার ঘটেছে;এবং তার জন্য বিবেকানন্দই দায়ী।

হতেই পারে, বিবেকানন্দ হুজুক সৃষ্টিতে, ধুম মচানোতে বিশ্বাস করতেন। গুরুভাইদেরও সেই মর্মে নির্দেশ দিতেন। ভারতজুড়ে বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তার কারিগর বিবেকানন্দ নিজে।

চিকাগো ধর্ম মহাসভার ইতিহাস

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চার শো বছর উদযাপন উপলক্ষে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ই মে থেকে একটি বিশ্বমেলার আয়োজন করা হয় চিকাগোতে। এই বিশ্বমেলার অঙ্গ হিসাবে ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ শে সেপ্টেম্বর চিকাগো শহরের কেন্দ্রে সদ্য নির্মিত আর্ট ইনস্টিটিউটে একটি ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন মেলা কর্তৃপক্ষ।

এই ধর্মসম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেক মহৎ কথা বলা হলেও এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টধর্মের বিজয় কেতন উড্ডীন করা। ১৭ দিনের এই সভায় বহু ধর্মীয় নেতা ও জ্ঞানী গুণী মানুষ তাঁদের বক্তব্য রাখেন। এই ধর্ম সম্মেলনে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে তেরোজন বক্তা সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। এঁরা হলেন

(১) জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, থিয়োসফিস্ট, এলাহাবাদ
(২) হেবাবির্তনে ধর্মপাল, থেরাবাদী বৌদ্ধ, কলকাতা
(৩) রবার্ট এ হিউম, খ্রিষ্টান মিশনারী, মাদ্রাজ
(৪) প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, ব্রাহ্ম , কলকাতা
(৫) বলবন্ত ভাউ নাগরকার, ব্রাহ্ম , বোম্বাই
(৬) লক্ষ্মীনারায়ণ, হিন্দু , লাহোর
(৭) নরসিংহাচার্য, হিন্দু, মাদ্রাজ
(৮) মরিস ফিলিপস, খ্রিষ্টান মিশনারী, ব্যাঙ্গালোর
(৯) জিন্দা রাম,হিন্দু, মজফ্ফরগড়
(১০)সিধধু রাম হিন্দু, মুলতান, পাঞ্জাব
(১১) জীন সোরাবজী, খ্রিষ্টান, বোম্বাই
(১২) বীরচাঁদ গান্ধি, জৈন, বোম্বাই
(১৩) স্বামী বিবেকানন্দ, হিন্দু, কলকাতা

চিকাগো না গিয়েও লেখা পাঠিয়ে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সাত জন ভারতীয়:

(১) এস পার্থসারথী আয়েঙ্গার, হিন্দু, মাদ্রাজ।
(২) মোহন দেব, হিন্দু , লাহোর

(৩) মণিলাল নাভুভাই দ্বিবেদী, হিন্দু, বোম্বাই
(৪) পুরুষোত্তম বালকৃষ্ণ যোশী, হিন্দু, বোম্বাই, মারাঠী ও সংস্কৃত কবি
(৫) জামসেদজী জিনানজী মোদী, পার্সী, বোম্বাই
(৬) টি জে স্কট, খ্রিষ্টান মিশনারী
(৭) টমাস ই স্লেটার, খ্রিষ্টান মিশনারী, ব্যাঙ্গালোর

সশরীরে যাঁরা চিকাগোয় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সিধ্‌ধু রাম ও জিন্দা রাম শুধুমাত্র শ্রোতাই ছিলেন। কোনও ভাষণ দেন নি। আর লক্ষ্মী নারায়ণ মূল সভায় ভাষণের সুযোগ পান নি, পেয়েছিলেন বিজ্ঞান শাখায়। বাকী দশজন মূল সভায় এক বা একাধিকবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অনুপস্থিতদের সবার লেখা অধিবেশনে পড়াও হয় নি। পাঁচ ভারতীয় প্রতিনিধি নরসিংহাচার্য, লক্ষ্মীনারায়ণ, বিবেকানন্দ, ধর্মপাল ও গান্ধির আর্ট ইন্‌স্টিটিউটের পাশে দাঁড়ানো একটি ছবি পাওয়া গেছে, যা মলাটে ছাপা হলো। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দই ধর্ম মহাসভায় একমাত্র হিন্দু প্রতিনিধি ছিলেন না।

ধর্ম মহাসভার প্রধান বক্তৃতাগুলি কলম্বাস হলে অনুষ্ঠিত হতো। সেখানে তিন হাজার মানুষ বসতে পারতো। আর্ট ইনস্টিটিউটের আরও কয়েকটি ছোট হলঘরে শাখা মিটিংগুলি হতো;সেগুলিতে একশো থেকে তিনশো জন মানুষের জায়গা হতো। শাখা মিটিংগুলি এইসব হলেতেই হতো। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে খুব কমই ছাপা হতো শাখা মিটিংগুলির সংবাদ।

বিবেকানন্দ মূল সভা কলম্বাস হলে ছ'টি বক্তৃতা দেন। অভ্যর্থনার উত্তরে প্রথম ভাষণ দেন এগারোই সেপ্টেম্বর। কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণটি প্রদত্ত হয় সেপ্টেম্বরের উনিশ তারিখে। সেটির শিরোনাম 'হিন্দুধর্ম'।

এখন বিবেকানন্দের প্রথম বক্তৃতাটি উদ্ধৃত করা যাক :

"হে আমেরিকাবাসী বোন ভায়েরা, (হাততালি), আজ আপনারা আমাদের যে সুন্দর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, তার উত্তর দিতে গিয়ে আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠেছে। পৃথিবীর যে প্রাচীন সন্ন্যাসী সমাজ দেখা গিয়েছে, গৌতম যার একজন সদস্য, সেই সমাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সব ধর্মের যিনি প্রসূতি, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যার শাখা মাত্র, সেই ধর্মের নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই মঞ্চের কয়েকজন বক্তাদেরও ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা আপনাদের বলেছেন যে, দূর-দেশ থেকে আসা বিভিন্ন মানুষ এখানে যে পরমত সহিষ্ণুতার ভাবটি দেখবেন তাঁরা সেটি বহন করে দেশে দেশে ফিরে যাবেন। এই চিন্তাটির জন্য আমি তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যে ধর্ম জগতকে পরমত সহিষ্ণুতা ও সর্বাধিক মতগ্রহণ, উভয় শিক্ষা দিয়ে এসেছে, আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গর্ববোধ করি। আমরা কেবল বিশ্বজনীন সহনশীলতাই নয়, সব ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সক্লুশন' শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলেও গর্ব বোধ করি। যে দেশটি

পৃথিবীর সকল ধর্মের এবং সকল দেশের নিপীড়িতদের এবং উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়ে এসেছে, আমি সেই দেশের বলেও গর্ববোধ করি। আমি সগর্বে আপনাদের জানাচ্ছি, আমরাই ইহুদীদের সবচেয়ে খাঁটি বংশধরদের বক্ষে ধারণ করে রেখেছি, যে বছর রোমান উৎপীড়নে তাদের পবিত্র মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়, সেই বছরই তাদের একটি অংশ দক্ষিণ ভারতে এসে আমাদের মধ্যে আশ্রয় নেয়। জরথুষ্ট্রের মহান দেশের বংশধররাও আমাদের ধর্মের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, এবং আজও যারা তাদের প্রতিপালন করছে, তাদের জন্যও আমি গর্বিত।

ভ্রাতারা, প্রতিটি হিন্দু শিশু প্রতিদিন যে স্তোত্রটি আবৃত্তি করে তারই কয়েকটি পংক্তি আপনাদের শোনাব। এই স্তোত্রটি আমি খুব ছোটবেলা থেকে আবৃত্তি করে আসছি, এবং ভারতের কোটি কোটি লোক এটিকে প্রত্যহ আবৃত্তি করে। সেই স্তোত্রটি এখানে রূপদান করা হচ্ছে : (স্তোত্র আবৃত্তি)

"বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাহাদের জলরাশি ঢালিয়া মিলাইয়া দেয়, তেমনই হে ভগবান, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশত সরল ও কুটিল নানা পথে যাহারা চলিয়াছেন, তুমি তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।"

এই সম্মেলন, যেটি এযাবৎ অনুষ্ঠিত মহিমান্বিত সমাবেশসমূহের অন্যতম, নিজেই একটি ইঙ্গিত, পৃথিবীর কাছে একটি ঘোষণা গীতার সেই মহৎ বাণীর—

"যে যেভাব আশ্রয় করে আসুক না কেন, আমি তাকে সেই ভাবেই দেখা দিয়ে থাকি। সকলেই বিভিন্ন পথে সংগ্রাম করছে, কিন্তু শেষে তাদের পথ আমার কাছেই নিয়ে আসবে।"

সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামী, এবং এগুলির বংশধর ধর্মে অত্যানুরক্তি এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরে অধিকার করে রেখেছে। এবং পৃথিবীকে হিংসায় পরি পূর্ণ করেছে, বারবার সিক্ত করেছে মানুষের রক্তে। সভ্যতা ধ্বংস করেছে ও সমগ্র দেশকেও হতাশায় ডুবিয়েছে।

এই ভীষণ পিশাচগুলি যদি না থাকতো, তবে মানবসমাজ আজকের থেকে অনেক বেশী উন্নত হতো। কিন্তু এদের দিন শেষ হয়েছে, এবং আমি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করি, আজ এই সভায় সকালে সমাগত পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের সম্মানার্থে যে ঘন্টাধ্বনি নিনাদিত হলো, সেই ঘন্টাধ্বনি সেই অত্যনুরক্তির অন্তিম সময় সূচনা করলো, (হাততালি) মৃত্যু ঘোষণা করলো তরবারী ও লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সবরকম নির্যাতনের, এবং একই লক্ষ্যে অভিমুখী অথচ বিভিন্ন পথের পথিক ভ্রাতৃগণের মধ্যে সকল নির্মম ভাবের অবসান ডেকে আনলো, (হাততালি)"

দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ তাঁর ভাষণে যত মত তত পথ করেছেন। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, সব ধর্মে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছনোর ব্যাপার নেই;আবার সব ধর্মে ঈশ্বরের কথাও নেই। সুতরাং এক তুলি দিয়ে সব ধর্মকে আঁকা যায় না। আর, গীতার শ্লোকের অপব্যবহার হয়েছে। গীতা যেমন মহাভারতের অংশ, তেমনই মহাভারতে আর একটি শ্লোকও আছে:

ধর্মং যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্ম কুধর্ম তৎ।
অবিরোধাৎ তু যো ধর্মঃ স ধর্মঃ সত্যবিক্রম।।

মহাভারত; বনপর্ব ১৩০.১১

(সত্যবিক্রম রাজা! যে ধর্ম অপর ধর্মকে নষ্ট করে, সেটা ধর্মই নয়: সেটা কুধর্ম। আর যে ধর্ম অন্য ধর্মের বাধা না জন্মিয়ে উৎপন্ন হয় , সেটাই স্বাভাবিক ধর্ম)

সুতরাং বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর মতো সুধর্ম-কুধর্ম এক করে ফেলেছেন।

এবার হাততালির প্রসঙ্গে আসা যাক : বিবেকানন্দের আমেরিকাবাসীদের প্রতি 'সিস্টারস অ্যান্ড ব্রাদার্স' সম্বোধন হাততালি আদায় করেছিল সন্দেহ নেই ;কিন্তু সেটা যতোটা বলা হয় ততোক্ষণ ধরে নয়। আর প্রমথনাথ বসু লিখেছেন, 'তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র সভার অধিকাংশ লোক তাঁহার অনুরাগী ও তাঁহার মতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবী তাঁহার পদানত হইল।'

অবশ্যই তেমন কিছু ঘটেনি। এটা প্রমথনাথের অসার কল্পনা। তবে এই কথাটির উৎস স্বয়ং বিবেকানন্দ। তিনি ২রা নভেম্বর আলাসিংহা পেরুমলকে লিখেছিলেন, "পরদিন সব কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল;সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল।"

এ কথাটি আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। চিকাগোর গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র, যেমন চিকাগো ডেলী ট্রিবিউন, চিকাগো হেরাল্ড, চিকাগো ইন্টার ওশানে এমন কথা ছাপা হয় নি। আর সারা আমেরিকার সবাই তাঁকে জানতে পারলো, এমন ঘটনাও ঘটেনি। কারণ নিউ ইয়র্ক টাইমস, নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড, নিউ ইয়র্ক ডেলী ট্রিবিউন এবং বোস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট কাগজগুলিতে সেপ্টেম্বরের বারো তারিখ থেকে আঠাশ তারিখ পর্যন্ত ধর্ম মহাসভা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ ছাপা হলেও স্বামী বিবেকা নন্দের নামও উল্লেখ করা হয়নি বলে জানিয়েছেন রাজাগোপাল।

শুক্রবার ১৫ ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নের অধিবেশন শেষ হওয়ার আগে চেয়ারম্যান বিবেকানন্দেকে কিছু মন্তব্য করার অনুরোধ করেন। এর উত্তরে বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের কুয়োর ব্যাঙ ও সমুদ্রের ব্যাঙের গল্পটি বলেন। ব্যাঙ কাহিনীটি রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাবলীতে ছাপা হয়েছিল। বিবেকানন্দ সম্ভবতঃ তার একটি কপি পেয়েছিলেন।

আগেই বলেছি,চিকাগো ধর্মসভায় বিবেকানন্দের সবচেয়ে সমাদৃত ভাষণটি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে। সেটি ছিল ১৯ শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে কলম্বাস হলের শেষ ভাষণ। এদিন বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনার জন্য কলম্বাস হলের প্রবেশ পথে প্রচুর ঠেলাঠেলি হয়। মহিলারাই বেশী ভিড় করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব পোষাক, পুরুষালী দেহ ও সঙ্গীতময় কণ্ঠে নিখুঁত ইংরেজী উচ্চারণ মহিলাদের গোড়া থেকেই আপ্লুত করেছিল। একটি পত্রিকাতো তাঁকে সেক্সপীয়ারের নাটকের চরিত্র ওথেলোর সঙ্গে তুলনা করেছিল। আর এটিই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সেরা বক্তৃতা।

তবে বিবেকানন্দ একাই ধর্ম মহাসভায় প্রশংসা কুড়োন নি। ব্যারোজ সাহেবের যে রিপোর্ট পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তাতে বিবেকানন্দের চেয়ে বেশী জায়গা পেয়েছেন আরও চারজন। এঁরা হলেন, ধর্মপাল (২৩ পাতা), মনিলাল দ্বিবেদী (২০.৫ পাতা), প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার (১৯ পাতা), জামসেটজী মোদী (১৭ পাতা।) বলবন্ত নাগরকার ও স্বামী বিবেকানন্দ দুজনেই ঐ রিপোর্টে ১৫ পাতা পেয়েছিলেন।

চিকাগোর এক নম্বর সংবাদপত্র ছিল চিকাগো ডেলী ট্রিবিউন। সেই বিচার করলে দেখা যায় ধর্মপাল পেয়েছিলেন ৬৩০ লাইন, নাগরকার ৪২৮ লাইন, মজুমদার ৪১৪ লাইন, বিবেকানন্দ ২০৬ লাইন, বীরচাঁদ গান্ধি ১৮৯ লাইন, জীন সোরাবজী ১১২ লাইন, জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী ৮২ লাইন, ইত্যাদি। দুজায়গাতেই ধর্মপাল ছিলেন এক নম্বরে। মজুমদারের তুলনায় স্বামী বিবেকানন্দ জায়গা পেয়েছিলেন অর্ধেক।

বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্ট ঘেঁটে দেখা গেছে বিবেকানন্দের পোষাক, পুরুষালী চেহারা, ওজস্বী কণ্ঠস্বর ও আন্তরিকতাপূর্ণ কথা বেশী প্রশংসা আদায় করেছে। বিশেষত, মহিলাদের কাছ থেকে।

ধর্ম মহাসভা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু বিবেকানন্দ দেশে ফিরলেন না। ধনী আমেরিকায় মানুষ বক্তৃতা শোনার জন্যও টাকা খরচ করে। চারশো বছর ধরে ইউরোপ থেকে আগত ভাগ্য অন্বেষণকারীরা আমেরিকার আদিবাসীদের মেরে মেরে শেষ করেছে। আর দখল করেছে তাদের শষ্য শ্যামলা ভূমি। লুঠ করেছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ। অজস্র মূল্যবান গাছ কেটে কেটে সেগুলি থেকে ইউরোপে তক্তা রপ্তানী করেছে জাহাজ ভর্তি করে করে। আজ তারা এতো ধনী যে পয়সা খরচ করে বক্তৃতা শোনে;বক্তৃতার ব্যবস্থা করার জন্য ঠিকাদারও আছে। বিবেকানন্দ অচিরেই এই ধরণের এক ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন বক্তৃতা দিয়ে অর্থ উপার্জন করার জন্য। আবার বেশ কিছু সহৃদয় মহিলা তাঁকে অতিথি করলেন বিভিন্ন স্থানে। ফলে বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের জন্য মঠ ও সারদামায়ের থাকার একটি ব্যবস্থা করতে অর্থ উপার্জনে মগ্ন হলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেশবচন্দ্র মার্কা ব্রাহ্ম নরেন্দ্রনাথের হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে পড়াশুনা কি রকম ছিল? ভারতে পরিক্রমার সময় তিনি কিছু কিছু পণ্ডিত মানুষের সাহচর্যে এসেছিলেন। একজন ব্রাহ্ম হিসাবে তিনি কিছু উপনিষদ হয়তো পড়েছিলেন।

তাঁর চিঠিপত্র বিবেচনা করে দেখা যায় কেট ট্যান্নাট উডস্‌কে তিনি ১৮৯৩ ১৯ শে নভেম্বর চিঠি লিখে তাঁর বইগুলি পাঠাতে বলেছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই সেই বইগুলি বিবেকানন্দের নিকট পৌঁছেছিল বলে ধরে নিতে পারি। সুতরাং অবসর পেলেই বিবেকানন্দ ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর পড়াশুনাগুলি ঝালিয়ে নিতেন। তাঁর রসদের একটা বড় উৎস ছিল ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের 'শর্ট হিস্ট্রি অব দি পিপল অব ইন্ডিয়া'। এ ছাড়া কিছু ধর্মগ্রন্থ অবশ্যই তাঁর সংগ্রহের মধ্যে ছিল। এই বইগুলি তিনি সম্ভবত বসটন থেকে

সংগ্রহ করেছিলেন। অন্যদিকে তাঁর গুরুভাইরাও কলকাতা থেকে নিয়মিত বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠাতেন, এ সংবাদ আছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে লেখা, 'সুরেশ দত্তর 'রামকৃষ্ণচরিত' পড়িলাম, মন্দ হয় নাই।' আবার আলাসিঙ্গা পেরুমলকে ১৮৯৫ এর ১২ ই জানুয়ারীতে লেখা একটি চিঠিতে পাই, "প্রথমতঃ আমি পূর্বের কয়েক পত্রে তোমাদের লিখেছি যে, বইটই বা খবরের কাগজ প্রভৃতি আর আমায় পাঠিও না..." অন্যদিকে, ঐ বছরেরই ৯ই ফেব্রুয়ারী বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে লেখা চিঠিতে দেখা যায় তিনি লিখছেন, যদি পারো একখানা 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' ইংলিশ ট্রানস্লেশন পাঠাবে। মহিনকে দাম দিতে বলবে। পূর্বে যে বইয়ের কথা লিখেছি, অর্থাৎ, সংস্কৃত নারদ ও শাণ্ডিল্য সূত্র, তাহা ভুলো না।

আবার ঐ আলাসিঙ্গাকেই ৬ই মার্চ ১৮৯৫ এ লিখছেন, "আমি তোমাকে যে বইগুলির কথা লিখেছিলাম, সেগুলি পাঠিয়ে দিতে পারো?" আলাসিঙ্গাকে তিনি ৪ ঠা এপ্রিল ১৮৯৫ লিখছেন, "আমি তোমাদের নিকট যে ক তকগুলি বই চেয়েছিলাম, সে সম্বন্ধেও তুমি কিছু লেখনি। যদি সব সম্প্রদায়ের ভাষ্য সহ বেদান্তসূত্র আমাকে পাঠাতে পারো তো ভালো হয়।"

উপরোক্ত চিঠিগুলির বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দেও বিবেকানন্দের কাছে হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই (এবং তথ্য) ছিল না। ১৮৯৫ এর ৬ ই মে তিনি আলাসিঙ্গাকে লেখেন, আজ প্রাতে তোমার শেষ চিঠিখানা ও এবং রামানুজাচার্যের ভাষ্যের প্রথম ভাগ পেলাম। ঐ চিঠিতেই তিনি বেদান্ত সম্পর্কে তাঁর নতুন আবিষ্কারের সংবাদ জানান, "ধর্মের যা কিছু বেদান্তের মধ্যেই আছে, অর্থাৎ, বেদান্ত দর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই তিনটি স্তরে আছে....।"

যেহেতু ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দর কাছে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রের পুস্তক তেমন ছিল না, গুরুর কাছ থেকেও তিনি তেমন শাস্ত্রজ্ঞান পান নি, ঐ সময় তাঁর বক্তৃতায় হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কোনও গভীর বক্তব্য পাওয়া যায় নি। তাঁর বক্তৃতায় পাওয়া যেত গীতার চিন্তাধারা ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক বক্তব্য।

আমেরিকায় বিবেকানন্দের সাফল্য সম্পর্কে ভারতে প্রচার

মহাসভার শেষে বিবেকানন্দ যখন বুঝলেন ভারতীয় বক্তাদের মধ্যে অন্যেরাও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছেন এবং তিনি একাই হিন্দুধর্ম নিয়ে বলেন নি, তখন তিনি তাঁর গুরুভাই ও অন্যান্য অনুগামীদের দ্বারা ধুম মচাবার চেষ্টা করবেন ঠিক করলেন। কারণ, তাঁর অন্তিম উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের মঠ নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ। তিনি আলাসিঙ্গা পেরুমলের কাছে লেখা ১৮৯৩ এর দোসরা নভেম্বরের চিঠিতে অন্যান্য ভারতীয় প্রতিনিধিদের তুচ্ছ করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে নভেম্বরের মাঝামাঝি ত্রিগুণাতীতানন্দকে ও হরিদাস দেশাইকে লুসী মনরোর লেখা বক্তব্যর অংশ ও নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকার তথাকথিত রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন।

ভারতে ব্রাহ্ম পত্রিকা 'ইউনিটি অ্যান্ড দি মিনিস্টার' এ ধর্ম মহাসভার সূচনার কথা ১৭ই সেপ্টেম্বরেই ছাপা হয়। কিন্তু এ সংবাদ খুব বেশী লোকের নজরে আসেনি। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার' এ বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত সংবাদ অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বেরিয়েছিল। সেগুলিও খুব বেশী লোকের নজরে আসে নি।

কলকাতায় প্রথম দি স্টেটসম্যান কাগজে (৯ই নভেম্বর ১৮৯৩) ডটির পরিবেশিত বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট এর সংবাদটি ছাপা হয়। দুদিন পরে তা ছাপা হয় ইন্ডিয়ান মিরর এ ও পরে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' য়।

বিবেকানন্দ ব্যক্তিটি কে সে সম্বন্ধে কারও ধারণা ছিল না। কারণ, রামকৃষ্ণের ভক্তরা তাঁকে 'নরেন' বলেই জানতেন। বিবেকানন্দ নামটি তিনি অজিত সিং এর অনুরোধে ১৮৯৩-র মে মাসে গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে ভারত ভ্রমণের সময় তিনি বিবিদিষানন্দ বা সচ্চিদানন্দ নামটিই ব্যবহার করতেন।

ডটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে কলকাতায় ও অন্যত্র একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর সাফল্যে অনেকেই গর্বিত বোধ করেন।

ইন্ডিয়ান মিররে ১২ ই ডিসেম্বর একটি সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, চিকাগোর শ্রোতারা প্রথম বিবেকানন্দের মুখেই হিন্দুধর্মের কথা শোনেন। অন্যান্য হিন্দু বক্তারা ততআগ্রহ জাগাতে পারেন নি।

এর আগে ৭ ও ৮ই ডিসেম্বর চিকাগো ট্রিবিউন থেকে বেছে বেছে বিবেকানন্দ সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলিই ইন্ডিয়ান মিররে ছাপা হয়। এই বাছা খবরগুলির উৎস স্বয়ং বিবেকানন্দ বলেই মনে হয়। তিনি চিকাগো ট্রিবিউনের কাটিংগুলি কোনও গুরুভাইকে পাঠিয়েছিলেন।

এখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে পাঠকের কিছু তথ্য জানা প্রয়োজন। সংবাদ দাতা অনেকসময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকেন না। কিন্তু, সংবাদ তাঁর প্রকাশিত করতেই হবে। তখন তিনি বক্তা যদি লিখিত বক্তব্য রেখে থাকেন, তবে সেই লেখাটি চেয়ে নেন। যদি লিখিত বক্তব্য না হয় তবে সংবাদদাতা বক্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে বক্তৃতা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। মহাসভার দুই সাংবাদিক ফ্রান্সিস অ্যালবার্ট ডটি ও লুসি মনরো বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের পরিবেশিত সংবাদে বিবেকানন্দের নিজের কথা অনেক ছিল।

ধর্ম মহাসভার বিজ্ঞান শাখার প্রেসিডেন্ট ছিলেন মারউইন মেরী স্নেল। স্বামী বিবেকানন্দের একজন অনুরাগীও হয়ে ওঠেন তিনি। সেই সূত্রে তিনি হিন্দুধর্মেরও একজন অনুরাগী হয়ে ওঠেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। চিকাগোবাসী এই ভদ্রমহিলাকে দিয়ে বিবেকানন্দ একটি চিঠি লিখিয়ে নেন। তাতে উচ্চ প্রশংসা ছিল বিবেকানন্দের। সেই চিঠি কলকাতার 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় প্রকাশ হলে একটু সোরগোল সৃষ্টি হয়। এই চিঠির কপি অন্য কাগজেও পাঠানো হয়। ফলে মাদ্রাজের 'হিন্দু' তে, এলাহাবাদের 'পাইওনিয়ার'এ, 'অমৃতবাজার পত্রিকায়', এবং লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় সেটি ছাপা হয়।

এটা হচ্ছে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রচারের একটা দিক। চিকাগো মহাসভায় 'অভূতপূর্ব' সাফল্যের ফলে বিভিন্ন স্থানে তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। সেই সংবাদ আবার দেশ ও বিদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই অভিনন্দনের পরিকল্পনা একান্তই বিবেকানন্দের নিজস্ব। 'ধুম মচানোর' ব্যাপারটা বিবেকানন্দ খুব ভালোভাবেই করেছিলেন।

তবে কি বিবেকানন্দ শুধু নিজের ঢাক পিটিয়েই বড় হয়েছেন? এর উত্তর একটি সুস্পষ্ট না। তিনি বিদেশে যা করেছেন তা একজন সফল অধ্যাপকের কাজ। সফল অধ্যাপকেরা তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই তথ্য অনুযায়ী বক্তৃতার পরিকল্পনা করেন, এবং শেষে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সফলভাবে বক্তৃতা দেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণা খুব বেশী ছিল না। কিন্তু তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী দুটি ভাষাই খুব ভালো জানতেন। দেশ ও বিদেশ থেকে তিনি হিন্দুধর্মের যাবতীয় পুস্তক সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহের কাজ ১৮৯৫ এর মাঝামাঝি নাগাদ শেষ হয়। এরপর তিনি বেদান্ত ও যোগ সম্বন্ধে ক্লাস নিতে আরম্ভ করেন। সেই ক্লাসের নোট থেকে পরে যোগ ও বেদান্ত সম্বন্ধে ছোট বড় প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধগুলি পুস্তকের রূপ দেন। সেই পুস্তকগুলি পরে বিখ্যাত হয়—বিশেষ করে 'রাজযোগ' ও 'বাস্তবজীবনে বেদান্ত'।

১৮৯৫ এর গরমে বিবেকানন্দ ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা চলে গেলেন সহস্র দ্বীপোদ্যানে। জায়গাটা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মাঝখানে ওয়েলেসলী দ্বীপে। সেখানে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বেদান্ত নিয়ে ক্লাস নিলেন। পড়ালেন দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দুজন, মিস মেরী লুই ও ল্যান্ডসবার্গ তাঁর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। ১৮৯৫ এর ৭ই জুলাহ দীক্ষিত হলেন মেরী লুই ও ২২ শে জুলাই ল্যান্ডসবার্গ। মেরী লুই এর নাম হলো অভয়ানন্দ এবং ল্যান্ডসবার্গের নাম হলো, কৃপানন্দ।

একটি প্রতিবেদন থেকে আমেরিকার পটভূমিকায় সমকালীন বিবেকানন্দকে পাওয়া যেতে পারে :

মানুষটি নিজে

স্বামী বিবেকানন্দ একজন খাঁটি হিন্দু। বাঙ্গলা প্রদেশে তেত্রিশ বছর আগে জন্মেছেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। সেখানেই তিনি সাবলীল ইংরেজী বলতে শেখেন। তাঁর অতীত জীবন সম্পর্কে তিনি কখনও কথা বলেন না, কেবল সাধারণভাবে তাঁর মহান আচার্যের সম্বন্ধে বলেন, যিনি তাঁকে ধর্মের মতবাদ ও ক্রিয়াগুলি শিখিয়েছিলেন;ওগুলিই তিনি এখন এ দেশে প্রবর্তন করতে চান।

স্বামীর ব্যক্তিত্ব তাঁর ছবি থেকে বেশ ভালোই আঁচ করা যায়। তাঁর গায়ের রং বেশ কালো, উচ্চতায় তিনি সাধারণের থেকে খানিক লম্বা এবং বেশ ভারী চেহারা। তাঁর ব্যবহার খুবই আকর্ষণীয়, এবং তাঁর যথেষ্ট পরিমাণে ব্যক্তিগত চৌম্বকত্ব আছে। তাঁর ক্লাসে বসা নরনারীর বিহ্বল মুখগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, কেবল তাঁর আলোচনার বিষয় বস্তুগুলিই তাঁদের আগ্রহের বস্তু নয় বা তাদের ধরে রাখেনি।

বর্তমানে তাঁর লেকচার ও ক্লাসগুলি যদিও জনপ্রিয়, এবং পড়ুয়াদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, স্বামীর ঘোষিত শিষ্য মাত্র দুজন। এঁরা দুজনেই তাঁদের নাম বদলেছেন এবং একটি করে সংস্কৃত নাম নিয়েছেন, যে নামগুলির আগে স্থাপিত 'স্বামী' শব্দের অর্থ লর্ড বা আচার্য। এই দুই শিষ্যই বিদেশাগত আমেরিকান এবং একজন নিউ ইয়র্কেভালোই পরিচিত।

স্বামী অভয়ানন্দ একজন ফরাসী মহিলা, তবে তিনি পঁচিশ বছর নিউ ইয়র্কে আছেন, ও আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর ইতিহাস আজব। পঁচিশ বছর ধরে উদার মহলে তিনি একজন জড়বাদী সোস্যালিস্ট হিসাবে পরিচিত। বারো মাস আগে তিনি ম্যানহাটন লিবারাল ক্লাবে একজন গুরুত্বপূর্ণ সভ্যা ছিলেন। সেই সময় সংবাদপত্রের কাছে তাঁর নাম ছিল ম্যাডাম মেরী লুই, একজন নির্ভীক প্রগতিশীল উন্নত মহিলা, যাঁর বড়াই ছিল যে তিনি যুদ্ধের প্রথম সারিতে থাকেন এবং সময়ের তুলনায় অনেক এগিয়ে।

দ্বিতীয় শিষ্যটিও একজন উৎসাহী। সব মানুষের সঙ্গে বিবেকানন্দ যে নিপুণভাবে ব্যবহার করেন, একই নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি তাঁর প্রথম শিষ্যদের বেছেছেন। স্বামী কৃপানন্দ এই মণ্ডলে দারিদ্র্য ও ব্রহ্ম চর্যের ব্রত নেওয়ার আগে নিউ ইয়র্কের এক সংবাদপত্রের দপ্তরে কর্মী ছিলেন। জন্মসূত্রে তিনি একজন রূশ ইহুদী, নাম লিয়ন ল্যান্ডসবার্গ। তিনি মাঝবয়সী, উচ্চতায় মাঝারী, মাথায় একঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল এবং তাঁর এক জোড়া চোখে নিশ্চিতভাবে জ্বল জ্বল করছে একজন ধর্মান্ধের আগুন।"

এই দুজনেই ছিলেন নিষ্ঠাবান কর্মী, কিন্তু বিবেকানন্দ কাজের থেকে ব্যক্তিগত আনুগত্য বেশী পছন্দ করতেন। ফলে দুজনেই শেষ পর্যন্ত দূরে সরে যায়।

চিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের মূল আশ্রয়স্থল

আমেরিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোর সময় বিবেকানন্দের হেডকোয়াটারর্স ছিল হেল পরিবারের ৫৪১ ডিয়ারবর্ন অ্যাভিনিউ এর বাড়িটি। একটি চিঠিতে বিবেকানন্দ এঁদের বিষয়ে রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন, "ঐ যে জি ডব্লিউ হেল এর ঠিকানায় চিঠি দাও, তাদের কথা কিছু বলি। হেল আর তার স্ত্রী, বুড়ো-বুড়ি। দুই মেয়ে দুই ভাইঝি, এক ছেলে। ছেলে রোজগার করতে দোসরা জায়গায় থাকে। মেয়েরা থাকে ঘরে। এদের দেশে মেয়ের সম্বন্ধেই সম্বন্ধ। ছেলে বে করে পর হয়ে যায়। মেয়ের স্বামী ঘন ঘন স্ত্রীর বাপের বাড়ি যায়। এরা বলে, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ছেলে ছেলে থাকে, মেয়েরা মেয়ে থাকে জীবনভর। চারজনই যুবতী, বে থা করে নি। বে হওয়া এদেশে বড়ই হাঙ্গাম। প্রথম, মনের মত বর চাই। দ্বিতীয় পয়সা চাই। ছোঁড়া বেটারা ইয়ার্কি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়িরা নেচে কুঁদে একটা স্বামী যোগাড় করে, ছোঁড়া বেটারা ফাঁদে পা দিতে বড়ই নারাজ। এইরকম করতে করতে একটা লভ্‌ হয়ে পড়ে—তখন সাদি হয়। এই হল সাধারণ—তবে হেলের মেয়েরা রূপসী, বড়মানুষের ঝি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী—নাচতে গাইতে পিয়ানো

বাজাতে অদ্বিতীয়া—অনেক ছোঁড়া ফেঁ ফেঁ করে—তাদের বড় পসন্দয় আসেনা। তারা বোধ হয় বে থা করবে না—তার উপর আমার সংস্রবে ঘোর বৈরিগ্যি উপস্থিত । তারা এখন ব্রহ্ম চিন্তায় ব্যস্ত। মেয়েরা আমাকে দাদা বলে আমি তাদের মা কে মা বলি। আমার মালপত্র সব তাদের বাড়িতে— আমি যেখানেই যাই না কেন।"

এই চার হেল বোন ছিলেন, মেরী হেল, হ্যারিয়েট হেল, হ্যারিয়েট ম্যাককিন্ডলী ও ইজাবেল ম্যাককিন্ডলী। হ্যারিয়েট ম্যাককিন্ডলী ছিলেন বিবেকানন্দের চেয়ে বড়, আর, হ্যারিয়েট হেল ছিলেন বিবেকানন্দের চেয়ে বছর দশেকের ছোট। সুতরাং মেরী হেল ও ইজাবেল ম্যাককিন্ডলীর সঙ্গে বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গতা ছিল বেশী। ১৮৯৪ এর গ্রীষ্মকালটা (প্রায় চল্লিশ দিন) বিবেকানন্দ হেল বোনেদের সঙ্গেই কাটান। হেল বোনেদের সঙ্গে বিবেকানন্দের সম্পর্ক একটা রোমান্টিক পর্যায়ে উন্নীত হয়। তার প্রমাণ কিছু চিঠিপত্রে রয়ে গিয়েছে। ঐ গ্রীষ্মের পর তিনি যখন চিকাগো ছেড়ে যান, তখন অনুপস্থিত হেল বোনেদের জন্য তিনি একটি চিঠি লিখে যান। সেই চিঠিতে এক জায়গায় আছে: It is impossible to express my pain—my anguish—at being separated from noble and sweet and generous and holy ones.

আর একটু পরে শ্রীরামকৃষ্ণের হোমাপাখির গল্পের কথামত আছে, Come up—young ones of the bird of paradise—before your feet touches this cess-pool of corruption, this world and fly upwords.

পরের চিঠিতে আছে, "তোমার ওসব বাজে জিনিষ তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও—আমাকে আমার প্রিয়তমের একটি চুম্বন পাঠিয়ে দাও—পারো কি?"

চিঠির শেষ দিকে আছে, "তুমি কি জানো না জগতের প্রভু প্রেমের ক্রীতদাস?"

"তুমি কি জানো না জগতের চালক বৃন্দাবনে গোপীদের নুপুর-ধ্বনির সঙ্গীতের তালে তালে নাচতেন?"

হেল বোনদের সঙ্গে পিকনিক ও থিয়েটারেও গিয়েছিলেন বিবেকানন্দ।

ঐ বছর জুলাইয়ের শেষের দিকে সোয়াম্পনস্কট নামে সমুদ্রতীরবর্তী একটি শহরে গিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। সেখান থেকে হেল বোনেদের লেখেন,"তোমরা ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছ তো? বেশ হয়েছে, গরমে ভাজা হয়ে যাচ্ছ। আঃ এখানে কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা! যখন ভাবি তোমরা চারজনে গরমে ভাজা পোড়া সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছো আর আমি এখানে কি তোফা ঠাণ্ডা উপভোগ করছি, তখন আমার আনন্দ শতগুণে বেড়ে যায়। হু-উ-উ-উ-উ-উ-উ-উ!"

প্রথম থেকেই বিবেকানন্দের বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে নিউ ইয়র্কে একটি বেদান্ত সোসাইটির পত্তন হয়। চার জন আমেরিকাবাসীই এর বিভিন্ন কর্মকর্তা হন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মঠ ও সারদা মায়ের আবাস নির্মাণ করার জন্য আমেরিকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে চষে বেড়িয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তাঁর সফলতার চাবিকাঠি ছিল এক কাল্পনিক খ্রিষ্টের প্রশংসা, যা একমাত্র কেশবসেনী ব্রাহ্মরাই করতে পারে। এই খ্রিষ্ট বাইবেলের খ্রিষ্ট নন। খ্রিষ্টের প্রশংসার বিনিময়ে বিভিন্ন চার্চে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার অবাধ সুযোগ মিলেছিল। সব পাদ্রীরাই কল্পনা করতেন এমন খ্রিষ্ট অনুরাগী মানুষ একসময় নিশ্চয় খ্রিষ্টের স্মরণ নেবেন।

ওদিকে লণ্ডন থেকে ইংলন্ড যাওয়ার আমন্ত্রণ আসছিল। তাঁকে ইংলন্ড আসার জন্য অনুরোধ এসেছিল এডওয়ার্ড টি স্টার্ডি ও মিস হেনরিয়েটা মূলারের কাছ থেকে। এঁরা আগে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। সেই অনুযায়ী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট মিঃ লেগেটের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারিস রওনা হয়ে যান। উপলক্ষ ছিল একটি বিয়েতে যোগদান। কিছুদিন প্যারিস দেখার পর বিয়ের পরদিনই লন্ডনে চলে যান বিবেকানন্দ। ১০ ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন স্টেশনে নামলে স্টার্ডি তাঁকে নিয়ে ক্যাভারসামে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। ক্যাভারসাম লন্ডন থেকে ৩৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে টেমস নদীর তীরে। টেমস নদীর অপর পারে বড় শহর রিডিং। সেখানে স্টার্ডির পূর্বপুরুষরা থাকতেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে স্টার্ডির সংযোগ বেশীদিনের নয়; ১৮৯৫ এর মার্চে স্টার্ডি বিবেকানন্দকে প্রথম চিঠি দেন। ১৮৮৫ তে স্টার্ডি থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং মাদ্রাজে গিয়ে তার নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু ১৮৯৪ তে লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেট কাগজে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির কিছু ধোঁকাবাজির সংবাদ প্রকাশিত হলে স্টার্ডি তার সংস্রব ত্যাগ করেন।

ইংল্যান্ডে বিবেকানন্দের প্রথম বক্তৃতা ১৮৯৫ এর ১৭ই অক্টোবর হেনরিয়েটা মুলারের মেডেনহেড টাউন হলে। পাঁচদিন পরে লণ্ডনে ২২ শে অক্টোবর প্রিন্সেস হলে তিনি বক্তৃতা দেন। প্রথম বক্তৃতাতেই সংবাদপত্রের নজর কাড়লেন বিবেকানন্দ। লন্ডন স্ট্যান্ডার্ড কাগজ লিখলো :

"গত রাতে এক ব্রাহ্মণ প্রিন্সেস হলে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর এক কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া ভারতবাসীদের মধ্যে এমন উৎকৃষ্ট বক্তা ইংলন্ডের মঞ্চে আসেন নি। ......স্বামী বিবেকানন্দ সোয়া একঘন্টা একেবারে নির্ভুল ইংরেজীতে তাঁর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দর্শনের মুখ্য মতবাদগুলি বলেন, যেগুলির সেবায় উৎসর্গ করেছেন তাঁর জীবন। ....বক্তৃতাটি ছিল প্রস্তুতিবিহীন, তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর, দ্বিধাগ্রস্ততাবিহীন।"

ইংলন্ড আমেরিকার তুলনায় অনেক গরীব দেশ। এখানে পয়সা খরচ করে বক্তৃতা শোনার লোক অল্প। সুতরাং বিবেকানন্দকে নিজের খরচ নিজে চালাতে হতো। স্টার্ডি লেকচার সংক্রান্ত খরচ-খর্চা চালাতেন। নভেম্বরের ১০ তারিখে মর্টিমার মার্গেসন ও ইসাবেল মার্গেসনের বাড়িতে এক ঘরোয়া সভা ছিল। ইসাবেল তাঁর ২২ শে অক্টোবরের বক্তৃতা শুনেছিলেন। এই

ঘরোয়া সভায় জনা পনেরো শ্রোতা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিস মার্গারেট নোব্‌ল। তিনি ২৮ বছর বয়সী শিক্ষয়িত্রী ও সাংবাদিক।

বিবেকানন্দের এবারের লন্ডন প্রবাস ছিল স্বল্পদিনের। তাঁর লন্ডন প্রবাসের সময় আমেরিকার বেদান্ত সোসাইটিতে বিবেকানন্দের দুই সন্ন্যাসী শিষ্য কৃপানন্দ ও অভয়ানন্দ বেদান্ত শিক্ষা দিচ্ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য অ-সন্ন্যাসী বেদান্ত সোসাইটির অনুরাগীদের সঙ্গে তাঁদের প্রায়ই সংঘাত লাগছিল। বিশেষ করে সারা ওয়াল্ডো এমারসন এবং সদ্য আবিষ্কৃত স্টেনোগ্রাফার জোসিয়া জন গুডউইনের সঙ্গে।

সুতরাং ১৮৯৫ র ২৭ শে নভেম্বর লিভারপুল থেকে নিউ ইয়র্কগামী জাহাজে ওঠেন বিবেকানন্দ।

এবার নিউ ইয়র্কে ফিরে বিবেকানন্দ কর্মযোগ নিয়ে বক্তৃতাবলী শুরু করলেন। এইসব বক্তৃতাবলী শোনার জন্য বিভিন্ন সভায় প্রচুর ভিড় হতে লাগলো। তাঁর বক্তৃতা টুকে রাখার জন্য গুডউইন নামক এক স্টেনোগ্রাফার নিযুক্ত করা হয়েছিল। ফলে বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী থেকে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত হলো। আগেই বিবেকানন্দের মুখ থেকে শুনে শুনে 'রাজযোগ' পুস্তকটি ওয়াল্ডো নাম্নী এক মহিলা লিখেছিলেন। এই পুস্তকগুলি প্রকাশিত হওয়ার পরে ভারতের ধর্মাবলী সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেল; এমনকি চাহিদা বেড়ে গেল বিভিন্ন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের লেখা ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত বইয়েরও। এই পরিস্থিতিতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বেদান্তদর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান জানালেন।

আমেরিকার সমস্যা সমাধান করে বিবেকানন্দ ১৮৯৬ এর ১৪ ই এপ্রিল লন্ডন যাত্রা করলেন। তার আগে বিবেকানন্দের নির্দেশ অনুযায়ী সারদানন্দ ১ লা এপ্রিল লন্ডনে এসে স্টার্ডির গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দিন কয়েক বাদে বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত এসে সেই স্টার্ডির বাড়িতেই আশ্রয় নিলেন। বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল, মহেন্দ্রনাথ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হবেন। তা হয় নি। দেশে ফিরে মহেন্দ্রনাথ চাকরী বাকরী কিছুই করেন নি। বিয়েও করেন নি।

স্টার্ডি সেন্ট জর্জেস রোডে লেডী মার্গেসনের বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন বিবেকানন্দের থাকার জন্য। এপ্রিল মাসে মিস হেনরিয়েটা মূলারের বাড়িতে কয়েকদিন থাকার পরে সেন্ট জর্জেস রোডের বাড়িতে চলে আসেন।

ম্যাক্স মূলারের সঙ্গে বিবেকানন্দের পত্রালাপ আগেই হয়েছিল। ২৮ শে মে ১৮৯৬ বিবেকানন্দ অক্সফোর্ডে ম্যাক্স মূলারের বাড়িতে যান ম্যাক্সমূলারের দর্শনে। সঙ্গে ছিলেন স্টার্ডি। মূলার বিবেকানন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জানান শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হিসাবে। সেখানেই তাঁরা সমাপন করেন মধ্যাহ্ন ভোজ। মূলার তাঁদের বডেলিয়ান লাইব্রেরীতেও নিয়ে যান। তারপর দিনশেষে অতিথিদের তুলে দেন ট্রেনে।

মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত লণ্ডনে অনেক ক্লাস নিলেন বিবেকানন্দ। তারপর সেভিয়ার দম্পতি ও হেনরিয়েটা মূলারের সঙ্গে চলে গেলেন ইউরোপ পরিভ্রমণে। ক্যালে, প্যারিস হয়ে জেনেভায়। আল্পস পর্বত দেখলেন; ঘুরে বেড়ালেন তুষারাবৃত পাহাড়ে। তারপর লুসার্ন, হাইডেলবার্গ, কলোন, বার্লিন। পৌঁছলেন বাল্টিক সাগরের তীরে। এই ভ্রমণের শেষের দিকে ব্লাক সীর তীরে কিয়েল শহরে ভারততত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ ডয়সনের সঙ্গে দেখা করেন বিবেকানন্দ। ডয়সনের সঙ্গে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার ডয়সনের আত্মকথা থেকেই শোনা যাক :

"৯ ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ আমার কন্যা এরিকার দ্বিতীয় জন্মদিনে ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের আমাদের ভবনে আগমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। এই স্বামীকে শিকাগো মেলায় কিছু লোক একজন ভারতীয় সাধুর নিদর্শন রূপে পাঠিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে ভারতের দুই বন্ধু মিস মূলার ও মিঃ স্টার্ডি তাঁকে লন্ডনে এনে তাঁর বেদান্ত সম্পর্কীয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা এরপর তাঁকে সুইজারল্যান্ডে বিশ্রাম নেবার জন্য পাঠান। সেখান থেকে তিনি আসার আগে জিগেস করেন, আমি বাড়ি থাকবো কিনা। সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে তিনি সেভিয়ারদের সাথে কিয়েলে পৌছান। কিয়েলের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি আমি তাঁদের ঘুরিয়ে দেখাই;তাঁদের পরামর্শ দিই একদিন হামবুর্গ ঘুরে দেখার। এরপর আমি তাদের সঙ্গে আবার যোগ দিই ব্রেমেনে। সেখান থেকে সবাই পাড়ি দিই ইংলন্ডে। ১২ ই সেপ্টেম্বর ব্রেমেন থেকে আমস্টারডাম রওয়া হই আমরা।

ইংরেজদের প্রথামত আমার সঙ্গীদের প্রচুর মালপত্র ছিল। আমরা একজন মালবাহককে নিয়োগ করে তার সাহায্যে আমস্টারডাম রেল স্টেশনের বিপরীত দিকে একটি বড় হোটেলে গেলাম। যেহেতু আমার সঙ্গীরা কেউই ডাচ বা জার্মান ভাষা জানতেন না, আমাকেই হোটেলের দরদস্তুর করতে হলো। আমি একটি ডবল বেডেড ও দুটি সিঙ্গল বেডেড রুম চেয়েছিলাম। কিন্তু পাওয়া গেল দুটি ডবল বেডেড রুম। অত মালপত্র নিয়ে অন্য হোটেল খোঁজা সম্ভব ছিল না। আমি বাধ্য হলাম সেই রাতটুকুর জন্য আমার প্রাচ্যদেশী বাদামী ভাইয়ের সঙ্গে একটা রাত্রি বাস করতে। এটা বেশ শঙ্কার কারণ ছিল। কারণ, সম্প্রতি ভারতে বেড়াতে গিয়ে ভারতীয় আদবকায়দা সম্বন্ধে যা জেনেছিলাম, তা আমার স্মৃতিতে জাগরূক ছিল।

ঘুমোবার জন্য আমরা যখন ঘরে ঢুকলাম, সাধু পুরুষটির প্রথম কাজ হলো, একটা ছোট ইংলিশ পাইপ ধরানো। ঘরের দরজা ও জানালা খুলে দিয়ে তাঁকে একটা ছোট লেকচার দেওয়া ছাড়া আমি গত্যন্তর দেখলাম না। বললাম ধোঁয়াভর্তি ঘরে শোওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে কতো ক্ষতিকর।

তিনি সংস্কৃত খুব ভালো বলতে পারতেন। এবং সমভাবে ইংরেজীও। মানুষটা হাসিখুশি ও চালাকচতুর স্বভাবের, কিছুটা হঠকারী স্বভাবের। উত্তম স্বাস্থ্যের লাল গালওয়ালা পুরুষ। সাধু সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, তা থেকে অনেকটা পৃথক।

তবে নিশ্চিতভাবে এই ভারতীয় সাধুরা জাতপাতের উর্দ্ধে। তাঁরা মাংস খান, মদও পান করেন। পরের দিন আমরা যখন একটি রেস্টুরেন্টে গেলাম, প্রচণ্ড দামের জন্য আমরা একটি পদই খেলাম; উনি দুটি পদ খেলেন। যেহেতু সাধু হিসাবে তাঁর অর্থ রাখার কথা নয়, ইংরেজ দম্পতিই সব খরচ দিলেন।

আমি একবার বলেছিলাম, "আপনি তো আজব ধরণের সাধু, আপনি খান ভালো, পান করেন ভালো, সারাদিন ধুমপান করেন, নিজেকে কিছু থেকেই বঞ্চিত করে না।"

তিনি সংস্কৃতে উত্তর দিলেন, "আমি আমার শপথগুলি মেনে চলি।"

"আপনার শপথগুলি কি?" আমি শুধিয়েছিলাম।

" তা শুধুমাত্র কাম-কাঞ্চন বিরহ, যৌনতা ও টাকা পয়সা বর্জন।"

অর্থ ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল, কারণ, অন্যেরাই তাঁর খরচ দিতেন। যৌনতা সম্পর্কে তাঁর অঙ্গীকার আমি বিশ্বাস করি, যেমন স্বাস্থ্যবান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীরা দৈহিক প্রলোভনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে থাকেন।"

১৭ই সেপ্টেম্বর লন্ডনে ফিরে এসে ৬ই অক্টোবর থেকে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিবেকানন্দ যে ক্লাস ও সাধারণ বক্তৃতাগুলি দেন সেগুলির দ্রুতলিখন করেছিলেন গুডউইন। এই বক্তৃতাগুলি ছিল অসাধারণ। 'লন্ডন ডেলী গ্রাফিক' পত্রিকায় বিবেকানন্দকে প্রশংসা করে একটি দীর্ঘ লেখা প্রকাশিত হয় ২৮ শে অক্টোবর। এই সিরিজের বক্তৃতাগুলির উচ্চ গুণমানের কারণ কি? রাজাগোপাল এর কারণ নির্ণয় করেছেন তিনটি :

(১) অধ্যাপক পল ডয়সনের সঙ্গে বিবেকানন্দের শাস্ত্র আলোচনার প্রভাব। ১৮৮৭ তে ব্রহ্ম সূত্রের শংকর-ভাষ্যের জার্মান অনুবাদ ডয়সন প্রকাশ করেছিলেন।

(২) বিবেকানন্দ লন্ডনে ফিরে আসার পর স্বামী অভেদানন্দ কলকাতা থেকে উপস্থিত হন। এরপর দুই গুরুভাই একসঙ্গে হেনরিয়েটা মূলারের বাড়িতে থেকে শাস্ত্র আলোচনা করেন। অভেদানন্দ কলকাতা থেকে যজুর্বেদ, সামবেদ, বিভিন্ন ব্রাহ্মণ, বিভিন্ন সূত্র, যাস্কের নিরুক্ত ইত্যাদি হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ এনেছিলেন। এগুলি পড়ে তিনি গুরুভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন।

এই পর্যায়ে তাঁর বক্তৃতাগুলি সবই হয়েছিল ৩৯ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে স্টার্ডির ভাড়া করা তিনটি বড় বড় ঘরে।

এখানে স্টার্ডি সম্বন্ধে সামান্য বলা দরকার। বিবেকানন্দ স্টার্ডিকে ভালো রসদদার বলে ভেবেছিলেন। তিনি স্টার্ডির ঘাড়েই চাপিয়েছিলেন ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথকে। স্টার্ডি একদা নিউজিল্যান্ডে খেতখামার করে দু-পয়সা রোজগার করেছিলেন। সেই টাকা তিনি নানারকম সৎকাজে ব্যবহার করতেন। কিন্তু ঐ সময়ের কিছুদিন আগে স্টার্ডি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক নার্স তাঁকে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করেন। তারপর স্টার্ডি বিয়ে করেন ঐ নার্সকেই। তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্মায়। ফলে প্রৌঢ় স্টার্ডির ভাণ্ডারে টান পড়ে। তিনি সেভাবে দরাজ

হাতে আর অতিথি সেবা করতে পারছিলেন না। ফলত, বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাঁধে।

১৩ ই ডিসেম্বর লন্ডনে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা ও অনুরাগীরা একটি প্রশস্ত হলে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানায় । ১৬ ই ডিসেম্বর সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে ভারতের পথে পাড়ি জমান বিবেকানন্দ।

বিদেশ থেকে লেখা স্বামী বিবেকানন্দের চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ

(১) আমেরিকার মেটকাফ শহর থেকে আলাসিঙ্গাকে লেখা চিঠি, ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২০ শে আগস্ট :

"জানিয়া রাখো এই দেশ খ্রিষ্টানদের দেশ। এখানে আর কোনও ধর্ম ও মতের প্রতিষ্ঠা কিছু মাত্র নাই বলিলেই হয়। আমি জগতে কোনও সম্প্রদায়ের শত্রুতায় ভয় করি না। আমি এখানে মেরীতনয়ের সন্তানদের মধ্যে বাস করিতেছি;প্রভু ঈশাই আমাকে সাহায্য করিবেন। একটি জিনিস দেখিতে পাইতেছি, ইহারা আমার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় উদার মত ও ন্যাজারাথের অবতারের প্রতি ভালবাসা দেখিয়া খুব আকৃষ্ট হইতেছেন। আমি তাহাদের বলিয়া থাকি যে, আমি সেই গ্যালিলীয় মহাপুরুষের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বলি না, কেবল তাঁহারা যেমন যিশুকে মানেন, সেই সঙ্গে ভারতীয় মহাপুরুষদেরও মানা উচিত।"

আমরা এখানে কেশবচন্দ্রের খ্রিষ্টপ্রেমের বদগন্ধ পাচ্ছি।

(২) চিকাগো থেকে হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লেখা চিঠি;২৯ শে জানুয়ারী, ১৮৯৪

"যদি খ্রিষ্ট, কৃষ্ণ কিংবা বুদ্ধকে পূজা করিলে কোনও ক্ষতি না হয়, তবে যে পুরুষপ্রবর জীবনে চিন্তায় বা কর্মে লেশমাত্র অপবিত্র কিছু করেন নাই, যাহার অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অন্য সকল একদেশদর্শী ধর্মগুরু অপেক্ষা উর্দ্ধতর স্তরে বিদ্যমান—তাঁহাকে পূজা করিলে কী ক্ষতি হইতে পারে ?"

ক্ষতিটা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে: শ্রীরামকৃষ্ণের চেলারা নিজেদের হিন্দু বলতে অস্বীকার করেছে। কৃষ্ণর সঙ্গে খ্রিষ্টকে এক করা কেশবসেনী নির্বুদ্ধিতা।

"দর্শন, বিজ্ঞান বা অপর কোনও বিদ্যার সহায়তা না লইয়া এই মহাপুরুষই জগতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব প্রচার করিলেন যে, 'সকল ধর্মেই সত্য নিহিত আছে, শুধু ইহা বলিলেই চলিবে না, প্রত্যুত সকল ধর্মই সত্য। আর এই সত্যই জগতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।"

তত্ত্বটা শ্রীরামকৃষ্ণের নয়, কেশবচন্দ্রের। শ্রীরামকৃষ্ণ এই তত্ত্বের দ্বারা গ্রস্ত হয়েছিলেন মাত্র। সব ধর্ম সত্য—এটা একটা বড় মিথ্যা কথা। সেমীয় ধর্মগুলি এমন তত্ত্বে বিশ্বাস করে না; হিন্দু ধর্মও বিশ্বাস করে না কুধর্মে।

(৩) চিকাগো থেকে ১৯ শে মার্চ ১৮৯৪ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠি :

"একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম কুমারিকা অন্তরীপে মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুকরোয় বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে দর্শন শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। 'খালিপেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মুর্খতা; পাজী বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।"

এই চিঠি প্রদর্শন করছে আজ যাকে বিবেকানন্দ রক বলা হচ্ছে. যেখানে সমুদ্রের মাঝে রক টেম্পল বানানো হয়েছে, সেই পাথুরে দ্বীপে বিবেকানন্দ কোনওদিন সাঁতার কেটে যান নি। সাঁতার কেটে বিবেকানন্দের ঐ পাথুরে দ্বীপে যাওয়াটা নিতান্তই গল্প। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ একনাথ রানাডের নেতৃত্বে সারা ভারত থেকে চাঁদা তুলে ঐ মন্দিরটি বানিয়েছে। কিন্তু এরসঙ্গে বিবেকানন্দের সরাসরি সম্পর্ক নেই।

(৪) নিউইয়র্ক থেকে আলাসিঙ্গাকে লেখা চিঠি, ৯ই এপ্রিল, ১৮৯৪

'তবে আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসে পড়েছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে।"

বাঙ্গালী যুবকের আকাশকুসুম চিন্তা!

'(৫)চিকাগো থেকে অধ্যাপক রাইটকে লেখা, ২৪ শে মে ১৮৯৪ তারিখের চিঠি :

"একটা জিনিস আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি কখনই মিঃ মজুমদারের নেতার মতাবলম্বী হইনি। যদি মজুমদার এ কথা বলে থাকেন, তিনি সত্য বলেন নি।"

তিনি যিশু ভজনা কার কাছ থেকে শিখেছিলেন? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্ম সমাজ থেকে তো নয়? যিশু ভজনা, যা তিনি করেন সেটাতো একান্তই কেশবচন্দ্রীয়।

(৬) আলাসিঙ্গাকে লেখা চিঠি, চিকাগো থেকে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ শে মে :

"শহরের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকা নির্মিত কুটির ও হল প্রস্তুত কর। গোটা কয়েক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি জোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধার সময় সেখানে গরীব, অনুন্নত, এমনকি চণ্ডালগণকে পর্যন্ত জড়ো কর; তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম উপদেশ দাও, তারপর তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও।"

শ্রমিক-কৃষক জাতীয় মানুষেরা সারাদিন কি ধরণের পরিশ্রম করে সে সম্বন্ধে কোনওরূপ ধারণাই ছিল না বিবেকানন্দের। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে তাদের যাবতীয় ক্যালোরী খরচ হয়ে যায়; একেবারে ফাঁকা হয়ে যায় মাথা। তখন কোনও গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে তারা চিন্তা করতে পারে না। মস্তিষ্ক কাজই করে না। তখন তারা শুধুমাত্র কিছু খাদ্য চায়। অন্যকিছু তাদের বিরক্তি উৎপাদন করে।

বিবেকানন্দ এই ধরণের উপদেশ বহুজনকেই দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, কেউই তাঁর কথায় কান দেন নি।

(৭) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আলাসিঙ্গাকে লেখা ২১ শে সেপ্টেম্বরের চিঠি :

"সর্বসাধারণের ভেতর কাজ করার দরুণ ভুয়ো লোকমান্য তো যথেষ্ট হলো—আর কেন? আমার আর ও সবের একদম ইচ্ছা নেই।"

আত্মপ্রচারে নিরুৎসাহী!

(৮) মঠের সবার জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা : ২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

"আমি এখন মাদ্রাজীদের অভিনন্দন, যা এখানকার সব কাগজে ছেপে ধুমক্ষেত্র মোচে গিয়েছিল তারই জবাব লিখতে ব্যস্ত। যদি সস্তা হয় তো ছাপিয়ে পাঠাবো, যদি মাগগি হয় তো টাইপ করে পাঠিয়ে দেবো। তোমাদেরও এক কাপি পাঠাবো—'ইন্ডিয়ান মিররে' ছাপিয়ে দিও।"

দ্বিতীয় চিঠিতে দেখা যাচ্ছে স্বামী নাম যশের প্রত্যাশী, যদিও প্রথম চিঠিতে ঐ ব্যাপারে বৈরাগ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

(৯) ১৮৯৪ এর ২২ শে অক্টোবর আমেরিকা থেকে লিখছেন, "বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে প্রায় হরিসভা আছে। ঐগুলিকে ধীরে ধীরে লইতে হবে—বুঝিতে পারো কি না?"

উনিশ শতকের হিন্দুজাগরণের সময় শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণ প্রসন্ন সেন ও শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবরা যে হিন্দুজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন তার ফলে বাঙ্গলার বহু জায়গায় হরিসভা গড়ে উঠেছিল। এই সভাগুলিকে দখল করে 'যত মত তত পথ' বাদীদের আখড়া করার পরামর্শ দিচ্ছেন সাম্প্রদায়িক বিবেকানন্দ।

(১০) ওয়াশিংটন থেকে মিস মেরী হেলকে লিখছেন, "কেবল ভারত থেকে বোঝা বোঝা সংবাদপত্র আসায় বিরক্ত হয়েছিলাম। ....ভারতে খুব হই চই পড়ে গেছে। আলাসিঙ্গা লিখেছে, দেশ জুড়ে গ্রামে গ্রামে আমার নাম রটেছে। ফলে পূর্বকার সেই শান্তি আর রইল না। এর পর আর কোথাও বিশ্রাম বা অবসর পাওয়া কঠিন। ভারতের এই সংবাদপত্রগুলি আমাকে শেষ না করে ছাড়বে না দেখছি। কবে কি খেয়েছি, কখন হেঁচেছি—সব কিছু ছাপাবে।"

নিজেই ধুম মচাতে বলে এখন মিস হেলের কাছে ন্যাকামী করেছেন বিবেকানন্দ।

(১১) ওয়াশিংটন থেকে ১৮৯৪ এর ২৭ শে অক্টোবর আলাসিঙ্গাকে লিখছেন,

"তাহাদের একজন পাদরী যদি ভারতে যায়, আমাদের দেশের লোকেরা তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করে? তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ পর্যন্ত করো না, তাহারা যে ম্লেচ্ছ!!! বৎস কোনও ব্যক্তি — কোন জাতিই অপরকে ঘৃণা করিলে জীবিত থাকিতে পারে না। যখনই ভারতবাসীরা ম্লেচ্ছ শব্দটি আবিষ্কার করিল, ও অপর জাতির সহিতসর্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্বনাশের সূত্রপাত হইল"

একজন মানুষকে খ্রিষ্টান করার জন্য শুধুমাত্র তাকে দিয়ে উচ্চারণ করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন, 'আমি যিশুকে পরিত্রাতা বলে মনে করি।' তেমনই একজনকে মুসলমান করার জন্য শুধুমাত্র

তাকে দিয়ে তিনবার কালিমামন্ত্র উচ্চারণ করিয়ে নেওয়া দরকার। তা হলেই সে মুসলমান হয়ে যাবে। কিন্তু একজন মানুষকে হিন্দু করার তেমন কোনও উপায় নেই। মানুষে মানুষে সামাজিকভাবে মেলামেশা করার ফল বিবাহ। বিবাহের ফলে মানুষ ধর্মান্তরিত হয়। সুতরাং প্রচারবিমুখ হিন্দুরা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে নিজেদের দূরে রাখতে অপরকে ম্লেচ্ছ শব্দটি প্রয়োগ করতো। হিন্দুদের এই শম্বুকবৃত্তি নানা কারণে কমে আসার দরুণ হিন্দুরা খ্রিষ্টান ও মুসলমান হয়েছে ও হচ্ছে।

চলচ্চিত্র জগতে দেখা যাচ্ছে হিন্দু অভিনেত্রীরা মুসলমান অভিনেতাদের বিয়ে করে মুসলমানের গৃহিনী হচ্ছে। কিন্তু হিন্দু অভিনেতাদের মুসলমান অভিনেত্রীদের বিয়ে করার জন্য ধর্মান্তরিত হতে হচ্ছে। মুসলিম অভিনেত্রী মধুবালাকে বিয়ে করার জন্য কিশোর কুমারকে মুসলমান হতে হয়েছিল।

রামমোহন আলেকজান্ডার ডাফকে স্কুল করার জন্য বাড়ি দেখে দিয়েছিলেন। তার ফলে ডাফ স্কুলের মাধ্যমে বহু তরলমতি ছাত্রকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ধর্মান্তরকরণকে রুখতে শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথকে কোমর বেঁধে ডাফের বিরোধিতা করতে হয়েছিল।

সুতরাং যে পদ্ধতি একদা হিন্দুসমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করেছিল, সেই পদ্ধতিকে না বুঝে অযথা হিন্দুসমাজকে গালিগালাজ করছেন ব্রাহ্ম সূত্রের বিবেকানন্দ।

(১২) চিকাগো থেকে 'দেওয়ানজীকে' লিখিত চিঠি। নবেম্বর ১৮৯৪ :

'ভারতবর্ষে দরিদ্রদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা এতো বেশী কেন? এ কথা বলা মুর্খতা যে, তরবারীর সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তরগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। বস্তুতঃ জমিদার ও পুরোহিতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্যই উহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেই জন্য বাঙলাদেশে, যেখানে জমিদারদের বিশেষ সংখ্যাধিক্য, সেখানে কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যা বেশী।"

তৎকালীন ভারতে কেবলমাত্র বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবে গ্রামীণ মুসলমানদের সংখ্যা বেশী। বাকী ভারতে মুসলমানদের বাস মূলতঃ শহর ও শহরতলীতে। এই মুসলমানরা জমিদারদের অধীন ছিল না। আর সারা ভারতে পুরোহিত বলতে চাল কলা বাঁধা পুরোহিত বোঝায়। তাঁদের কি ক্ষমতা ছিল? যদি পুরোহিত ও জমিদারদের অত্যাচারই মুসলমান হওয়ার কারণ হতো, তাহলে বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলেই একটিও নিম্নবর্গের হিন্দু কৃষক পাওয়া যেত না। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সমাজ পুরোহিত ও জমিদার সমেত অনেক সংহত ছিল। সুতরাং বিবেকানন্দের ধারণা সঠিক ছিল না।

(১৩) আমেরিকা থেকে ১৮৯৪ এর ৩০ শে নভেম্বর আলাসিঙ্গাকে লেখা চিঠি :

"রামকৃষ্ণের অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কি পাগলামি হচ্ছে? আমার অদৃষ্টে সারা জীবন দেখছি—গরু তাড়ানো ঘুচলো না। মস্তিষ্কবিহীন আহাম্মকগুলো কেন যে এই বাজে

আজগুবিগুলো লেখে তা জানিও না, বুঝিও না। মদ কে ডি গুপ্তর ওষুধে পরিণত করা ছাড়া কি রামকৃষ্ণের জগতে আর কোনও কাজ ছিল না? প্রভু আমাকে কলকাতার লোকদের হাত থেকে রক্ষা করুন! কি সব লোক নিয়ে কাজ করতে হবে। যদি এরা শ্রীরামকৃষ্ণের একখানা যথার্থ জীবনচরিত লিখতে পারে—তিনি কি জন্য এসেছিলেন, কি শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, সেই দিক লক্ষ্য রেখে লিখতে পারে, তবে লিখুক। নতুবা এই সব আবোল তাবোল লিখে তাঁর জীবনী ও উপদেশকে যেন বিকৃত করা না হয়। এ সব লোক ভগবানকে জানতে চায়—এদিকে রামকৃষ্ণের ভেতর বুজরুকি ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না! খাজা আহাম্মকি! এ রকম আহাম্মকি দেখলে আমার রক্ত টগবগ ফুটতে থাকে।

কিডি তাঁর ভক্তি জ্ঞান ও ধর্ম সমন্বয়ের কথা, এবং অন্যান্য উপদেশ তর্জমা করুক না? এই লিখতে হবে তাঁর জীবনটা এক অসাধারণ আলোকবর্তিকা, যার তীব্র রশ্মিসম্পাতে লোকে হিন্দুধর্মের সমগ্র দিক বা রূপ সত্যসত্যই বুঝতে সমর্থ হবে। শাস্ত্রে যে সব জ্ঞান মতবাদরূপে রয়েছে, তিনি তাঁর মূর্ত দৃষ্টান্ত। ঋষি ও অবতারেরা যা বাস্তবিক শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তিনি নিজের জীবন দ্বারা তা দেখিয়ে গেছেন। শাস্ত্রগুলি মতবাদ মাত্র—তিনি ছিলেন তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এই ব্যক্তি তাঁর একান্ন বর্ষব্যাপী একটা জীবনে পাঁচ হাজার বছরের জাতীয় আধ্যত্মিক জীবন যাপন করে গেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাপ্রদ আদর্শরূপে আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন মত এক একটা অবস্থা বা ক্রম মাত্র, পরধর্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাবশূন্য হলেই চলবে না, আমাদের ঐ ধর্ম বা মতকে আলিঙ্গনও করতে হবে;সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি —তাঁর এই মতবাদ দ্বারা বেদের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রসমূহের সমন্বয় হতে পারে।এসব ভাব নিয়ে তাঁর একটি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী জীবনচরিত লেখা যেতে পারে।"

ব্রাহ্ম নরেন্দ্রনাথ এখানে তাঁর কেশবসেনী ধর্ম সমন্বয় তত্ত্ব দ্বারা প্রবলভাবে গ্রস্ত। তিনি ধ্বংসাত্মক 'যতমত তত পথ' প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পছন্দমতো শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী রচনা করার মতলব করছেন। তিনি খুঁটিয়ে বাইবেল পড়েন নি, কুরআন তো পড়েনই নি। কিন্তু আবোদা হয়ে কুপরামর্শ দিয়ে হিন্দুধর্ম নষ্ট করতে সচেষ্ট।

(১৪) চিকাগো থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ১৮৯৪ এর একটি চিঠি :

তোমায় বলি ভায়া, যেমন চলছে চলতে দাও, তবে দেখ, কোনও বাহ্য অনুষ্ঠানপদ্ধতি যেন একান্ত আবশ্যক না হয়, বহুত্বে একত্ব—সর্বজনীন ভাবের যেন কোনওমতে ব্যাঘাত না হয়, প্রয়োজন হয়, তবে সেই একটি ভাব —'সর্বজনীনতা' রক্ষার জন্য সমস্তই ছাড়িতে হইবে। আমি মরি আর বাঁচি, আর দেশে যাই বা না যাই, তোমরা বিশেষ করে মনে রাখবে যে, সর্বজনীনতা,—সকল ধর্মকে সত্য বলিয়া গ্রহণ, কেবল পরমতসহিষ্ণুতা নয়,—ইহাই আমরা প্রচার করি এবং । বিশেষ সাবধান, যেন অপরের ক্ষুদ্রতম অধিকারও পদদলিত করিয়ো না।"

সেমীয় ধর্ম সম্পর্কে দারুন অজ্ঞ বিবেকানন্দের সেই ধ্বংসাত্মক 'যত মত তত পথ' প্রচার।

(১৫)১৮৯৪ তে আমেরিকা থেকে লেখা আলাসিঙ্গাকে চিঠি :

"রামা শ্যামা খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে, এতে আমার কি এসে যায়? তারা যা খুশী তাই হোক না। কেন বিবাদ বিসংবাদের মধ্যে মিশবে? যার যা ভাই হোক না কেন, সকলের সকল কথা ধীরভাবে সহ্য কর, ধৈর্য, পবিত্রতা ও অধ্যাবসায়ের জয় হবে।"

'যত মত তত পথ' এ বিশ্বাসী বিবেকানন্দ মিশনারীদের ছলে বলে কৌশলে ধর্মান্তর রুখতে রাজী নন। মিশনারীরা শহুরে শিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে তর্কে মাতে না, বস্তিতে, গ্রামে গিয়ে অনপড় দরিদ্র মানুষদের ধর্মান্তরিত করে, এ বোধ বিবেকানন্দের ছিল না।

(১৬) চিকাগো থেকে এস সুব্রহ্ম ন্যম আয়ারকে লেখা চিঠি, ৩ রা জানুয়ারী, ১৮৯৫ :

"প্রথমে মাদ্রাজে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, ক্রমশঃ উহাতে অন্যান্য অবয়ব সংযোজন করিতে হইবে। আমাদের যুবকগণ যাহাতে বেদসমূহ, বিভিন্ন দর্শন ও ভাষ্যসকল সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা পায়, তাহা করিতে হইবে। উহার সহিত অন্যান্য ধর্মসমূহের তত্ত্বও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিদ্যালয়ের মুখপত্রস্বরূপ একখানি ইংরেজী ও একখানি দেশীয় ভাষায় কাগজ থাকিবে।"

ধনসম্পদে পরিপূর্ণ আমেরিকায় বসে দিবা স্বপ্ন দেখছেন বিবেকানন্দ। দরিদ্র দেশের মানুষরা লেখাপড়া শেখে দু'পয়সা রোজগার করার জন্য। তিনিই তাই করেছিলেন। বছরের পর বছর পরিশ্রম করে কে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যাবে, সে চিন্তা বিবেকানন্দ যেমন করেন নি, এই ধরণের বিদ্যালয় চালানোর খরচ কে বহন করবে তাও চিন্তা করেন নি। আর অন্য ধর্ম নিয়ে পড়াশুনা? ওল্ড টেস্টামেন্ট ভালোভাবে বুঝলে তিনি বা কেশবচন্দ্র সেন সেমীয় ধর্ম নিয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাতেন না।

(১৭) আমেরিকা থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা, ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে :

"রামকৃষ্ণ পরমহংস কোনও নতুন তত্ত্ব প্রচার করিতে আইসেন নাই—প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন বটে অর্থাৎ, তিনি ভারতের অতীত চিন্তার বিগ্রহ স্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য, তাহারা কি প্রণালীতে—কি উদ্দেশ্যে রচিত, তাহা আমি কেবল তাঁহার জীবন হইতেই বুঝিয়াছি।"

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নতুন তত্ত্ব হলো, 'অরূপের থাক' দেরও ব্রহ্ম উপাসনা করা সম্ভব, যা উপনিষদে অস্বীকার করা হয়েছে।

(১৮) আমেরিকা থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা ১৮৯৫ এর একটি চিঠি :

"এ সকল কথা বলার মানে এই যে, প্রাচীন কালে ঢের ভালো জিনিষ ছিল, খারাপ জিনিষও ছিল। ভালোগুলি রাখতে হবে, কিন্তু আসছে যে ভারত—ভবিষ্যতের ভারত প্রাচীন ভারতের অপেক্ষা অনেক বড় হবে। যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেদিন থেকে বর্তমান ভারতে

সত্যযুগের আবির্ভাব। আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

তাইতেই যখন তোমরা বল, রামকৃষ্ণ অবতার, আবার তারপরই বল, আমরা কিছুই জানি না, তখনই আমি বলি, মিথ্যাবাদী, চোর, ঝুট বিলকুল।"

রামকৃষ্ণের জন্ম থেকেই যদি সত্যযুগের আবির্ভাব হয়ে থাকে, রামকৃষ্ণ যদি অবতারই হয়ে থাকেন, তবে তিনি নিজে কেন পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নিতে গিয়েছিলেন?

এই চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্পর্কে তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যরা সবাই একমত ছিলেন না।

(১৯) ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫, ইংলন্ডের রিডিং থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা :

"দাদা না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়াটা একটা বড় ভুল কর্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম না হয় বাজেই গেল। মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়? .....হে ভাই, যিনি খাইয়ে পরিয়ে বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে মানুষ করলেন, যিনি আত্মার চক্ষু খুলে দিলেন, যাঁকে দিনরাত দেখলে যে জীবন্ত ঈশ্বর, যাঁর পবিত্রতা আর প্রেম আর ঐশ্বর্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণা মাত্র প্রকাশ, তাঁর কাছে নিমকহারামী!! তোর বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি তিন ভাগ গল্প বই তো নয়....অমন ঠাকুরের দয়া ভোল! কেষ্ট, যীশু জন্মেছিলেন কিনা, তার কোনই প্রমাণ নাই! আর সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখে তোদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়! ধিক্ তোদের জীবনে।"

এই পত্রাংশ থেকে প্রতীয়মান, ঠাকুরের ভক্ত হলেও ঠাকুরের অবতারত্ব সম্বন্ধে স্বামী ব্রহ্মানন্দের মতো মানুষদেরও সংশয় ছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁকে অবতার বানাবেনই। যদিও তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণকে ছেড়ে পওহারী বাবার শিষ্য হতে গিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, ঠাকুর রামকৃষ্ণ রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্য থেকেও বড়। বস্তুত ব্রহ্মানন্দদের বিবেকানন্দের মনোভাবই শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়। কারণ, খেলায় জিতেছিলেন বিবেকানন্দই।

(১৯) ১৮৯৫ এর অজানা তারিখে আমেরিকা থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠি:

"রামকৃষ্ণাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্যযুগোৎপত্তি হইয়াছে। .....ঠাকুরঘর অনেকের সহায়তা করে বটে, কিন্তু রাজসিক তামসিক খাওয়া দাওয়ার কোনও কাজ নাই। আঙ্গুল বাঁকানো এবং ঘন্টা নাড়ার কাজ কিঞ্চিৎ কমি করে কিঞ্চিৎ গীতা ও উপনিষদাদি পাঠ করিবে। অর্থাৎ জড়োপাসনা যত কম হয়, আধ্যাত্মিকতা যতই বাড়ে, এই কথা আর কি। সান্ডেল লিখছেন যে, হাজার হাজার লোক কেবল ঘন্টানাড়া দেখতে আসে। যদি এ কথা সত্য হয় তো ও প্রকার লোক না আসাই ভালো। ....দক্ষিণেশ্বরের ভটচায্যির জীবনচরিত—মাস্টার মহাশয় জানে, সুরেশ বাবু লেখে, 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' তারা এখনও দেখতে পায় নাই। দুনিয়া তাদের দক্ষিণেশ্বরের কুটুরি। হে প্রভু, হে প্রভু! তাঁর জীবনচরিত যে কেউ লিখবে, তাঁর সঙ্গে তোমরা নিজেদের জড়িত করো না।.....

"শাঁকচুন্নীর বই এইমাত্র পড়লাম। তাকে আমার লক্ষ-লক্ষাধিক প্রেমালিঙ্গন দিবে। তার কণ্ঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন। ধন্য শাঁখচুন্নী! শাঁখচুন্নী ঐ পুঁথি সবাইকে শোনাক। মহোৎসবে শাঁকচুন্নীর পুঁথি সকলের সামনে যেন পড়ে। পুঁথি অতি বড় যদি হয় তো চুম্বক চুম্বক করে যেন পড়ে। শাঁকচুন্নী একটাও আবোল তাবোল তো লিখে নাই। আমি তাঁর পুথি পড়ে যে কি আনন্দ পেয়েছি, তার আর কি বলবো। শাঁকচুন্নির পুঁথি যাতে খুব বিক্রি হয়, সকলে পড়ে চেষ্টা করবে। তারপর শাঁকচুন্নীকে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রচার করতে যেতে বলো। বাহবা, সাবাস শাঁকচুন্নী! সে তার কাজ করেছে। গাঁয়ে গাঁয়ে যাক, লোককে তার কথা শোনাক—এর চেয়ে তার আর কি ভাগ্য হবে? শশী, শাঁকচুন্নীর পুঁথি আর শাঁকচুন্নী নিজে, জনসাধারণে শক্তি সঞ্চার করবে। আরে মোর শাঁকচুন্নী, তোকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি ভাই। প্রভু তোর কণ্ঠে বসুন ভাই, দ্বারে দ্বারে তাঁর নাম শুনাও। সন্ন্যাসী হওয়ার আবশ্যক কিছুই নাই। শশী, জনসাধারণের মধ্যে সন্ন্যাসী হওয়া উচিত নয়। শাঁকচুন্নী বাঙ্গলার জনসাধারণের নিকট ভাবী বার্তাবহ। শাঁকচুন্নীকে খুব যত্ন করবে। তার বিশ্বাস ভক্তির ফল ফলেছে। শাঁকচুন্নীকে এই কটা কথা লিখতে বলো, তার তৃতীয় খণ্ডে, প্রচার খণ্ডে।

'বেদবেদান্ত, আর আর সব অবতার যা কিছু করে গেছেন, তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন না বুঝলে বেদবেদান্ত অবতার কিছু বোঝা যায় না—কেন না তিনি ব্যাখ্যাস্বরূপ ছিলেন। তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ ভেদ, ধনী-নির্ধন ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান ভেদ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ, সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদ ভঞ্জন—হিন্দু মুসলমান ভেদ, খ্রিশ্চান-হিন্দু ভেদ, ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদ লড়াই ছিল, অন্য যুগের;এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।"

স্বামী বিবেকানন্দের জঘন্যতম চিঠি এটি। প্রথমে তিনি প্রতিমাপূজার বিরোধিতা করেছেন, ব্রাহ্ম সত্তা দিয়ে প্রতিমাপূজাকে 'জড়োপাসনা' বলেছেন। তার জায়গায় বৃদ্ধি করতে বলেছেন আধ্যাত্মিকতা। এটিও ব্রাহ্ম সুলভ চিন্তা। ধর্ম শুধুমাত্র শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষদের জন্য নয়—ধর্ম আপামর জনসাধারণের সবার সম্পদ। উত্তর কলকাতাই বিবেকানন্দের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের ধর্মাচরণ সম্পর্কে কোনও ধ্যানধারণাই ছিল না। ভারতে যখন পর্যটন করেছেন তখন রাজারাজড়া আর কিছু মধ্যবিত্ত মানুষদেরই আশ্রয়ে থেকেছেন। সাধারণ মানুষের ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা তাঁর অজানা ছিল। প্রবৃত্তি ধর্ম আর নিবৃত্তি ধর্ম কি বস্তু এবং দুইয়ের মধ্যে কি পার্থক্য, সাধারণ মানুষ কি ধর্ম পালন করে সে সম্বন্ধে কোনও রকম ধ্যান-ধারণা ছিল না তাঁর। তাঁর ধারণা ছিল, প্রত্যেকের আত্মাই পরমাত্মা এই বোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে যাবতীয় বিভেদ মুছে যাবে। এ চিন্তা ছিল আকাশকুসুম। শুধুমাত্র এই বোধ দ্বারা পৃথিবী চালিত হতে পারে না। আরও নানাবিধ বোধ মানুষের চালিকা-শক্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই শেষে সারা পৃথিবী জুড়ে তখন খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তুরস্কে সাম্রাজ্য চালাচ্ছে শক্তিশালী অটোমান

তুর্কিরা। সেমীয় ধর্মাবলম্বীরা বেদান্তের নিকট আত্মসমর্পণ করবে—এ অসম্ভব চিন্তা; আমেরিকা-ইউরোপে তাঁর বক্তৃতায় যত মানুষই ভিড় করুক না কেন।

শাঁখচুন্নী হলেন অক্ষয়চন্দ্র সেন। তাঁর লেখা পুঁথির নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'। এখন অক্ষয় চন্দ্র সেন কী লিখেছেন তা দেখা যাক: তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দিয়ে পচা গরু খাইয়েছেন!

অদ্ভুত সাধনা নাহি আসে বুদ্ধিবলে।
একদিন প্রভুদেব পঞ্চবটমূলে।।
গঙ্গায়-জুয়ার দেখিছেন বসে বসে।
পচা মরা গরু এক ভেসে ভেসে আসে।।
সন্নিকটে কূলে লাগে তর। আঘাতে।
আইল কুকুর এক লাগিল খাইতে।।
বুঝি না কি ভাবে মগ্ন হইল নারায়ণ।
কুক্কুরের এক সঙ্গে আস্বাদনে মন।।
আরোপ করিলা নিজে তাহার শরীরে।
যতক্ষণ আস্বাদন বাসনা না পুরে।।

গোমাংস ভক্ষণের সঙ্গে ইসলামের সরাসরি কোনও সম্বন্ধ নেই। ইসলাম অনুযায়ী গোমাংস ভক্ষণ করা যায়, এইমাত্র। খ্রিষ্টানরা কিছু কম গোমাংস খায় না। তাছাড়া মুসলমানরা মরা পশুর মাংস খায় না। কলিযুগে গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ মহাপাপ। আমাদের অক্ষয়চন্দ্র *সেই মহাপাপের* ঘটনাই ঘটিছেন শ্রীঠাকুরের দ্বারা। সনাতন ধর্মের এতোবড় শত্রু আর কে *আছে!*

দক্ষিণেশ্বরের ভটচার্যি কোনও যুগান্তর সৃষ্টি করেন নি। তিনি ভালো গল্প বলতেন, এই পর্যন্ত। আর, তাঁর নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী, যে যা বলতো তাই করতেন। মহেন্দ্রনাথ দত্তের সাক্ষ্য অনুযায়ী, তিনি নরেন কে 'লরেন' বলতেন। আর তিনিই নাকি নামাজ পড়তেন! নামাজ পড়তে হয় আরবী ভাষায়; সে ভাষা উচ্চারণ করা ছিল তাঁর সাধ্যাতীত।

এই চিঠি থেকে স্পষ্ট, বিবেকানন্দ তাঁর নিজের পছন্দমতো শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিমা গড়তে চান। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গুরুভাইরা এগিয়ে এলেন এক কাল্পনিক ক্ষতিকর 'যত মত তত পথ' প্রতিষ্ঠা করার জন্য—নানা রকম মিথ্যা ও কাল্পনিক কথা বলে। এই প্রচেষ্টার আজও বিরাম নেই। যদিও আজ ভারতের বুকে ক্রিয়াশীল নানা জেহাদী দল।

স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগসন্ধানী গুরুভ্রাতা, যিনি মহেন্দ্রনাথ দত্তর অনুসরণে নিজের ভাইকে ইংলন্ডে শিক্ষালাভের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম সাধন সম্পর্কে লিখেছেন, "ইসলামধর্ম সাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘ শ্মশ্রু-বিশিষ্ট সুগম্ভীর জ্যোতির্ময় পুরুষপ্রবরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পরে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধিপূর্বক তূরীয় নির্গুণ ব্রহ্মে তাঁর মন লীন হইয়াছিল।"

এইসব লেখার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতার গঞ্জিকা সেবনের অবশ্যই প্রয়োজন ঘটেছিল। কারণ, ইসলাম ধর্মের উপাসনায় এমন কিছু ঘটে না। ইসলাম নিবৃত্তি ধর্ম নয়। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র না জেনে এমন বাঁদরামো করা হয়েছে।

বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সত্যযুগে বাস করলেও ১৮৯৬ 'র নভেম্বরে কিছুটা নেমে এসেছিলেন ঘোর কলিযুগে। ঐ সময় তিনি 'বাস্তব জীবনে বেদান্ত' (Practical Vedanta) বিষয়ে চারটি বক্তৃতা দেন ইংলন্ডে।

সেই বক্তৃতামালার মধ্যে তিনি বলেছিলেন, "কোনও ধর্ম হয়তো কিছু বীভৎস ব্যাপার ঘটতে আজ্ঞা দিল। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম তার অনুগামীদের অন্য ধর্মের মানুষদের হত্যা করতে অনুমোদন দিল। কুরআন এ এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, বিধর্মীদের হত্যা করো, যদি তারা মুসলমান হতে রাজী না হয়। তাদের আগুনের মধ্যে বা তরবারির তলে ফেলতে হবে।"

তিনি আরও বলেছিলেন, "একটা মানুষ যতো স্বার্থপর হবে, ততোই নীতিহীন হবে। কোনও জাতির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। যে জাতি নিজেই স্বার্থের নিগড়ে বাঁধা, সে জাতি সবচেয়ে পাজী হয় জগতে। আরবের পয়গম্বরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মতো কোনও ধর্মই এতো দ্বৈতবাদী নয়, এবং এই ধর্মের মতো কোনও ধর্ম এতো রক্তপাত করেনি এবং অপরের উপর এতো নিষ্ঠুর হয় নি। কুরআনে বলা হয়েছে, যে সব মানুষ কুরআনের শিক্ষাতে বিশ্বাসী নয়, তাদের হত্যা করবে। তাদের হত্যা করার অর্থ তাদের করুণা করা। বিধর্মীদের হত্যা করা হলো স্বর্গে যাওয়ার নিশ্চিত পদ্ধতি, যেখানে সুন্দরী হুরীরা এবং সমস্ত রকমের ইন্দ্রিয়সুখ আছে। এই ধরণের বিশ্বাসের জন্য পৃথিবীতে কতো রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে তা চিন্তা করো।"

বাস্তবজীবনে বেদান্ত তে ইসলাম সম্পর্কে কিছু উচ্চারণ করলেও কেশবসেনী ব্রাহ্ম খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর কথা উচ্চারণ করলেন, যা অসত্য।

স্বামী বিবেকানন্দের আর একটি কুকাজ হচ্ছে, হিন্দুধর্মের ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের অবতার শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে একরকম অস্বীকার করে তাঁদের জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ শে এপ্রিল ইংলন্ডের রিডিং থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন, '*মতামত সম্বন্ধে এই যে, যদি কেহ পরমহংসদেবকে অবতার ইত্যাদি বলে মানে উত্তম কথা, না মানে উত্তম কথা। সার এই যে, পরমহংসদেব চরিত্র সম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষা সম্বন্ধে সকলের সবচেয়ে উদার ও নতুন এবং প্রগতিশীল অর্থাৎ পুরানোরা সব এক ঘেয়ে—এ নূতন অবতার বা শিক্ষকের এই শিক্ষা যে এখন যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের উৎকৃষ্ট ভাব এক করে নূতন সমাজ তৈয়ারী করতে হবে। পুরানরা বেশ ছিলেন বটে, কিন্তু এ যুগের এই ধর্ম—একাধারে যোগ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম—আচণ্ডালে জ্ঞান ভক্তি দান—আবালবৃদ্ধবনিতা। ও সকল কেষ্ট বিষ্টু বেশ ঠাকুর ছিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণে*

একাধারে সব ঢুকে গেছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এবং প্রথম উদ্যোগীর পক্ষে নিষ্ঠা বড়ই আবশ্যক—"

অর্থাৎ, শিক্ষা দাও যে,অন্য সকল দেবকে নমস্কার, কিন্তু পূজা রামকৃষ্ণের। নিষ্ঠা ভিন্ন তেজ হয় না—তা না হলে মহাবীরের মতো প্রচার হয় না। আর ও সব পুরানো ঠাকুরদেবতা বুড়িয়ে গেছে—এখন নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নূতন বেদ। হে প্রভো, কবে এ পুরাতনের হাত থেকে উদ্ধার পাবে আমাদের দেশ। গোঁড়ামি না হলে কল্যাণ দেখছি কই?"

আমাদের স্মরণে রাখতে হবে গাজিপুরে গিয়ে পওয়ারী বাবার কাছে দীক্ষা নিতে গিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তখন তাঁর মনে পড়েনি, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। এখন একজন সন্ন্যাসী হিসাবে নিজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে শুধু অবতার বানাচ্ছেন তাই নয়, যে গীতা তিনি সর্বদা বহন করতেন এবং যে গীতার শিক্ষা তিনি প্রচার করেছেন, সেই গীতার রচয়িতাকে 'কেষ্ট' বলে তুচ্ছ করছেন। যেন গীতার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে!

জন্মাষ্টমী উত্তর ভারতের সবচেয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে পালনীয় হিন্দু উৎসব। কিন্তু আজকের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে জন্মাষ্টমী পালিত হয় না; কিন্তু বেলুড়ে যিশুখৃষ্টের জন্মদিন পালিত হয়। হিন্দু ভারতের এই অবস্থা করে ছেড়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসকরা আজ একটি নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে, যে সম্প্রদায় তাদের হিন্দুত্ব অস্বীকার করেছে।

ভারতে বিবেকানন্দ: কলম্বো থেকে আলমোড়া বক্তৃতাবলী

প্রায় চার বছর পরে যে বিবেকানন্দ ভাবতবর্ষের মাটিতে পা রাখলেন তিনি আর যে বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিকাগোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন তাঁর মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। এখন উদ্দীপ্ত বিবেকানন্দ আলেকজান্ডারের মতোই দিগ্বিজয়ী। গোটা পশ্চিমী জগৎ এখন অবনত তাঁর জ্ঞান গরিমার কাছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ এর পনেরোই জানুয়ারী কলম্বোয় অবতরণ করেন। প্রথম দিন একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে পরের দিন বিকালে 'ফ্লোরাল হল' একটি বক্তৃতা দেন। সেটি থেকেই কলম্বো থেকে আলমোড়া বক্তৃতাবলী শুরু হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষিত মানুষকে, যাঁরা মৃত্যুর পর'রামকৃষ্ণলোক' নামক একটি পৃথক স্বর্গে যাওয়ার প্রত্যাশী, যদি শুধান, বিবেকানন্দের কোন রচনা আপনাকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছে? তাহলে তিনি উত্তর দেবেন কলম্বো থেকে আলমোড়া বক্তৃতাবলী।

এই সমস্ত বক্তৃতাগুলিতে বিবেকানন্দের বক্তব্য পাশ্চাত্যে যা বলেছেন তার থেকে পৃথক কিছু নয়;সেই যত মত তত পথ, বেদান্ত, যোগশাস্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু এই বক্তৃতাবলী বোঝার জন্য উপনিষদ, যোগশাস্ত্র ইত্যাদির উপর বিলক্ষণ অধিকার থাকা প্রয়োজন। যারা এসব না বুঝেই বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন, বক্তৃতা তাঁদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেছে। কিন্তু তবুও মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁরা শুনে গেছেন বিস্ময় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ।

তবে শ্রোতার সংখ্যা যত বলা হয় তত হতো না। কোনও একটি হলে বা তাঁবুতে মানুষ সমবেত হওয়ার জন্য মানুষপিছু ১.৫ বর্গফুট স্থান প্রয়োজন। আবার, তখন মাইক্রোফোন আবিষ্কার হয় নি। কাজে কাজেই মানুষের গলার স্বর বহুদূর থেকে শোনা যেতে পারে না।

শুরুতে কলম্বোয় তিনি উল্লেখ করলেন 'শিবমহিম্নস্তোত্র' থেকে সেই শ্লোক, যা তিনি কলম্বাস হলে উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেছিলেন। বললেন, "ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইলেও সকলেই কিন্তু এক লক্ষ্যে চলিয়াছে। কেহ একটু বক্রপথে ঘুরিয়া, কেহ বা সরল পথে যাইতে পারে; কিন্তু অবশেষে সকলেই সেই এক প্রভুর কাছে পৌঁছিবে।"

"কাবার দিকে মুখ করিয়াই কেহ জানু অবনত করুক অথবা খ্রিষ্টীয় গীর্জায় বা বৌদ্ধ চৈত্যেই উপাসনা করুক, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে তাঁহারই উপাসনা করিতেছে।"

রামনাদেও তিনি ধ্বংসাত্মক 'যত মত তত পথ' এর কথা বললেন। বললেন, "যিনি শৈবদের শিব, বৈষ্ণবদের বিষ্ণু, কর্মীদের কর্ম, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, জৈনদের জিন, ঈশাহী ও য়াহুদীদের য়াভে, মুসলমানদের আল্লা, বৈদান্তিকদের ব্রহ্ম—যিনি সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রভু, সেই সর্বব্যাপী পুরুষের সম্পূর্ণ মহিমা কেবল ভারতই জানিয়া ছিল, প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব কেবল ভারতই লাভ করিয়াছিল, আর কোনও জাতিই প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই।"

কুম্ভকোনম বক্তৃতায় তিনি বললেন, "এই ভারতেই হিন্দুরা খ্রিষ্টানদের জন্য চার্চ ও মুসলমানের জন্য মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এইরূপই করিতে হইবে। তাহারা আমাদিগকে যতই ঘৃণা করুক, তাহারা যতই পাশব ভাব প্রকাশ করুক, তাহারা যতই নিষ্ঠুর হউক ও অত্যাচার করুক—তাহারা সচরাচর যেমন করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের প্রতি যতই কুৎসিত ভাষার প্রয়োগ করুক, আমরা খ্রিষ্টানদের জন্য গির্জা ও মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করিতে বিরত হইব না, যতদিন পর্যন্ত না প্রেমবলে উহাদের জয় করিতে পারি।"

কাছাখোলা কালিদাস আর কাকে বলে! নিরঙ্কুশবাদী সেমীয় ধর্মগুলি অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধ্বংস করে বিশ্বজুড়ে নিজেদের বিধাতার রাজত্ব কায়েম করতে চায়। তাদের এই অপচেষ্টায় নিজেদের বলি দিয়ে সাহায্য করতে চায় আমাদের কাছাখোলা নেতা।

কিন্তু এর পরে তাঁর চোখ যেন একটু একটু খুলতে লাগলো। মাদ্রাজে একটি বক্তৃতায় তিনি বললেন, "পুতুলপূজাকে লোকে গালি দেয়! কেন? কারণ, কয়েক সহস্র বছর বছর পূর্বে জনৈক য়াহুদী-বংশসম্ভূত ব্যক্তি পুতুলপূজার নিন্দা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি নিজের পুতুল ছাড়া আর সকলের পুতুলকে নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই য়াহুদি বলিয়াছিলেন, যদি কোনও বিশেষ ভাবপ্রকাশক বা পরমসুন্দর মূর্তি দ্বারা ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা মহাদোষ, মহা পাপ; কিন্তু যদি একটি সিন্দুকের দুই ধারে দুইজন দেবদূত, তাহার উপরে মেঘ—এইরূপ ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা মহা পবিত্র। ঈশ্বর যদি ঘুঘুর রূপ

ধারণ করিয়া আসেন, তবে তাহা মহা পবিত্র; কিন্তু তিনি যদি গাভীর রূপ ধারণ করিয়া আসেন, তবে তাহা হিদেনদের কুসংস্কার। অতএব উহার নিন্দা কর।"

এতদিন পরে দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দের একটু একটু চৈতন্য হচ্ছে। অল্প হলেও সেমীয় ধর্মের বীভৎস রূপ একটু একটু করে পরিস্ফুট হচ্ছে। কিন্তু এর আগেই তিনি সেমীয় ধর্মের সঙ্গে পবিত্র হিন্দুধর্মের 'যত মত তত পথ' করে বসেছেন। হাতের ঢিল হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। এখন অন্য কথা বললে কেউ শুনবে না। বস্তুত কেউ শোনেনি। শাকচুন্নী, ভূত প্রেত, সবাই 'যত মত তত পথ' করে শ্রীরামকৃষ্ণর জীবনী রচনা করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে 'সেকুলার অবতার' করে ছেড়েছে। শাকচুন্নীদের ক্ষতিকর প্রশ্রয় দেওয়ার ফল। বিবেকানন্দ কিন্তু এখনও বাইবেল পড়েন নি; কুরআন পড়া তো দূরস্থান। পড়লে সেমীয় ধর্মগুলি যে আসলে জমি দখলের তত্ত্ব তা বুঝতেন। কিন্তু স্বল্পস্থায়ী জীবনে আর সেগুলি নিষ্ঠভাবে পড়ার সময় পান নি।

শিয়ালকোটে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেন, "মুসলমানগণ বড় বড় সাধু মহাপুরুষদের পূজা করিয়া থাকেন, আর প্রার্থনার সময় কাবার দিকে মুখ ফেরান।"

এই বক্তব্য প্রমাণ করে বিবেকানন্দ ইসলামের কিছুই জানতেন না, অথচ নির্বোধের মতো 'মত যত মত তত পথ', 'সব ধর্মের মধ্যেই সত্য আছে' এইসব ক্ষতিকর বক্তব্য রাখতেন।

'বাস্তবজীবনে বেদান্ত'তে যেটুকু কুরআনের বাণীর উল্লেখ আছে তা রামমোহন রায়ের *তুহফাৎ মুহয়াহিদ্দিনের* ইংরেজী অনুবাদ থেকে সংগৃহীত।

এই ১৮৯৭ এ বেলুড় এ মঠের জন্য জমি কেনা হয়। মঠের নিয়মাবলীও রচনা করেন বিবেকানন্দ। এই নিয়মাবলী একটি গুপ্ত সম্পদ। এটি বাহিরের লোকদের দেখানো হয় না। কোনও বিবেকানন্দ রচনাবলীতে এটি নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের গেরুয়া পরা সাধুরা কেবল এই নিয়মাবলী পড়ার সুযোগ পান। আমরা এই নিয়মাবলী থেকে নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করছি :

ভারতবর্ষের কার্য্যপ্রণালী

১। মুসলমানগণ যখন এইদেশে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের ঐতিহাসিক মতে এই ভারতবর্ষে ৬০ কোটী হিন্দুর অধিবসতি ছিল। এই গণনায় অত্যুক্তিদোষ না থাকিয়া বরং অনুক্তি দোষ আছে, কারণ, মুসলমানদিগের অত্যাচারেই অনেক প্রজা ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটীরও অধিক ছিল; কিছুতেই ন্যূন নয়। কিন্তু আজ সে হিন্দু ২০ কোটীতে পরিণত হইয়াছে। তাহার উপর খ্রীষ্টানরাজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২ কোটী লোক খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে এবং প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষাধিক লোক খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে। এই হিন্দু জাতি ও ধর্ম্মের রক্ষার জন্যই করুণাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন।

২। জাতিবিভাগেই আমাদের সমাজ গঠিত। সকল সমাজই ঐ প্রকারে গঠিত। তবে আমাদের সমাজ ও অন্যান্য সমাজে কিছু প্রভেদ আছে।

৩। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে দুইটি মহাশক্তি নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। এই দুই মহাশক্তির সঙ্ঘর্ষেই জগতের বৈচিত্র ও লীলা সংঘটিত হইতেছে। মানবসমাজেও এই দুই শক্তি জাতি রূপ বৈচিত্র প্রতিনিয়ত উৎপাদন করিতেছে ও করিবে। এই বৈচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর ছায়ার ন্যায় অধিকারতারতম্য মানবসমাজে উপস্থিত হইতেছে।

৪। ঐ দুইটি শক্তির মধ্যে একটি অধিকারতারতম্যের অনুকুল ও দ্বিতীয়টী তাহার প্রতিকূলে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে।

৫। বৈচিত্র জগতের প্রাণ। এবং এই বৈচিত্ররূপ জাতি কখনও বিনষ্ট হইবার নহে। অর্থাৎ বুদ্ধি ও শক্তির তারতম্যে ব্যক্তিবিশেষে ক্রিয়ার বিশেষত্ব থাকিবেই। যথা, কেহ সমাজ শাসনে পারদর্শী কেহ বা পথের ধুলি পরিষ্করণে ক্ষমতাবান। এই বলিয়া সমাজ শাসনে পারদর্শী মানবেরই যে জগতের যাবতীয় সুখভোগে অধিকার থাকিবে এবং পথের ধুলি-পরিষ্কারক অনাহারে মরিবেন, ইহাই সামাজিক অকল্যাণের মূল কারণ। আমাদের দেশে সম্প্রতি যত জাতি আছে তদপেক্ষা যদি লক্ষাধিক জাতি হয়, তবে কল্যাণ বই অকল্যাণ নাই। কারণ যে দেশে জাতির সংখ্যা যত অধিক সে দেশে শিল্পাদি ব্যবসায়ের সংখ্যা ততই অধিক; কিন্তু মৃত্যুর ছায়া রূপ ভোগতারতম্যরূপ জাতির বিপক্ষেই সংগ্রাম চলিতেছে। যে জাতি এ সংগ্রামে যত পরাজিত তাহার দুর্দ্দশা ততই অধিক। এ সংগ্রামে যে জাতি যে পরিমাণে জয়লাভ করিতেছেন, সে জাতি সেই পরিমাণে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছেন।

৬। সমাজে যাহাকে সমাজনীতি বা politics বলে, তাহা কেবল এই ভোগতারতম্য-সমুখিত অধিকার-প্রাপ্ত ও অধিকার-নিরাকৃত জাতিসমূহের সংগ্রামের নাম ।

৭। এই অধিকারতারতম্যের মহাসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ভারতবর্ষ গতপ্রাণপ্রায় পতিত হইয়াছে।

৮। অতএব বাহ্যজাতির সহিত সাম্য স্থাপন অতি দূরের কথা, যতদিন এ ভারত নিজগৃহে সাম্য স্থাপন করিতে না পারিবে, ততদিন তাহার পুনর্জ্জীবনী শক্তি লাভের আশা নাইঙ্গ

৯। অর্থাৎ সার কথা এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিবিভাগ কোন দোষের নহে; কিন্তু ভোগাধিকার তারতম্যই মহা অনর্থের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

১০। অতএব আমাদের উদ্দেশ্য জাতিবিভাগ নষ্ট করা নয়; কিন্তু ভোগাধিকারের সাম্যসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। আচণ্ডালে যাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অধিকার সহায়তা হয়, তাহার সাধন করাই আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত।

১১। এই ভারত পুনর্ব্বার জাগ্রত হইবে। এবং যে মহাতরঙ্গ এই কেন্দ্র হইতে সমুত্থিত হইয়াছে, মহাপ্লাবনের ন্যায় তাহা সমগ্র মানবজাতিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া মুক্তিমুখে লইয়া যাইবে। ইহা আমাদের বিশ্বাস এবং শিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রাণপণে ইহারই সাধনে আমরা কটিবদ্ধ।

১২। যে কেহ ইহাতে বিশ্বাস করিবে, সেই প্রভুর কৃপায় মহাবীর্য্য ও ওজস্বিতা লাভ করিবে।

১৩। পাশ্চাত্য আলোকের প্রভায় এই ভারতভূমি অধুনা কিঞ্চিৎ প্রতিভাত হইতেছে। ধীরে ধীরে এই সুপ্ত জাতির মধ্যে পাশ্চাত্য মহাজাতি সমূহের অধিকার তারতম্য ভঞ্জনের বিরাট্ উদ্যম ও প্রাণপণ সংগ্রামের বার্তা অস্মদ্দেশীয় পরাহত প্রাণেও কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার

করিতেছে। মানবসাধারণের অধিকার, আত্মার মহিমা নানা বিকৃত সুকৃত প্রণালীমধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈঃ এ দেশের ধমনীতে প্রবেশ করিতেছে। নিরাকৃত জাতি সকল আপনাদের লুপ্ত অধিকার পুনর্ব্বার চাহিতেছে। এ সময়ে যদি বিদ্যা, ধর্ম্ম ইত্যাদি জাতিবিশেষে আবদ্ধ থাকে, তবে সে বিদ্যার ও সে ধর্ম্মের নাশ হইয়া যাইবে।

১৪। তিন বিপদ্ আমাদের সন্মুখে — (১) ব্রাহ্মণ-ব্যতিরিক্ত আর সমস্ত বর্ণ একত্রিত হইয়া পুরাকালে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষের ন্যায় এক নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবে;(২) বাহ্যদেশীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে;অথবা (৩) সমস্ত ধর্ম্মভাব ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

১৫। প্রথম পক্ষে এই অতিপ্রাচীন সভ্যতা সমাধানে সমস্ত প্রযত্নই বিফল হইয়া যাইবে। এই ভারতবর্ষ পুনরায় বালকত্বপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হইয়া উন্নতির পথে বহুকালান্তরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবে। দ্বিতীয় কল্পে ভারতীয় সভ্যতার ও আর্য্যজাতির বিনাশ অতি শীঘ্রই সাধিত হইবে। কারণ, যে কেহ হিন্দু ধর্ম্ম হইতে বাহিরে যায়, আমরা যে কেবল তাহাকে হারাই তাহা নয়, একটী শত্রু অধিক হয়। ঐ প্রকার স্বগৃহ - উচ্ছেদকারী শত্রুদ্বারায় মুসলমান অধিকারকালে যে মহা অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তৃতীয় কল্পে মহাভয়ের কারণ এই যে, যে ব্যক্তির বা জাতির যে বিষয়ে প্রাণের ভিত্তি পরিস্থাপিত, তাহা বিনষ্ট হইলে সে জাতিও নষ্ট হইয়া যায়। আর্য্যজাতির জীবন ধর্ম্মভিত্তিতে উপস্থাপিত। তাহা নষ্ট হইয়া গেলে আর্য্যজাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

১৬। নদীবেগ আপনা হইতেই বাধাহীন পথ নির্ব্বাচিত করিয়া লয়। সমাজের কল্যাণ-স্রোতও সেই প্রকার বাধাহীন পথে আপনা হইতেই চলে। অতএব সমাজকে ঐ প্রকার পথে লইয়া যাইতে হইবে।

১৭। এই ভারতবর্ষ স্বগৃহজাত ও বাহ্যদেশসমাগত বহু জাতিতে পরিপূণ। আর্য্যভাব ইহাদের অধিকাংশের মধ্যে এখনও প্রবিষ্ট হয় নাই।

১৮। অতএব এই ভারতবর্ষকে প্রথমতঃ আর্য্যভাবাপন্ন করিলে, আর্য্যাধিকার দিলে, আর্য্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থে ও সাধনে সকলকে সমভাবে আহ্বান করিলে এই মহা বিপদ্ হইতে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব। এই জন্য প্রথমতঃ যে সকল জাতি সংস্কারবিহীন হইয়া আর্য্যধর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ বিচ্যুত হইয়াছে, পুনঃসংস্কার দ্বারা আর্য্যজাতির ধর্ম্মে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে। মনুষ্যের যেখানে অধিকার, সেখানেই তাহার প্রেম। নতুবা ব্রাহ্মণ মাত্রেরই ধর্ম্ম বলিয়া অন্যান্য জাতি পরিত্যাগ করিবে। ঐ প্রকার আচণ্ডাল সর্ব্বজাতিকে ও ম্লেচ্ছাদি বাহ্যজাতিকেও সংস্কারাদি দ্বারা হিন্দুসমাজকে বিস্তৃত করিতে হইবে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। অধুনা শাস্ত্রোক্ত অধিকারী হইয়াও যাহারা নিজ অজ্ঞতায় সংস্কারবিহীন, তাহাদিগকে সংস্কৃত করা কর্ত্তব্য।

১৯। এই প্রকারে শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের প্রচার ও প্রচারক বহুল হইবে।

২০। মুসলমান বা খ্রীষ্টানদিগকেও হিন্দু ধর্ম্মে আনিবার বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইবে। কিন্তু উপনয়নাদি সংস্কার কিছুদিনের জন্য তাহাদের মধ্যে হওয়ার আবশ্যক নাই।

২১। এই জগতের আবার সেই অবস্থা যখন "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" পুনরায় হইবে, যখন শূদ্রবল, বৈশ্যবল, ও ক্ষত্রিয়বলের আর আবশ্যকতা থাকিবে না, যখন মানবসন্তান যোগবিভূতিতে বিভূষিত হইয়াই জন্ম পরিগ্রহ করিবে, যখন চৈতন্যময়ী শক্তি জড়া শক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিবে;তখন রোগশোক আর মনুষ্য শরীরকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, ইন্দ্রিয় সকল আর মনের প্রতিকূলে ধাবমান হইতে পারিবে না, পশুবলপ্রয়োগ পুরাকালের স্বপ্নের ন্যায় লোকস্মৃতি হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইবে। যখন এই ভূমণ্ডলে প্রেমই একমাত্র সর্ব্বকার্য্যের প্রেরয়িতা হইবে, — তখনই সমগ্র মনুষ্য জাতি ব্রাহ্মণ্যবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে। তখনই জাতিভেদ লুপ্ত হইয়া প্রাচীন ঋষিদিগের দৃষ্ট সত্যযুগ সমুপস্থিত হইবে। সেই পথে যে জাতি বিভাগ ক্রমশঃ অগ্রসর করে, তাহাকেই অবলম্বন করিতে হইবে। যে জাতি বিভাগ জাতিভেদনাশের প্রকৃষ্ট উপায় তাহাই সুপরিগৃহীত হইবে।

২২। স্বগোত্রে বা যে সকল গোত্রের সহিত অতি নিকট রুধির সম্বন্ধ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধবন্ধন হওয়াই জাতির শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। দুর্ব্বলশরীরধারী জাতি কখনও মহান হইতে পারে না, ইহাও ইতিহাস প্রসিদ্ধ। অতএব হিন্দুদিগের শরীর যাহাতে সমধিক বলবিশিষ্ট হয়, তাহার উপায় বিধান করা এক প্রধান কর্ত্তব্য।

২৩। জাতিভেদে বিবাহ স্থগিত করা, ও এক এক জাতির মধ্যে বহুশাখাভেদ হইয়া তাহাদের মধ্যে আদান প্রদান বন্ধ হওয়া, ও তাহার উপর কৌলীন্য প্রথা দ্বারায় বিবাহের পরিধি আরও সঙ্কীর্ণ হওয়ায় রক্ত দূষিত হইয়া জীবনীশক্তি ও বলের অত্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে। আর্য্যধর্ম্ম,আর্য্যভাব ইহাদের অধিকাংশের মধ্যে এখনও প্রবিষ্ট হয় নাই।

২৪। ইহার প্রতিবিধান করিতে গেলে প্রথমতঃ প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে সকল অবান্তর বিভাগ আছে তাহাদের মধ্যে যাহাতে আদান প্রদান হয় তাহার উদ্যোগ করা উচিত।

২৫। "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভূজো যথা।" যে সম্প্রদায়ে শক্তিরাশি সমাহিত তাহারা সমাজকে যে দিকে চালাইবে সমাজ সেই দিকেই চলিবে। পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা ও বিদ্যাধারতাই এই শক্তিসঞ্চয়ের উপায়। যত অধিক পরিমাণে উহা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হইবে, তত অধিক পরিমাণে আমরা সমাজের উপর কার্য্য করিতে পারিব।

২৬। উহা সাধিত করিতে গেলে একটী মহাবলশালী সমাজের সৃষ্টি করিতে হয়, যাহার প্রাণশক্তি ভারতের অস্থিমজ্জায় ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হইয়া মৃতপ্রায় ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে।

২৭। লোকভয়ে, অন্নাভাবের ভয়ে, মানহানির ভয়ে মনুষ্য সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইলেও নূতন উদ্যমে উদ্যুক্ত হয় না। তাহার উপর যে সমাজ যত অধিক দিন পথবিশেষকে অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে নূতন কোনও পথাবলম্বন করা ততই কঠিন হয়। অতএব এই মহাবলশালী সমাজভিত্তি সৃষ্টি করিতে হইলে নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন করাই একমাত্র উপায়। যে স্থানে নরনারী প্রাক্তন সংস্কারাপেক্ষাও কঠিনতর বন্ধন সমাজ শাসন

হইতে দূর থাকিয়া নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম প্রয়োগ করিয়া নববলে বলীয়ান্ হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে উপনিবেশ স্থাপনের উপায় নাই।

২৮। মধ্যভারতে হাজারীবাগ প্রভৃতি জেলার নিকট উর্ব্বর, সজল, স্বাস্থ্যকর অনেক ভূমি এখনও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ প্রদেশে এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া তাহার উপরে একটি বৃহৎ শিল্প-বিদ্যালয় ও ধীরে ধীরে কারখানা ইত্যাদি খুলিতে হইবে। অন্নাগমের নূতন পথ যেমন আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে, লোক তেমনই উক্ত উপনিবেশে আসিতে থাকিবে। তখন তাহাদিগকে যে প্রকারে গঠিত করিবে সে প্রকারেই গঠিত হইবে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে বিবেকানন্দ এখানে বলছেন না যে সত্যযুগ এসে গেছে, এখন হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান সব এক হয়ে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি আর সেকুলার অবতার বানাচ্ছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ এখন হিন্দুধর্মের অবতার। তিনি হিন্দুধর্মকেরক্ষার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছেন। এখন তিনি হিসাব করছেন যে মুসলমান বিজয়ের ফলে ও খ্রিষ্টান শাসনকালে ভারতের কি কি ক্ষতি হয়েছে। তিনি এখন মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করার কথা বলেছেন। নাকচ করছেন পূর্বকথিত সত্যযুগ তত্ত্ব। তবে তিনি এখানে নিজ গুরুদেব নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপরে স্থান দিয়েছেন তাঁকে। আমরা আগেই দেখিয়েছি, শ্রীরামকৃষ্ণের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল সীমিত।

কিন্তু ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা নির্দেশ অনুসারে রথের চাকা বহুদূর গড়িয়ে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে গেছেন সেকুলার অবতার। এখন তাঁর গুরুভাইরা রথের চাকা অন্যদিকে ঘোরাবেন না। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের অন্য বার্তা গুরুভাইরা শুনলেন না। কেশবচন্দ্র নয়, শ্রীরামকৃষ্ণই নববিধানের গুরু। কেশবচন্দ্রই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নববিধান শিখেছিলেন।

মঠের নিয়মাবলীতে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, "ঠাকুরের উক্তিসকল একত্র করিয়া তাহাকে একমাত্র শাস্ত্র করিলে তাঁহার বিশাল ভাব ও আমাদের আজীবন পরিশ্রমের ফল এই হইবে যে, আমরা একটি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের স্রষ্টা হইব ও বহু বিবদমান ভাগে বিভক্ত এই সমাজকে আরও কোলাহলময় করিয়া তুলিব।"

খুবই সত্য কথা। কিন্তু পরের অনুচ্ছেদেই বিবেকানন্দ লিখলেন, "অতএব আমাদের সনাতন শাস্ত্র বেদই একমাত্র শাস্ত্ররূপে পরিগৃহীত ও প্রচারিত হইবে, ও গীতা যে প্রকারে পুরাকালে ছিল সেই প্রকার ঠাকুরের উক্তি আধুনিক সর্বাঙ্গসুন্দর বেদমতের ব্যাখ্যা।"

আমরা আগেই দেখিয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণের শাস্ত্রজ্ঞানের ন্যূনতা। সুতরাং বিবেকানন্দ একটি পৃথক ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়ার দিকেই এগিয়ে গেলেন। সেই সম্প্রদায়ের মানুষ এখন মৃত্যুর পর 'রামকৃষ্ণলোক' এ যায়। তারা এখন নিজেদের 'অহিন্দু' বলে ঘোষণা করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত মঠ সাধারণের চোখে কেমন লাগতো তার একটা ছবি দিয়েছেন বিবেকানন্দ জীবনীকার প্রমথনাথ বসু। তিনি লিখেছেন, "বেলুড় মঠ স্থাপিত হওয়ার সময় নৈষ্ঠিক হিন্দুদের মধ্যে অনেকে মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত প্রত্যাগত স্বামীজী কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচার নিষ্ঠা সর্বদা পালিত হয় না। এবং ভক্ষ্য ভোজ্যাদির বাচবিচার নাই—প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী ইতর ভদ্র অনেকে তখন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের কার্যকলাপের অযথা নিন্দা করিত। চলতি নৌকার আরোহীগণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই নানারকম ঠাট্টা তামাসা করিতে এমন কি, সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসার অবতারণা করিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বামীজীর অমলধবল চরিত্র আলোচনাতেও কুণ্ঠিত হইত না।"

আসামে কামাখ্যা দর্শন করে বিবেকানন্দের কিছু ভাব পরিবর্তন হয়। তিনি কিছুটা 'ঘন্টা নাড়ার' সিদ্ধান্ত নেন। বেলুড় মঠে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে দুর্গাপূজার সিদ্ধান্ত হয়। সে বছর লক্ষ্মী ও শ্যামাপূজাও হয়। পরের বছর আর বিবেকানন্দ দুর্গাপূজা দেখার সুযোগ পান নি।

আজও বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা হয়। কিন্তু শ্যামাপূজা হয় না, হয় না জন্মাষ্টমীও। কিন্তু যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন পালিত হয়!

লাহোরে ১২ই নভেম্বর ১৮৯৭ তারিখে প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতায় বিবেকানন্দ অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে বলেছিলেন, "এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশী হিন্দুর বাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কোনও প্রতিকার না হইলে হিন্দু দিন দিন আরও কমিয়া যাইবে, শেষে আর কেউ হিন্দু থাকিবে না। হিন্দুজাতির লোপের সঙ্গে সঙ্গেই—তাহাদের শতদোষ সত্ত্বেও পৃথিবীর সম্মুখে তাহাদের শত শত বিকৃত চিত্র উপস্থাপিত হইলেও এখনও তাহারা যে-সকল মহৎ ভাবের প্রতিনিধিরূপে বর্তমান, সেগুলিও লুপ্ত হইবে। আর হিন্দুদের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সকল অধ্যাত্মজ্ঞানের চূড়ামণি অপূর্ব অদ্বৈততত্ত্বও বিলুপ্ত হইবে। অতএব ওঠ, জাগো—পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিবার জন্য বাহু প্রসারিত কর।"

কিন্তু পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করার জন্য বাহু প্রসারণ দূরে থাক, বঙ্গে হিন্দু নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্যও কেউ বাহু প্রসারণ করছে না। অবাধে চলছে ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানি। ধর্ষণ করে দু-পা ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে নারীদেহ। একটি হিন্দুও প্রতিবাদ জানাচ্ছে না। সবাই ভাবছে, 'যত মত তত পথ'। জাঠেরা কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে নারী নিগ্রহের প্রতিবাদ জানিয়েছে। হিন্দুদের 'হিন্দু' সত্তা বিসর্জিত হলে সর্বনাশ অনিবার্য। আজ আমাদের বিবেকানন্দের অশুভ চিন্তা 'যত মত তত পথ' থেকে দূরে থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

পাঁচ: পরিশেষে

উনিশ শতকের ধর্ম দূষণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম এই দূষণ শুরু করেন রামমোহন। রামরাম বসুকে অনুসরণ করে ইহুদী পয়গম্বর যিহোভার দশটি প্রত্যাদেশের 'পৌত্তলিকতা' বিরোধী অংশটি তিনি প্রবিষ্ট করেন হিন্দু ধর্মের দেহে। তারপর নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে অবলম্বন করেন হিন্দুধর্মও যে 'অপৌত্তলিক' তা প্রমাণ করার জন্য।

কিন্তু নিরাকার ব্রহ্ম অচিন্ত্য, নির্বিকার ও অনন্ত। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা নন, পালয়িতাও নন, তাঁকে বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁর স্তুতিও করা যায় না। কিন্তু রামমোহন ব্রহ্মের স্তুতি করে 'ব্রহ্ম সঙ্গীত'ও গাইলেন। তিনি সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মের মধ্যে কোনও পার্থক্য করলেন না। দুটিকে মিশিয়ে ফেললেন।

তিনি তলবকার উপনিষদ বা কেন উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করলেন। ঐ উপনিষদে ব্রহ্মের যক্ষরূপে দেবতাদের নিকট উপস্থিত হওয়ার বিবরণ আছে। কিন্তু সেই বর্ণনা অস্বীকার করলেন তিনি। ফলে তাঁর ব্রহ্ম চিন্তার মধ্যে একটা তঞ্চকতা থেকে গিয়েছিল।

তিনি মনের গভীরে খ্রিষ্টধর্ম দ্বারা গ্রস্ত ছিলেন। তবে প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মে নয়, তিনি 'প্রিসেপ্ট অব্ যেশাস' নামে একটি বই লিখে খ্রিষ্টধর্মে সংশোধন আনতে চেয়েছিলেন। সেই সংশোধিত খ্রিষ্টধর্মে তিনি নিশ্চয় বিশ্বাসবান হতেন! ফলে কিছু মিশনারী মনে করতো তিনি হয়তো কালে খ্রিষ্টান হয়ে যাবেন। এরই ফলে ইউনিটেরিয়ান খ্রিষ্টানরা সর্বদা লেগে ছিল তাঁর সঙ্গে।

তিনি একটি পৃথক উপাসনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেও পৃথক ধর্মীয় সমাজ গঠন করেন নি। তিনি একজন ব্রাহ্মণ হিসাবেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

কিন্তু রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু যে রামমোহনের অনুসারী হলেন তাই নয়, তিনি একটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মীয় সমাজ গড়ে তুললেন। তিনি রামমোহনের বাইবেলীয় 'পৌত্তলিকতা' বিরোধিতা গ্রহণ করলেন। তারপর রামমোহনের মতোই উপনিষদকে অবলম্বন করে তাঁর ব্রহ্ম তত্ত্ব প্রচার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব

গ্রহণকারীদের নিয়ে একটি পৃথক ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়ে তুললেন, যে সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার জন্য কিছু অঙ্গীকার করে স্বাক্ষর করতে হতো।

দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদকে গ্রহণ করলেন তাঁর খেয়ালখুশী মতো। কিছু গ্রহণ করলেন কিছু বর্জন করলেন। উপনিষদের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করতে রাজী হলেন না;কারণ তাতে উপাস্য-উপাসক এক হয়ে যায়। তিনি দ্বৈতভাবে ব্রহ্মের আরাধনায় বিশ্বাসী হলেন। রামমোহনের চিন্তামতো তাঁর ব্রহ্ম নিরাকার কিন্তু তাঁর রূপ চিন্তা করা যায়;কখনও তিনি মাতা, কখনও তিনি পিতা। অচিন্ত্য হলেও তাঁর মহিমা বর্ণনা করে স্তুতি করা যায়,গান গাওয়া যায়। অর্থাৎ, রামমোহনের হাঁসজারু 'ব্রহ্মোপাসনা' তিনি বজায় রাখলেন। উপরন্তু ব্রহ্মোপাসনার একটি 'পুরোহিত দর্পণ' তিনি রচনা করলেন। ব্রাহ্ম মতে বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ সবই তাতে রইল। দেবেন্দ্রনাথ দাবী করলেন, ব্রাহ্ম রাই যথার্থ হিন্দু, আর পরম্পরাগত হিন্দুরা মিথ্যা ধর্মে বিশ্বাস করে।

ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বড় জমিদার এবং ব্যবসায়ী। জমিদার হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যাচারী, প্রজাদের উপর নানারকম অবৈধ কর চাপিয়ে দিয়ে জোরজবরদস্তি করে তা আদায় করতেন। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ প্রশাসনকে হাতে রেখে অত্যাচার চালাতেন প্রজাদের উপর। আর কলকাতায় বসে উৎপাতের টাকা দান খয়রাত করে বড় দাতা বলে নাম কিনতেন। সারা জীবনে তিনি নাকি বাইশ লাখ টাকা দান করেছিলেন। তাঁদের কার টেগোর কোম্পানী দেনার দায়ে দেউলিয়া হয়ে যায়। পরে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে থেকে সেই কোম্পানীর কাগজপত্র কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। ধনী 'প্রিন্স' দ্বারকানাথের পুত্র হিসাবে প্রচুর টাকা খরচ করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ বিখ্যাত ছিলেন। প্রচুর লোক তাঁর পেটোয়া ছিল। তাদের দিয়ে হয় কে নয়, নয়কে হয় করতেন।

ভণ্ড অত্যাচারী জমিদার দাবী করতেন, তিনি ঈশ্বরকে দেখতে পান। তাঁর জমিদারীর কুমারখালি গ্রামে হরিনাথ মজুমদার নামে একজন বাস করতেন। তিনি 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামে একটি গ্রামীণ সংবাদপত্র প্রকাশ করে জমিদারীর নানা অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশ করতেন। জমিদার পক্ষ প্রথমে টাকা দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করতে চায়। তা না হওয়াতে জমিদার পক্ষ সুপারি কিলার নিয়োগ করে হরিনাথ মজুমদারকে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু বিখ্যাত লোকসঙ্গীত গায়ক লালন ফকির ছিলেন হরিনাথের বন্ধু। তিনি নিজে লাঠি ধরে গুণ্ডাদের সামলান। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনও ধার্মিক মানুষের নাম নয়। কিন্তু তিনি অর্থবলে এক বিশাল হুজুক সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। বহু ধনী, শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন মানুষ হুজুকে যোগ দিয়ে 'ব্রাহ্ম' হন।

বৈদ্য বংশীয় ধনী কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শ শিষ্যকে খুঁজে পান। তিনি তাঁকে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যরূপে বেদীতে বসে উপদেশ প্রধানের অধিকারও প্রদান করেন। কিন্তু তিনি কোনও ব্যাপক সমাজ সংস্কারে রাজী ছিলেন না। কিন্তু উনিশ শতকের

ধনী ও শিক্ষিত বৈদ্য, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতিরা কিছু ধর্মীয় অধিকার দাবী করছিল। কেশবচন্দ্র দাবী করলেন ব্রাহ্ম মহিলারাও ব্রাহ্ম মন্দিরে এসে উপাসনা করবে। আর, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

কেশবচন্দ্রের অতিরিক্ত ব্যাপার হচ্ছে তিনি খ্রিষ্টভক্ত। তাঁর খ্রিষ্ট এক কাল্পনিক খ্রিষ্ট—ঠিক বাইবেলের খ্রিষ্ট নয়। তিনি বিশ্বাস করেন, সব ধর্মের মধ্যে সত্য আছে। কিন্তু, সত্যটা যে কি তা তিনি উল্লেখ করেন নি। বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে পড়াশুনা করার জন্য তিনি কয়েকজনকে নিযুক্ত করেন।

কেশবচন্দ্র মন দিয়ে বাইবেল পড়েন নি, সেমীয় ধর্মগুলির বিষদাঁতও দেখতে পাননি। দেখতে পাননি যে যিশুখ্রিষ্ট এক আক্রমণের উৎসমুখ। নিজের সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি নিজেকে 'প্রফেট' বলে মনে করতেন।

এই খ্রিষ্টপাগল মানুষটির সন্তান সংখ্যা কিছু কম ছিল না। পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা। তদানীন্তনকালে ব্রাহ্ম কন্যাদের বিয়ে দেওয়া সোজা ব্যাপার ছিল না। বড় মেয়ে সুনীতির সম্বন্ধ এসেছিল কোচবিহারের রাজপুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের সঙ্গে। কেশবচন্দ্র প্রাথমিকভাবে গররাজী হলেও পরে একটি বাগদান অনুষ্ঠানে রাজী হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানটি হওয়ার পরে কলকাতায় এসে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন তিনি। শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে তাঁর বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙ্গে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের' পত্তন করলো। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মীয় অবস্থান ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ থেকে পৃথক হলো না। বিবেকানন্দ এই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালোই ছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের 'নববৃন্দাবন' নাটকে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে থাকলেও কলকাতা শহর সম্পর্কে সব খোঁজখবর রাখতেন। ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন কলকাতার শিক্ষিত ও ধনী সমাজের মধ্যমণি। তিনি কেশবচন্দ্রকে দেখেই বুঝেছিলেন, তাঁর 'ফাৎনা' ডুবেছে। আসলে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান কেশবচন্দ্র আব্রাহামীয় ধর্মের ডোবায় তাঁর চতুর্দশ পুরুষকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। একদিন হৃদয়ের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বেলঘরিয়ার বাগানবাড়িতে দেখা করতে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সরল রামকৃষ্ণের গল্পে অন্য সবার মতো কেশবচন্দ্রও মুগ্ধ হলেন। তাঁর হৃদ্যতা গড়ে উঠলো শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণও কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মিশে সব ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা কেশবচন্দ্র প্রচার করতে লাগলেন নিজস্ব সংবাদপত্রে। ফলে কলকাতার শিক্ষিত মহলে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হলো। আবার যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙ্গে গেল, তখন শ্রীরামকৃষ্ণই হলেন কেশবচন্দ্রের তুরুপের তাস। তিনি সব ধর্মকে মান্যতা দিয়ে 'নববিধান' ঘোষণা করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মাথাতে ঢুকলো 'যত মত তত পথ'।

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্ম ধর্মকেও মেনে নিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম দের বলতেন 'অরূপের থাক'। যে ব্রহ্ম অরূপ, সে ব্রহ্ম অচিন্ত্যও বটে, এ ধর্মতত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের জানা ছিল না। তিনি নরেন্দ্রের অলীক 'ব্রহ্ম সঙ্গীত' শুনতেন।

নরেন্দ্রকে দেখেই প্রৌঢ় শ্রীরামকৃষ্ণের মনে হয়েছিল এমন একজনকে তিনি বহুদিন ধরে খুঁজছেন। একটা মুগ্ধতা নিয়ে তিনি তাকিয়েছিলেন নরেন্দ্রর দিকে। পরে সেই একই মুগ্ধতা নিয়ে বিবেকানন্দের দিকে তাকিয়েছিল গোটা জগত। বিবেকানন্দ ছিলেন পুরুষ রত্ন।

সূচনায় বিবেকানন্দ হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে তেমন কিছু জানতেন না। কিন্তু তিনি দুটি ভাষা খুব ভালো করে শিখেছিলেন—ইংরেজী আর সংস্কৃত। একজন ব্রাহ্ম হিসাবে উপনিষদও কিছু পড়েছিলেন। কিন্তু গুরুভাইদের কাছে লেখা চিঠি ও আলাসিঙ্গাকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় যে আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু পুস্তক সংগ্রহ করেন। সেগুলি অবলম্বনে যোগশাস্ত্র ও বেদান্ত বিষয়ে উত্তম পুস্তক রচনা করেছিলেন ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাও দিয়েছিলেন শ্রোতাদের কাছে। স্বল্পসময়ের মধ্যে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র গুলে খাওয়া বিবেকানন্দের অনন্য প্রতিভারই প্রমাণ।

বিবেকানন্দ ব্যাপক প্রচারে বিশ্বাস করতেন। গুরুভাইদের কাছে লেখা বিভিন্ন চিঠিতে হুজুক সৃষ্টি করতে, ধূম মচাতে বলেছিলেন। বিভিন্ন জায়গাতে তাঁর কীর্তির জন্য অভিনন্দন জানানোর জন্য নির্দেশ দিতেন তিনি। প্রথমে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাস করতেন না। যার জন্য গাজিপুরে পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নিতে গিয়েছিলেন। পরে স্থির করেন শ্রীরামকৃষ্ণকেই অবতাররূপে প্রচার করবেন। 'যত মত তত পথ' কে প্রতিষ্ঠা করা তাঁরই চিন্তা প্রসূত। তিনিই গুরুভাইদের নির্দেশ দিয়েছিলেন সেইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে অভিক্ষেপ করতে। অক্ষয় কুমার সেনের উৎকট জীবনী 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' কে তিনি আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী বলে তুষ্টিপত্র দিয়েছিলেন। ফলে সারদানন্দ সেই অনুযায়ী একটি উৎকট শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী রচনা করেন। এই অপচেষ্টায় যোগ দেয় বাকী সবাই। আজও এই অপচেষ্টার বিরাম নেই।

বিবেকানন্দ শুধু যে সেমীয় ধর্মগুলির সঙ্গে হিন্দুধর্মকে সমীকৃত করলেন তাই নয়, অতীতের অবতারদের 'কেষ্ট-বিষ্টু' বলে তাচ্ছিল্য করে নাকচ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তাই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পালিত হয় না। কিন্তু নিরঙ্কুশবাদী খ্রিষ্টর জন্মদিন পালিত হয়। হিন্দুধর্ম পালনের ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবিষ্ণু অত্যাবশ্যক দেবতা। হিন্দুরা নিত্য উচ্চারণ করেন,

দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দ হিন্দুদের নিজস্ব পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছেন। এই পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিপ্রায় একান্তই ব্রাহ্ম সুলভ।

১৮৯৫ এ এক চিঠিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "আর তিনি বিবাদ ভঞ্জন—হিন্দু মুসলমান ভেদ, খ্রিশ্চান-হিন্দু ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল তা অন্য যুগের; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।"

এই ভাবে বিবেকানন্দ মিথ্যা প্রচার করে হিন্দুধর্মকে দূষিত করেছিলেন। প্রশংসা করেছিলেন সেমীয় ধর্মের। সেই ধারা সমানে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধুরা এখনও বিশ্বাস কবেন যে এখনও সত্যযুগ চলছে। ক' বছর আগে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল, 'জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে'! কি আনন্দগান বাজছে তা তো খবরের কাগজ খুললেই বোঝা যায়। হিন্দু নারীদের ব্যাপকভাবে বিরক্ত করা, শ্লীলতা হানি করা এবং ধর্ষণ করা চলছে। ধর্ষণ করে দু'পা দুদিকে টেনে শরীরটাকে ছিঁড়ে ফেলাও হচ্ছে। যে বছরে উদার সুরে আনন্দগান হওয়ার কথা লেখা হয়েছিল, সেই বছর মুর্শিদাবাদে মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করার অপরাধে এক হিন্দুর গলা কাটা হয়েছিল।

১৮৯৬ এ 'বাস্তব জীবনে বেদান্ত' বক্তৃতামালায় ও ১৮৯৭ এ 'মঠের নিয়মাবলী'তে বিবেকানন্দ কিঞ্চিৎ অন্য কথা বলেন। তিনি মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করার কথাও বলেন। কিন্তু, হাতের ঢিল আগেই হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। সুতরাং তাঁর গুরুভাইরা সে নির্দেশ শুধু যে অমান্য করেন তাই নয়, সেই নির্দেশ গোপনও করে ফেলেছেন।

কিছুদিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট অব্ কালচার থেকে 'জগতের ধর্মমত' নামক একটি বই প্রকাশ করা হয়। তাতে ইহুদী, ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের বিপজ্জনক তথ্যাদি সযতনে বাদ দেওয়া হয়েছে। এবং সেগুলি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে প্রশংসাসূচক নানা মিথ্যা কথা। সযতনে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বাইবেল ও কুরআন-হাদিশে লিখিত বিধর্মীঘাতী বক্তব্যগুলি। যারা এইসব মিথ্যা তথ্য দিয়েছে সেই সব দুর্বৃত্তদের নাম অজানা । কিন্তু বইটির সম্পাদক প্রভানন্দ। ইসলাম সম্বন্ধে যা মিথ্যা সুন্দর সুন্দর কথা লেখা হয়েছে তা পড়লে মনে হবে এখনই মুসলমান হয়ে যাই। এই সব আত্মঘাতী মিথ্যা কথা প্রচার করা বিবেকানন্দেরই শিক্ষার ফল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে যেভাবে দূষণ করেছেন, আর তার জের এখনও কুৎসিতভাবে চলছে।

বিবেকানন্দ বেদান্তের তুলি দিয়ে পৃথিবীর তাবৎ সমস্যার সমাধানচিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছিলেন। এ চিন্তা ছিল অবাস্তব। সবার মধ্যে একই ব্রহ্মের অবস্থান—এই চিন্তা কখনও সামাজিক সাম্য সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ, সবার মধ্যে একই পরমাত্মার অবস্থান সত্ত্বেও সিংহ মেষকে মেরে খায়। সাপ তাঁর বিষদাঁত দিয়ে কামড়ায় মানুষকে। প্রতিটি জীবেরই 'স্বভাব' আছে। দৈহিক বল, সাহস ইত্যাদির নিরিখে একজন মানুষ অন্যজন থেকে পৃথক। দুর্বল মানুষ সবল মানুষকে নেতা বলে মানে। সেই সবলতা নানা নিরিখে হয়। তার মধ্যে বংশমর্যাদাও আছে। মুসলিম সমাজে সৈয়দরা শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাঁরা খোদ হজরত মুহাম্মদের বংশধর। ধনও সবলতার এটি নিরিখ। পৃথিবীর কোথাও সামাজিক সাম্য নেই। বিবেকানন্দ একদা গ্রস্ত হয়েছিলেন কার্লাইলের 'হিরো অ্যাজ এ প্রফেট' ও সৈয়দ আমীর আলির 'স্পিরিট অব্ ইসলাম' পড়ে। তিনি মুহাম্মদকে 'সাম্যবাদের গুরু' বানিয়েছিলেন।

সৈয়দ আমীর আলির 'স্পিরিট অব্ ইসলাম' প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে। বিবেকানন্দ ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারী ক্যালিফোর্ণিয়ার প্যাসাডোনাতে ইউনিভার্সালিষ্ট চার্চে এক ভাষণে বলেন, "যখনই একজন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, অমনি সমগ্র ইসলামী সমাজ তাহাকে জাতিবর্ণনির্বিশেষে ভ্রাতা বলিয়া বক্ষে ধারণ করিল। এরূপ কোনও ধর্ম করে না। এদেশীয় একজন রেড ইন্ডিয়ান যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে তুরস্কের সুলতানও তাহার সহিত একত্র ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না,.."

এসব নিতান্তই হাস্যকর কথা। ইসলামী সমাজ ছিল দাস-প্রভুর সমাজ। মনিবরা দাসকে হত্যা করতেও পারতেন। আর দাসীরা মনিবকে দেহদান করতে বাধ্য থাকতো। মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব ব্যাপারটা নিতান্তই রাজনৈতিক । এর তাৎপর্য, একজন মুসলমান যেন অন্য মুসলমানের রক্তপাত না করে। এ কথা যে কেউ শোনে না, বা শোনেনি, তা নিশ্চয় কারোকে বলে দিতে হবে না।

আরও মনে রাখতে হবে, একজন রাজাকে তাঁর রাজসিকতা বজায় রাখতে হয়, না হলে মানুষ তাঁকে অমান্য করে। রাজাকে সর্বদা ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম আদায় করতে হয়। রাজা মুসলমান হলেও এই সত্যের ব্যতিক্রম হয় না।

সাম্য বহু প্রকারের হতে পারে—দার্শনিক সাম্য, ধর্মীয় সাম্য, অর্থনৈতিক সাম্য, সামাজিক সাম্য ইতাদি। একটির সঙ্গে অন্যটিকে মিশিয়ে ফেললে চলবে না। বিবেকানন্দ বেদান্তের দার্শনিক সাম্যের সঙ্গে সামাজিক সাম্য মিশিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর ইসলামের মধ্যে বেদান্তের অন্বেষণ নিতান্তই ভ্রান্ত প্রচেষ্টা।

সন্ন্যাসী বলতে শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদেরই বোঝায়। শ্রীরামকৃষ্ণ পুরী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন। সেই বিচারে বিবেকানন্দও দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁর পূর্বাশ্রমকে খুব সামান্যই ছাড়তে পেরেছিলেন। নানারকম সুবিধাবাদেরও আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথকে বিলাতে নিয়ে গিয়ে ধনী ভক্ত স্টার্ডির ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন। দেখাদেখি সারদানন্দও তাঁর ভাইকে পাঠিয়েছিলেন লন্ডনে। ব্যাপক প্রচারে বিশ্বাস করতেন বিবেকানন্দ। প্রচার করে হয় কে নয়, নয় কে হয় করতেন। খাওয়ার-দাওয়ার ব্যাপারে বিবেকানন্দ কোনও বাছ-বিচার করতেন না। প্রচণ্ড ধূমপান করতেন। এমনিতে স্বাস্থ্য তাঁর কোনও দিনই ভালো ছিল না। একটু পরিশ্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। বস্তুত তিনি অল্পবয়সেই জড়িয়ে পড়েন নানা রোগে। ফলে উনচল্লিশ বছর বয়সেই হৃদরোগে ঝরে যায় তার প্রাণ।

আজকে ১৫০ বছরের বিবেকানন্দকে সামনে রেখে নিজের বুকে হাত দিয়ে প্রশ্ন করার আছে, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজ কেন বিবেকানন্দকে 'মহামানব' বলে মনে রাখবে? শুধু হিন্দুদের বেদান্তকে প্রতীচ্যে প্রচার করেছিলেন বলে? বা হিন্দু যোগশাস্ত্র নিয়ে উত্তম পুস্তক রচনা করার জন্য? তিনি কি আজকের এই ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজের পথপ্রদর্শক?

না, বিবেকানন্দকে স্মরণে রাখতে হবে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ২৪৯ নং চিঠির জন্য, যে চিঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীর মডেল হিসাবে সুপারিশ করেছিলেন অক্ষয় কুমার সেনের 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' কে? যে পুস্তকে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ মুসলমান হয়ে কুকুরের রূপ ধারণ করে মরা গরুর মাংস ভক্ষণ করেছিলেন? যে চিঠিতে বিবেকানন্দ দাবী করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগের আবির্ভাব হয়েছে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান সব এক হয়ে গেছে। মুছে গেছে সব ভেদাভেদ?

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসকরা যে 'জগতের ধর্মমত' নামে ধ্বংসাত্মক পুস্তক লিখেছেন, তাঁর অনুপ্রেরণা কি বিবেকানন্দ নয়? বিবেকানন্দের নয়নাভিরাম রূপ দেখেই কি আমরা ধরে নেব তিনি সব সমালোচনার ঊর্দ্ধে? তিনি চিকাগো ধর্ম মহাসভায় কিছু শ্রবণঅভিরাম ভাষণ দিয়ে বিদেশী শ্রোতাদের মন জয় করেছিলেন বলেই আমরা ধরে নেব তিনি হিন্দুদের পরম উপকারী মহামানব?

আজকে বিবেকানন্দ অনুগামীরা প্রকাশ্যভাবে নিজেদের হিন্দুত্ব অস্বীকার করছে। বলেছে, আমরা অহিন্দু। কাজে কাজেই বিবেকানন্দের শিক্ষা অনুসারে নিজেকে হিন্দু বলার মতো মানুষ কম হয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং আমাদের বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করার আছে, খ্রিষ্টান পাদ্রী দেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা শ্রীরামকৃষ্ণকে, বা খ্রিষ্টভক্ত, 'যত মত তত পথ'বাদী বিবেকানন্দকে আমরা হিন্দুরা কেন শ্রদ্ধা জানাবো?

পরিশিষ্ট

স্বামী বিবেকানন্দের গুপ্ত রচনা

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলী (১৮৯৭)

মঠ-(১)

১। শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্ত্রীলোকদিগের জন্যও ঐ প্রকার আর একটি মঠ স্থাপিত হইবে।

২। যে ভাবে পুরুষদিগের মঠ পরিচালিত হইবে, স্ত্রীলোকদিগের মঠও ঠিক সেইভাবে পরিচালিত হইবে। বিশেষ এই, স্ত্রীলোকদিগের মঠে পুরুষের কোন সংস্রব থাকিবে না এবং পুরুষদিগের মঠে স্ত্রীলোকের কোন প্রকার সংস্রব থাকিবে না।

৩। হিমাচলে কোন উপযুক্ত স্থানে ঐ প্রকার দুইটি মঠ স্থাপিত হইয়া ঐ প্রকার নিয়মে পরিচালিত হইবে।

৪। স্ত্রীমঠ, যতদিন পর্য্যন্ত কার্য্য সম্পাদনে সমর্থা স্ত্রী না পাওয়া যায়, ততদিন দূর হইতে পুরুষদের দ্বারা চালিত হইবে;তাহার পর উহারা আপনাদের সকল কার্য্য আপনারাই করিয়া লইবে।

৫। বিদ্যার অভাবে ধর্ম-সম্প্রদায় নীচ দশা প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্ব্বদা বিদ্যার চর্চ্চা থাকিবে।

৬। ত্যাগ এবং তপস্যার অভাবে বিলাসিতা সম্প্রদায়কে গ্রাস করে ;অতএব ত্যাগ এবং তপস্যার ভাব সর্বদা উজ্জ্বল রাখিতে হইবে।

৭। প্রচারের দ্বারায় সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, অতএব প্রচারকার্য্য হইতে কখনও বিরত থাকিবে না।

৮। এই প্রকার মঠ সমস্ত পৃথিবীতে স্থাপন করিতে হইবে। কোন দেশে আধ্যাত্মিক ভাব মাত্রেরই প্রয়োজন। কোন দেশে ইহজীবনের কিঞ্চিৎ সুখস্বচ্ছন্দতার অতীব প্রয়োজন। এই প্রকারে যে জাতিতে বা যে ব্যক্তিতে যে অভাব অত্যন্ত প্রবল তাহা পূরণ করিয়া সেই পথ দিয়া তাহাকে ধর্মরাজ্যে লইয়া যাইতে হইবে।

৯। ভারতবর্ষে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য — নীচ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্ম্মের বিতরণ। অন্নের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ধর্ম্ম হওয়া অসম্ভব। অতএব তাহাদের নিমিত্ত অন্নাগমের নূতন উপায় প্রদর্শন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।

১০। সমাজসংস্কারের উপর মঠের অধিক দৃষ্টি থাকিবে না। কারণ, সামাজিক দোষ বা কুরীতি সমাজরূপ শরীরের ব্যাধিবিশেষ। ঐ শরীর বিদ্যা ও অন্নের দ্বারা পুষ্ট হইলে ঐ সকল কুরীতি আপনা আপনি চলিয়া যাইবে। অতএব সামাজিক কুরীতির উদঘোষণে বৃথা শক্তি ক্ষয় না করিয়া সমাজশরীর পুষ্ট করাই এই মঠের উদ্দেশ্য।

১১। চরিত্রবল না হইলে মনুষ্য কোন কার্য্যেই সক্ষম হয় না। এই চরিত্রবলবিহীনতাই আমাদের কার্য্যপরিণতা-বুদ্ধির অভাবের একমাত্র কারণ।

১২। আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয় চরিত্রগঠনের একমাত্র উপায়। অতএব এই মঠের প্রত্যেক কার্য্যে ও প্রত্যেক শিক্ষায় ইহার উপর যেন লক্ষ্য থাকে।

১৩। শিষ্যের গুরুর উপর একান্ত বিশ্বাস থাকা উচিত। সেই প্রকার গুরুও শিষ্যের প্রতি একান্ত বিশ্বাসবান্ না হইলে শিষ্যের উন্নতি হইতে পারে না। গুরু শিষ্যের উপর বিশ্বাস করিলে শিষ্যের শক্তি স্ফুরিত হয়। শিষ্যের বিশ্বাসে গুরুরও শক্তি বিপুলতা লাভ করে।

১৪। এই মঠের সমস্ত কার্য্যই মঠস্থ সর্ব্বাঙ্গের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত হইবেঙ্গ সর্ব্বসম্মতির অভাবে অধিক সংখ্যকের সম্মতিতে হইবে ।

১৫। যে কেহ কামকাঞ্চনত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান — ইহাদের এক, দুই বা সমস্ত অভ্যাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে চান, যিনি সচ্চরিত্র, ঈর্ষাশূন্য ও অধ্যক্ষের এবং গুরুর আদেশ পালনে প্রাণপণ তৎপর, তিনি এই মঠের অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে পারিবেন।

১৬। মঠের অঙ্গগণ দুই ভাগে বিভক্ত — নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, ও সন্ন্যাসী। নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী শব্দে যাহারা আকুমার ব্রহ্মচারী ও যাহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, তাহাদিগকে বুঝাইবে।

১৭। খণ্ডিত-ব্রহ্মচর্য্য যাহারা পুনর্ব্বার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহারাও মঠের অঙ্গ হইতে পারিবে।

১৮। পিতামাতা বা অভিভাবকেরা যে সকল বালককে স্বেচ্ছায় শিক্ষার নিমিত্ত এই মঠে পাঠাইবেন, অথবা যে সকল বালক অনাথ, তাহারাও এই মঠে গৃহীত ও শিক্ষিত হইবে, কিন্তু মঠের অঙ্গ হইতে পারিবে না। শিক্ষা সমাপ্তির পর বিবাহ করা বা না করা তাহাদের ইচ্ছাধীন ।

১৯। আপাততঃ কেবল সদ্বংশজাত হিন্দু-বালকই গৃহীত হইবে।

২০। ধর্ম্মের মধ্য দিয়া না হইলে ভারতবর্ষে কোন ভাব চলে না। এই জন্য অর্থ, বিদ্যা, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি সমস্তই ধর্ম্মমধ্য দিয়া চালাইতে হইবে।

২১। এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চ্চা ও ধর্ম্ম-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ "টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট" করিতে হইবে। এইটী প্রথম কর্তব্য। পরে অন্যান্য অবয়ব ক্রমে ক্রমে সংযুক্ত হইবে।

২২। ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখের মূল — "নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ হওয়া'। এই ভেদ নাশ না হইলে কোনও কল্যাণের আশা নাই। এই জন্য সকল স্থানে প্রচারক পাঠাইয়া ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে।

২৩। অতএব এই মঠে যাঁহারা এক্ষণে অধ্যক্ষ আছেন বা পরে অধ্যক্ষ হইবেন, তাঁহারা সর্ব্বদা যেন এইটী মনে রাখেন যে, এই মঠ কোনমতেই বাবাজীদিগের ঠাকুরবাটীতে পরিণত না হয়।

২৪। ঠাকুরবাটী দ্বারা দুই চারিজনের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, দুই দশজনের কৌতুহল চরিতার্থ হয়, কিন্তু এই মঠের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে।

মঠ - (২)

১।প্রীতি, অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞাবহতা, সহিষ্ণুতা ও একান্ত পবিত্রতাই ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে একতারক্ষার এক মাত্র কারণ।

২। সর্ব্বাপেক্ষা উদ্দেশ্যের একতা ঐক্যবন্ধনের প্রধান কারণ।

৩। আমাদের ঠাকুর মানের জন্য আসেন নাই, আমরা তাঁহার দাস, আমরাও মান ভোগের আকাঙক্ষী নহি। কেবল নিজে পবিত্র থাকিয়া অন্যকে পবিত্রতা শিক্ষা দিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

৪।এই মঠের প্রত্যেক অঙ্গেরই ভাবা উচিৎ যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে তিনি যেন শ্রীভগবানের মহিমা প্রকাশ করেন। তিনি যেখানেই যান বা যে অবস্থাতেই থাকুন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি, এবং লোকে তাঁহার মধ্য দিয়াই শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিবে।

৫। এই ভাবটী সদা মনে জাগরূক থাকিলে আর বেচালে পা পড়িবে না।

৬।আজ্ঞাবহতাই কার্য্যকারিতার প্রধান সহায়।অতএব প্রাণভয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞাপালন করিতে হইবে। সকল দুঃখের মূল ভয়। ভয়ই মহাপাপ, সেই ভয় একেবারেই ছাড়িতে হইবে।

৭।অপরের নামে গোপনে নিন্দা করা ভ্রাতৃভাব বিচ্ছেদের প্রধান কারণ। অতএব কেহই তাহা করিবে না। যদি কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে ত একান্তে তাহাকেই বলা হইবে।

৮। তাঁহার সেবক বা সেবকদের মধ্যে কেহই মন্দ নহে। মন্দ হইলে কেহ এখানে আসিত না। অতএব কাহাকেও মন্দ ভাবিবার অগ্রে "আমি মন্দ দেখি কেন?" প্রথম ভাবা উচিত।

৯। পুরুষানুক্রমে উদ্দেশ্যের একতানতাই (Continuance of Policy) মহৎকার্য্য সাধনের ও উত্তরোত্তর শক্তিসঞ্চয়ের একমাত্র কারণ। অর্থাৎ আমাদের পুর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য একজন মঠাধ্যক্ষ যে কার্য্যপ্রণালী পরিচালিত করিবেন, তাঁহার উত্তরাধিকারী তাহাই যেন অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হয়েন।

১০। সংহতিই অভ্যুত্থানের প্রধান উপায় ও শক্তিসংগ্রহের একমাত্র পন্থা। অতএব যে কেহ কায় মন ও বাক্যের দ্বারা এই সংহতির বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার মস্তকে সমস্ত সঙেঘর অভিশাপ নিপতিত হইবে এবং তিনি ইহপরলোক উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইবেন।

১১। যদি কাহারও পদস্খলিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত সঙেঘর নিকট আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া সঙ্ঘ যাহা বিধান করেন, তাহাই অবনত মস্তকে পালন করিবে।

১২। যে কেহ অপরাধ করিয়া তাহা অস্বীকার পূর্ব্বক সঙেঘর সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হন, তিনিও ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হইবেন।

১৩। কারণ, এই সঙ্ঘই তাঁহার অঙ্গস্বরূপ এবং এই সঙেঘই তিনি সদা বিরাজিত।

১৪।একীভূত সঙ্ঘ যে আদেশ করেন তাহাই প্রভুর আদেশ, সঙ্ঘকে যিনি পূজা করেন তিনি প্রভুকে পূজা করেন, এবং সঙ্ঘকে যিনি অমান্য করেন তিনি প্রভুকে অমান্য করেন।

মত

১। ঠাকুরের উক্তিসকল একত্র করিয়া তাহাকে একমাত্র শাস্ত্র করিলে তাঁহার বিশাল ভাব ও আমাদের আজীবন পরিশ্রমের এই মাত্র ফল হইবে যে, আমরা একটি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের স্রষ্টা হইব ও বহু বিবদমান ভাগে বিভক্ত এই সমাজকে আরও কোলাহলময় করিয়া তুলিব।

২। অতএব আমাদের সনাতন শাস্ত্র বেদই একমাত্র শাস্ত্ররূপে পরিগৃহীত ও প্রচারিত হইবে, ও গীতা যে প্রকার পুরাকালে ছিল সেই প্রকার ঠাকুরের উক্তি আধুনিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বেদমতের ব্যাখ্যা।

৩। অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সমস্ত ভাষ্যকারেরাই এক এই বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া ছিলেন যে, সমগ্র বেদরাশিই এক কথা বলিতেছেন। সেইজন্য আপাতবিসম্বাদী উক্তিসকলের মধ্যে স্বীয় মতের বিরুদ্ধ উক্তিগুলিকে বলপূর্বক আপন মতানুযায়ী অর্থকরণ দোষে দূষিত হইয়াছেন।

৪। পুরাকালে যে প্রকার একমাত্র গীতা বক্তা ভগবান্ই এই সকল আপাতবিবদমান উক্তিসকলের মধ্যে কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন, কালে অতীব বিশালতাপ্রাপ্ত সেই বিবাদ নিঃশেষে ভঞ্জন করিবার জন্যই তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

৫। এইজন্য তাঁহার উক্তিসকলের মধ্য দিয়া না পড়িলে ও তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়া না দেখিলে বেদ বেদান্ত বুঝিবার কাহারও শক্তি নাই। অর্থাৎ, এই যে সকল স্থূল দৃষ্টিতে বিসম্বাদী শাস্ত্রোক্তি অধিকারিবিশেষে উপদিষ্ট ও ক্রমবিকাশের প্রণালীতে নির্দ্দিষ্ট, ইহা শ্রীভগবান্ই প্রথমে নিজের জীবনে প্রকাশ ও উপদেশ করেন এবং সমস্ত জগৎ বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ে যে ভ্রাতৃভাবে নিবন্ধ হইবে, তাহা এই কেন্দ্র হইতেই ক্রমশঃ দূরবিসর্পী প্রভাব-চক্রবাল দ্বারা অনুমিত হইতেছে।

৬। অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র এতদিন অজ্ঞানান্ধকারে লুপ্ত ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণরূপ প্রদীপ উহাকে পুনঃপ্রকাশিত করিল।

৭। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, নুতন শাস্ত্র অনাবশ্যক। প্রাচীন অনাদি শাস্ত্র হইতে নতূন আলোক আসিতেছে;শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অনুবীক্ষণের মধ্য দিয়া এই শাস্ত্রের মর্ম্ম সংগ্রহ করিতে হইবে।

৮। ঠাকুরের উক্তি সকল উত্তমরূপে সংগৃহীত ও যে সকল সেবক ঠাকুরের নিকট সর্ব্বদা থাকিতেন তাঁহাদের দ্বারা পরিগৃহীত হইলে বেদের টীকারূপে পূজিত হইবে।

৯। ঠাকুরের ভাবের অনুকূল বেদার্থ করিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা এই ভাব যেন সর্ব্বদা মনে থাকে যে, তাঁহার সমস্ত উপদেশই জগতের হিতের জন্য। যদি কেহ কখন কোন অহিতকর বাক্য শুনিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝা উচিত যে, সে বাক্য অধিকারিবিশেষে প্রযুক্ত এবং অন্য লোকে পালন করিলে অকল্যাণকর হইলেও সেই অধিকারীর জন্য মঙ্গলপ্রদ।

১০। ঐ প্রকার ঠাকুরের সমস্ত উক্তির মধ্যে ব্যক্তিবিশেষে উপদিষ্ট ও সার্ব্বজনিক কল্যাণের জন্য উপদিষ্ট উক্তি বাছিয়া লইতে হইবে। তন্মধ্যে সার্ব্বজনিক কল্যাণ প্রযুক্ত উপদেশ সমুহই পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইবে ও জনসাধারণে প্রচারিত হইবে।

১১। অধিকারিবিশেষে উপদিষ্ট উপদেশ সকলও সংগৃহীত হইয়া গোপনভাবে মঠে পরিরক্ষিত হইবে — যাহা দ্বারা মঠের প্রচারকগণ ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ উপদেশ প্রদানে শিক্ষিত হইবেন।

১২। প্রভুর নিজের মুখের একটি উপদেশ এই যে, যাহারা বহুরূপী একবার দর্শন করিয়াছে তাহারা বহুরূপীর একটীমাত্র রঙই জানে;কিন্তু যাহারা বৃক্ষের তলায় বাস করিয়াছে তাহারা বহুরূপীর সকল বর্ণই জ্ঞাত থাকে। এইজন্য যাঁহারা প্রভুর নিকট সর্ব্বদা বাস করিতেন ও যাঁহাদিগকে তিনি স্বীয় কার্য্যসাধনের জন্য পালন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্মতি ব্যতিরিক্ত কোন উক্তিই প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইবে না।

১৩। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা সমষ্টিস্বরূপ এরূপ অপূর্ব্ব পুরুষ আর মানবজাতির মধ্যে কখনই সমুদিত হন নাই। ঐ প্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যাঁহার চরিত্র, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যথার্থ শিষ্য ও অনুগামী।

১৪। ঐ প্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র গঠনই এই যুগের উদ্দেশ্য ও তাহার জন্যই সকলের প্রাণপণ চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

সাধন প্রণালী

১। শ্রী ভগবান্ ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন সাধন শিক্ষা দিতেন। এইজন্য সাধন প্রণালীর সার্ব্বজনীন কোন নিয়ম হইতে পারে না।

২। তবে লোকসাধারণের জন্য কিঞ্চিৎ ভক্তি, ভজন ও কর্ম্মপরিণত জ্ঞান (Practical Advaitism — "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর") শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে।

৩। প্রভুর প্রদর্শিত সমুদয় সাধন প্রণালী পূর্বোক্ত প্রকারে সংগৃহীত হইয়া গোপনভাবে মঠে পরিরক্ষিত হইবে এবং শিক্ষকদিগের শিক্ষার জন্য থাকিবে, কারণ, ব্যক্তিবিশেষে উপদিষ্ট সাধন অপর ব্যক্তির অনিষ্টকারকও হইতে পারে।

৪। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করা এই মঠের উদ্দেশ্য এবং তন্নিমিত্ত যে সকল সাধন করা প্রয়োজন সেই সকল সাধনই এই মঠের সাধন বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

৫। অতএব সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, এই সকল অঙ্গের যিনি একটীতেও ন্যূনতা প্রদর্শন করেন, তাঁহার চরিত্র রামকৃষ্ণরূপ মূষায় প্রকৃষ্টরূপে দ্রুত হয় নাই।

৬। আরও ইহা মনে রাখা উচিত যে, নিজের মুক্তি সাধনের জন্যমাত্র যিনি চেষ্টা করেন তদপেক্ষা যিনি অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন তিনি মহত্তর কার্য্য করেন।

৭। এই শিক্ষার জন্য প্রথমতঃ এই মঠ চতুর্বিভাগে বিভক্ত হইবেঙ্গ যথা — জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও যোগ;এবং প্রত্যেক বিভাগেই ঐ বিভাগের শিক্ষিতব্য বিষয়ের উপদেশের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণ উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত থাকিবেন।

৮। প্রত্যেক বিভাগেই ঐ বিভাগের শিক্ষিতব্য বিষয়ের উপযোগী পুস্তকাদি পাঠ হইবে ও অনুভূতির নিমিত্ত সাধন শিক্ষিত হইবে।

৯। কিন্তু সকল বিভাগেরই অঙ্গাদিকে কিছু না কিছু কর্ম্মবিভাগের কার্য্য করিতে হইবে ।

১০। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম।" অতএব শরীররক্ষার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবে কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনে যদি শরীর পাত হয়, পরমকল্যাণ বুঝিতে হইবে ।

১১। গীতাদি শাস্ত্র এবং শ্রীভগবান্ স্বয়ংও বৃথা কঠোর তপস্যার প্রতিপক্ষ ছিলেন। অতএব তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু যে সকল তপস্যা শারীরিক কিঞ্চিৎ ক্লেশপ্রদ হইলেও বিশেষ কল্যাণকর, সকলেরই ঐ সকল তপস্যা অভ্যাস করা আবশ্যক; নতুবা বিলাসিতা প্রবেশ করিয়া সর্বনাশ করিবে।

১২। আমাদের উদ্দেশ্য বিলাসিতাও নহে, তপস্যাও নহে, অথবা যোগও নহে; উদ্দেশ্য— ভববন্ধন ছেদন, জ্ঞানলাভ বা ভক্তিলাভ।

১৩। অতএব যে কোন উপায় দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, আমরা মহা সমাদরে তাহাই গ্রহণ করিব।

১৪। শ্রীভগবান্ এখনও রামকৃষ্ণশরীর ত্যাগ করেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে এখনও সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতে পারেন। যতদিন তিনি পুনর্ব্বার স্থূল শরীরে আগমন না করিতেছেন ততদিন তাঁহার এই শরীর থাকিবে। সকলের প্রত্যক্ষ না হইলেও তিনি যে এই সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া এই সঙ্ঘকে পরিচালিত করিতেছেন ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ; তাহা না হইলে এই নগণ্য, অত্যল্পসংখ্যক, অসহায়, পরিতাড়িত বালকদিগের দ্বারা এতাদৃশ স্বল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভুমণ্ডলে এত আন্দোলন কখনই সংঘটিত হইত না।

১৫। অতএব এই সঙ্ঘের মধ্যে যদি কেহ শ্রীভগবানের উপদেশের অবিসম্বাদী কোন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন এবং তাহার সুফল যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে উহাও শ্রীভগবানের আদেশরূপে গৃহীত, আদৃত ও পালিত হইবে।

১৬। শ্রীভগবান্ কামিনীকাঞ্চনের ন্যায় আর কোন ভাবকে যদি বারম্বার ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া থাকেন তাহা এই যে, ঈশ্বরের অনন্ত ভাবকে ইতি ইতি করিয়া সীমাবদ্ধ করা।

১৭। যে কেহ ঐ প্রকারে শ্রীভগবানের অনন্তভাবকে সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে, সে নরাধম তাঁহার দ্বেষী।

১৮। সঙ্কীর্ণ সমাজে ধর্মের গভীরতা ও প্রবলতা থাকে, ক্ষীণবপু জলধারা সমধিক বেগশালিনী। উদার সমাজে ভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গভীরতা ও বেগের নাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সমস্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া এই রামকৃষ্ণ-শরীরে সমুদ্র হইতেও গভীর ও আকাশ হইতেও বিস্তৃত ভাব রাশির একত্র সমাবেশ হইয়াছে।

২০। উহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অতি বিশালতা, অতি উদারতা ও মহা প্রবলতা একাধারে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে এবং ঐ প্রকারে সমাজও গঠিত হইতে পারে। কারণ, ব্যষ্টির সমষ্টির নামই সমাজ।

ভক্তি

১। সেবা, জপ, ভজনাদি যে সকল ভক্তি সাধনের উপায় পুরাকালে বা আধুনিক কালে উপদিষ্ট হইয়াছে অথবা ভবিষ্যতে উপদিষ্ট হইবে সেই সমুদয়ই সমাদরে পরিগৃহীত হইবে। কিন্তু তন্মধ্যে সাবধানের বিষয় এই যে, অনেক সময় ভক্তিমাত্রেই চরিত্র গঠিত হয় না। আচার পূত (moral) না হইলে কাহারও ভক্তিতে অধিকার নাই, ইহা বিশেষ রূপে মনে রাখিতে হইবে।

২। সঙ্কীর্ত্তনের উৎসাহে লম্ফঝম্প করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীকে পর্য্যস্ত করতঃ মূর্চ্ছাগ্রস্ত হওয়াই ভক্তি নহে, ইহাও যেন সকলের মনে থাকে।

৩। ভক্তির প্রবলতায় যোগের উচ্চ সীমায় উপস্থিত হওয়া যায়। কিন্তু লম্ফ ঝম্প করিলে, বা মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইলে, অথবা উক্ত ভাবকালে অলৌকিক দর্শন হইলেই যে জীব সমাধি-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধান্ত নহে।

৪। ভক্তির প্রভাবে সমাধি উপস্থিত হইয়াছে, বা স্নায়ুর তাড়নায় স্বপ্নসন্দর্শন হইতেছে, ইহা স্থির করিতে হইবে ।

৫। শ্রী ভগবান্ ভাবসমাধির পরে যে সকল ঘটনা দেখিতেন বা ভবিষ্যৎবাণী করিতেন, সে সমস্তই ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হইতেছে। অপিচ সেই অবস্থাতে তাঁহার প্রত্যেক প্রত্যক্ষই জীবের কল্যাণের কারণ, স্বার্থশূন্য ও সদাচারপূর্ণ।

৬। যদি কাহারও ঐ প্রকার ভাবসমাধি হয় তাহা হইলে তাহা ভক্তিসাধনের ফলস্বরূপ বুঝিতে হইবে। আর যদি উহা স্বার্থপূর্ণ, সদাচারবিরোধী ও নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত বুঝিতে হইবে, এবং যাহাতে তাহার সেই রোগ উপশমিত হয় তাহার জন্য যত্ন করিতে হইবে।

৭। অধ্যক্ষদিগের ইহাও বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, ভক্ত্যাদি অঙ্গের একটি প্রবল হইয়া অপরগুলিকে নিরস্ত না করে।

৮। ভক্তিভাব বৃদ্ধির জন্য ভজন স্বরূপ ভগবানের গুণানুবাদ গীত হইবে। এবং উহাতে তাল মানাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে ।

ঠাকুর ঘর

১। এই মঠের প্রত্যেক অঙ্গই ঠাকুরঘরে যাইয়া পূজা করিতে পারিবেন।

২। ঠাকুর স্থাপন, পূজা, ভোগরাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে পরমহংসদেবের কোন উপদেশ নাই। ইহা তাঁহার সম্মানের জন্য আমরা কল্পনা করিয়াছি।

৩। যোগ, ধ্যান, ভজন, জপ ইত্যাদিই তাঁহার প্রধান শিক্ষা। মঠে বর্ত্তমান ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহই একথা স্বীকার করেন না যে, পরমহংসদেব কাহাকেও মূর্ত্তিস্থাপন, পূজা, ভোগরাগাদির উপদেশ করিয়াছেন। কেবল তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় কোন কোন শিষ্যকে নিজমূর্ত্তি ধ্যান করিতে বলিতেন।

৪। প্রভুর উপদেশানুসারে কার্য্য করাই তাঁহাকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা।

৫। অতএব প্রভুর নিজ জীবনে প্রদর্শিত ও তাঁহার মুখে উপদিষ্ট ধ্যান, ভজন ইত্যাদি উচ্চ অঙ্গের ভক্তিমুক্তিপ্রদ সাধনের শিক্ষা ও সিদ্ধির নিমিত্ত, আম্লেচ্ছচণ্ডলাদি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঐ সকল ভাব প্রচার করিবার জন্য এই মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

৬। যে কেহ পবিত্রহৃদয়ে যে কোন প্রকারে তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করেন , তিনিই ত্যাগী হইলে এই মঠের অঙ্গস্বরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। প্রভুকে তিনি ঈশ্বর ভাবে, অবতার ভাবে বা সাধারণ গুরু ভাবে গ্রহণ করুন তাহাতে ইষ্টাপত্তি নাই।

৭। মূর্ত্তিপূজাদি অন্যান্য ভাবও যথাস্থানে পরিরক্ষিত হইবে। কিন্তু প্রভুরপ্রদর্শিত শিক্ষাপ্রণালীই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবে ও সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রযত্নের অধিকারী হইবে।

৮। অর্থাৎ প্রত্যেকেই এইটী বিশেষ মনে রাখিবেন যে, যিনি ধ্যান, ভজন ইত্যাদি প্রণালী ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মূর্ত্তিপূজা, ভোগরাগ ইত্যাদিতে ব্যস্ত আছেন, তিনি প্রভুর প্রদর্শিত শিক্ষা প্রণালীকে অবজ্ঞা করিতেছেন। ধ্যান ভজন ইত্যাদি প্রধান কর্ত্তব্যের সঙ্গে মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি আর সমস্ত থাকুক, হানি নাই।

ভারতবর্ষের কার্য্যপ্রণালী

১। মুসলমানগণ যখন এইদেশে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের ঐতিহাসিক মতে এই ভারতবর্ষে ৬০ কোটী হিন্দুর অধিবসতি ছিল। এই গণনায় অত্যুক্তিদোষ না থাকিয়া বরং অনুক্তি দোষ আছে, কারণ, মুসলমানদিগের অত্যাচারেই অনেক প্রজা ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটীরও অধিক ছিল; কিছুতেই ন্যূন নয়। কিন্তু আজ সে হিন্দু ২০ কোটীতে পরিণত হইয়াছে। তাহার উপর খ্রীষ্টানরাজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২ কোটী লোক খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে এবং প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষাধিক লোক খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে। এই হিন্দু জাতি ও ধর্ম্মের রক্ষার জন্যই করুণাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন।

২। জাতিবিভাগেই আমাদের সমাজ গঠিত। সকল সমাজই ঐ প্রকারে গঠিত। তবে আমাদের সমাজ ও অন্যান্য সমাজে কিছু প্রভেদ আছে।

৩। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে দুইটি মহাশক্তি নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। এই দুই মহাশক্তির সঙঘর্ষেই জগতের বৈচিত্র ও লীলা সংঘটিত হইতেছে। মানবসমাজেও এই দুই শক্তি জাতি রূপ বৈচিত্র প্রতিনিয়ত উৎপাদন করিতেছে ও করিবে। এই বৈচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর ছায়ার ন্যায় অধিকারতারতম্য মানবসমাজে উপস্থিত হইতেছে।

৪। ঐ দুইটি শক্তির মধ্যে একটি অধিকারতারতম্যের অনুকুল ও দ্বিতীয়টী তাহার প্রতিকূলে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে।

৫। বৈচিত্র জগতের প্রাণ। এবং এই বৈচিত্ররূপ জাতি কখনও বিনষ্ট হইবার নহে। অর্থাৎ বুদ্ধি ও শক্তির তারতম্যে ব্যক্তিবিশেষে ক্রিয়ার বিশেষত্ব থাকিবেই। যথা, কেহ সমাজ শাসনে পারদর্শী কেহ বা পথের ধুলি পরিষ্করণে ক্ষমবান। এই বলিয়া সমাজ শাসনে পারদর্শী মানবেরই যে জগতের যাবতীয় সুখভোগে অধিকার থাকিবে এবং পথের ধুলি-পরিষ্কারক অনাহারে মরিবেন, ইহাই সামাজিক অকল্যাণের মূল কারণ। আমাদের দেশে সম্প্রতি যত জাতি আছে তদপেক্ষা যদি লক্ষাধিক জাতি হয়, তবে কল্যাণ বই অকল্যাণ নাই। কারণ যে দেশে জাতির সংখ্যা যত অধিক সে দেশে শিল্পাদি ব্যবসায়ের সংখ্যা ততই অধিক; কিন্তু মৃত্যুর ছায়া রূপ ভোগতারতম্যরূপ জাতির বিপক্ষেই সংগ্রাম চলিতেছে। যে জাতি এ সংগ্রামে যত পরাজিত তাহার দুর্দ্দশা ততই অধিক। এ সংগ্রামে যে জাতি যে পরিমাণে জয়লাভ করিতেছেন, সে জাতি সেই পরিমাণে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছেন।

৬। সমাজে যাহাকে সমাজনীতি বা politics বলে, তাহা কেবল এই ভোগতারতম্য-সমুত্থিত অধিকার-প্রাপ্ত ও অধিকার — নিরাকৃত জাতিসমূহের সংগ্রামের নাম ।

৭। এই অধিকারতারতম্যের মহাসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ভারতবর্ষ গতপ্রাণপ্রায় পতিত হইয়াছে।

৮। অতএব বাহ্যজাতির সহিত সাম্য স্থাপন অতি দূরের কথা, যতদিন এ ভারত নিজগৃহে সাম্য স্থাপন করিতে না পারিবে, ততদিন তাহার পুনর্জ্জীবনী শক্তি লাভের আশা নাই।

৯। অর্থাৎ সার কথা এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিবিভাগ কোন দোষের নহে;কিন্তু ভোগাধিকার তারতম্যই মহা অনর্থের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

১০। অতএব আমাদের উদ্দেশ্য জাতিবিভাগ নষ্ট করা নয়;কিন্তু ভোগাধিকারের সাম্যসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। আচণ্ডালে যাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অধিকার সহায়তা হয়, তাহার সাধন করাই আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত।

১১। এই ভারত পুনর্ব্বার জাগ্রত হইবে। এবং যে মহাতরঙ্গ এই কেন্দ্র হইতে সমুত্থিত হইয়াছে, মহাপ্লাবনের ন্যায় তাহা সমগ্র মানবজাতিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া মুক্তিমুখে লইয়া যাইবে। ইহা আমাদের বিশ্বাস এবং শিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রাণপণে ইহারই সাধনে আমরা কটিবদ্ধ।

১২। যে কেহ ইহাতে বিশ্বাস করিবে, সেই প্রভুর কৃপায় মহাবীর্য্য ও ওজস্বিতা লাভ করিবে।

১৩। পাশ্চাত্য আলোকের প্রভায় এই ভারতভূমি অধুনা কিঞ্চিৎ প্রতিভাত হইতেছে। ধীরে ধীরে এই সুপ্ত জাতির মধ্যে পাশ্চাত্য মহাজাতি সমুহের অধিকার তারতম্য ভঞ্জনের বিরাট্ উদ্যম ও প্রাণপণ সংগ্রামের বার্তা অস্মদ্দেশীয় পরাহত প্রাণেও কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার করিতেছে। মানবসাধারণের অধিকার, আত্মার মহিমা নানা বিকৃত সুকৃত প্রণালীমধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈঃ এ দেশের ধমনীতে প্রবেশ করিতেছে। নিরাকৃত জাতি সকল আপনাদের লুপ্ত অধিকার পুনর্ব্বার চাহিতেছে। এ সময়ে যদি বিদ্যা, ধর্ম্ম ইত্যাদি জাতিবিশেষে আবদ্ধ থাকে, তবে সে বিদ্যার ও সে ধর্ম্মের নাশ হইয়া যাইবে।

১৪। তিন বিপদ্ আমাদের সন্মুখে – (১) ব্রাহ্মণ-ব্যতিরিক্ত আর সমস্ত বর্ণ একত্রিত হইয়া পুরাকালে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষের ন্যায় এক নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবে ;(২) বাহ্যদেশীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে;অথবা (৩) সমস্ত ধর্ম্মভাব ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

১৫। প্রথম পক্ষে এই অতিপ্রাচীন সভ্যতা সমাধানে সমস্ত প্রযত্নই বিফল হইয়া যাইবে। এই ভারতবর্ষ পুনরায় বালকত্বপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হইয়া উন্নতির পথে বহুকালান্তরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবে। দ্বিতীয় কল্পে ভারতীয় সভ্যতার ও আর্য্যজাতির বিনাশ অতি শীঘ্রই সাধিত হইবে। কারণ, যে কেহ হিন্দু ধর্ম্ম হইতে বাহিরে যায়, আমরা যে কেবল তাহাকে হারাই তাহা নয়, একটী শত্রু অধিক হয়। ঐ প্রকার স্বগৃহ - উচ্ছেদকারী শত্রুদ্বারায় মুসলমান অধিকারকালে যে মহা অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তৃতীয় কল্পে মহাভয়ের কারণ এই যে, যে ব্যক্তির বা জাতির যে বিষয়ে প্রাণের ভিত্তি পরিস্থাপিত, তাহা বিনষ্ট হইলে সে জাতিও নষ্ট হইয়া যায়। আর্য্যজাতির জীবন ধর্ম্মভিত্তিতে উপস্থাপিত। তাহা নষ্ট হইয়া গেলে আর্য্যজাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

১৬। নদীবেগ আপনা হইতেই বাধাহীন পথ নির্ব্বাচিত করিয়া লয়। সমাজের কল্যাণ-স্রোতও সেই প্রকার বাধাহীন পথে আপনা হইতেই চলে। অতএব সমাজকে ঐ প্রকার পথে লইয়া যাইতে হইবে।

১৭। এই ভারতবর্ষ স্বগৃহজাত ও বাহ্যদেশসমাগত বহু জাতিতে পরিপূর্ণ। আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যভাব ইহাদের অধিকাংশের মধ্যে এখনও প্রবিষ্ট হয় নাই।

১৮। অতএব এই ভারতবর্ষকে প্রথমতঃ আর্য্যভাবাপন্ন করিলে, আর্য্যাধিকার দিলে, আর্য্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থে ও সাধনে সকলকে সমভাবে আহ্বান করিলে এই মহা বিপদ্ হইতে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব। এই জন্য প্রথমতঃ যে সকল জাতি সংস্কারবিহীন হইয়া আর্য্যধর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ বিচ্যুত হইয়াছে, পুনঃসংস্কার দ্বারা আর্য্যজাতির ধর্ম্মে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে। মনুষ্যের যেখানে অধিকার, সেখানেই তাহার প্রেম। নতুবা ব্রাহ্মণ মাত্রেরই ধর্ম্ম বলিয়া অন্যান্য জাতি পরিত্যাগ করিবে। ঐ প্রকার আচণ্ডাল সর্ব্বজাতিকে ও ম্লেচ্ছাদি বাহ্যজাতিকেও সংস্কারাদি দ্বারা হিন্দুসমাজকে বিস্তৃত করিতে হইবে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। অধুনা শাস্ত্রোক্ত অধিকারী হইয়াও যাহারা নিজ অজ্ঞতায় সংস্কারবিহীন, তাহাদিগকে সংস্কৃত করা কর্ত্তব্য।

১৯। এই প্রকারে শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের প্রচার ও প্রচারক বহুল হইবে।

২০। মুসলমান বা খ্রীষ্টানদিগকেও হিন্দু ধর্ম্মে আনিবার বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইবে। কিন্তু উপনয়নাদি সংস্কার কিছুদিনের জন্য তাহাদের মধ্যে হওয়ার আবশ্যক নাই।

২১। এই জগতের আবার সেই অবস্থা যখন "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" পুনরায় হইবে, যখন শূদ্রবল, বৈশ্যবল, ও ক্ষত্রিয়বলের আর আবশ্যকতা থাকিবে না, যখন মানবসন্তান যোগবিভূতিতে বিভূষিত হইয়াই জন্ম পরিগ্রহ করিবে, যখন চৈতন্যময়ী শক্তি জড়া শক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিবে; তখন রোগশোক আর মনুষ্য শরীরকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, ইন্দ্রিয় সকল আর মনের প্রতিকূলে ধাবমান হইতে পারিবে না, পশুবলপ্রয়োগ পুরাকালের স্বপ্নের ন্যায় লোকস্মৃতি হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইবে। যখন এই ভূমণ্ডলে প্রেমই একমাত্র সর্ব্বকার্য্যের প্রেরয়িতা হইবে, — তখনই সমগ্র মনুষ্য জাতি ব্রাহ্মণ্যবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে। তখনই জাতিভেদ লুপ্ত হইয়া প্রাচীন ঋষিদিগের দৃষ্ট সত্যযুগ সমুপস্থিত হইবে। সেই পথে যে জাতি বিভাগ ক্রমশঃ অগ্রসর করে, তাহাকেই অবলম্বন করিতে হইবে। যে জাতি বিভাগ জাতিভেদনাশের প্রকৃষ্ট উপায় তাহাই সুপরিগৃহীত হইবে।

২২। স্বগোত্রে বা যে সকল গোত্রের সহিত অতি নিকট রুধির সম্বন্ধ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধবন্ধন হওয়াই জাতির শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। দুর্ব্বলশরীরধারী জাতি কখনও মহান হইতে পারে না, ইহাও ইতিহাস প্রসিদ্ধ। অতএব হিন্দুদিগের শরীর যাহাতে সমধিক বলবিশিষ্ট হয়, তাহার উপায় বিধান করা এক প্রধান কর্ত্তব্য।

২৩। জাতিভেদে বিবাহ স্থগিত করা, ও এক এক জাতির মধ্যে বহুশাখাভেদ হইয়া তাহাদের মধ্যে আদান প্রদান বন্ধ হওয়া, ও তাহার উপর কৌলীন্য প্রথা দ্বারায় বিবাহের পরিধি আরও সঙ্কীর্ণ হওয়ায় রক্ত দূষিত হইয়া জীবনীশক্তি ও বলের অত্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে।

২৪। ইহার প্রতিবিধান করিতে গেলে প্রথমতঃ প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে সকল অবান্তর বিভাগ আছে তাহাদের মধ্যে যাহাতে আদান প্রদান হয় তাহার উদ্যোগ করা উচিত।

২৫। "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভূজো যথা।" যে সম্প্রদায়ে শক্তিরাশি সমাহিত তাহারা সমাজকে যে দিকে চালাইবে সমাজ সেই দিকেই চলিবে। পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা ও বিদ্যাধারতাই এই শক্তিসঞ্চয়ের উপায়। যত অধিক পরিমাণে উহা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হইবে, তত অধিক পরিমাণে আমরা সমাজের উপর কার্য্য করিতে পারিব।

২৬। উহা সাধিত করিতে গেলে একটী মহাবলশালী সমাজের সৃষ্টি করিতে হয়, যাহার প্রাণশক্তি ভারতের অস্থিমজ্জায় ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হইয়া মৃতপ্রায় ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে।

২৭। লোকভয়ে, অন্নাভাবের ভয়ে, মানহানির ভয়ে মনুষ্য সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইলেও নূতন উদ্যমে উদ্‌যুক্ত হয় না । তাহার উপর যে সমাজ যত অধিক দিন পথবিশেষকে অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে নূতন কোনও পথাবলম্বন করা ততই কঠিন হয়। অতএব এই মহাবলশালী সমাজভিত্তি সৃষ্টি করিতে হইলে নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন করাই একমাত্র উপায়। যে স্থানে নরনারী প্রাক্তন সংস্কারাপেক্ষাও কঠিনতর বন্ধন সমাজ শাসন হইতে দূর থাকিয়া নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম প্রয়োগ করিয়া নববলে বলীয়ান্ হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে উপনিবেশ স্থাপনের উপায় নাই।

২৮। মধ্যভারতে হাজারীবাগ প্রভৃতি জেলার নিকট উর্ব্বর, সজল, স্বাস্থ্যকর অনেক ভূমি এখনও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ প্রদেশে এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া তাহার উপরে একটি বৃহৎ শিল্প-বিদ্যালয় ও ধীরে ধীরে কারখানা ইত্যাদি খুলিতে হইবে। অন্নাগমের নূতন পথ যেমন আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে, লোক তেমনই উক্ত উপনিবেশে আসিতে থাকিবে। তখন তাহাদিগকে যে প্রকারে গঠিত করিবে সে প্রকারেই গঠিত হইবে।

মঠের নিয়মাবলী*

১। এই মঠই প্রধান মঠরূপে নির্দ্ধারিত হইল। ইহার অধীনস্থ সমুদয় মঠকেই ইহার নিয়মাবলী অনুসারে চলিতে হইবে।

২। এই মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ মাত্র এই মঠসংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। এস্থলে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ বলিলে শ্রী রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণকে বুঝিতে হইবে।

৩। সমুদয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ মিলিয়া একটী প্রধান অধ্যক্ষ নির্দ্ধারিত করিবেন।

৪। উক্ত প্রধানাধ্যক্ষের সহিত, এক, দুই বা ততোধিক সহকারী নির্দ্ধারিত হইবেন।

৫। কোন বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে হইলে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের ৩/৪ অংশের মত হইলেই চলিবে। আপাততঃ ৪ বৎসরের জন্য প্রধানাধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকারীরা সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের অমত সত্ত্বেও কার্য্য করিতে পারিবেন।

৬। প্রত্যেক সন্ন্যাসী দুইটী ও প্রত্যেক ব্রহ্মচারী একটী ভোট দিতে পারিবেন।

৭। মঠে তামাক ব্যতীত অন্য কোন মাদক দ্রব্য সেবন নিষেধ। সকলেই পরস্পর সদ্ভাবে কথাবার্ত্তা কহিবেন। যখন কাহারও কিছু আবশ্যক হইবে তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষকে জানাইবেন ।

৮। ব্রহ্মচারিগণ সন্ন্যাসিগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন ।

৯। সকল ধর্ম্ম, ধর্ম্মপ্রচারক ও সকল ধর্ম্মের উপাস্য দেবতার প্রতিই যথাযোগ্য ভক্তি-সম্মান রাখিতে হইবে ।

১০। যথা সম্ভব সকলেই প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবেন। গাত্রবস্ত্রাদি সমুদয় পরিষ্কার রাখিতে হইবে ।

১১। কর্ম্মাধ্যক্ষ দেখিবেন যেন সকলে সমুদয় পরিষ্কার রাখেন ও যথাকালে উপযুক্ত আহার পান।

১২। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সকলকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যায়াম করিতে হইবে ।

১৩। মঠাধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকারী দেখিবেন যেন সকলে প্রাতঃকালে নিজ নিজ রুচির অনুযায়ী জপ, ধ্যান, পূজা পাঠাদি করেন ।

১৪। যথাসম্ভব সকলে একত্র আহার করিবেন। তৎপরে দুইঘণ্টা বিশ্রাম করিবেন ।

১৫। তৎপরে প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ বা দুই তিন জনে একত্র মিলিত হইয়া শাস্ত্র পাঠ করিবেন

১৬। অপরাহ্নে পুনরায় পাঠ হইবে। তাহাতে একজন পাঠক থাকিবেন ও সকলেই শুনিবেন।

১৭। সন্ধ্যার পর পুনরায় জপ, ধ্যান ও স্তব পাঠাদি হইবে।

১৮। সমুদয় কার্য্য ও কথাবার্ত্তা শান্তভাবে করিতে হইবে।

১৯। যাঁহারা বাহিরে ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইবেন, তাঁহারা প্রধান মঠের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। যাঁহারা প্রচার বা ভ্রমণ করিতে বাহিরে যাইবেন, তাঁহারা প্রতি সপ্তাহে তাঁহাদের প্রচার বা ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বলিত অন্যূন একখানি পত্র মঠে লিখিবেন। যাঁহারা চিঠি পত্রাদি রাখিবেন তাঁহারা ঐগুলি বিশেষরূপে রক্ষা করিবেন, ও মঠাধ্যক্ষের আদেশ ও উপদেশমত তাঁহাদিগকে পত্র লিখিবেন ও তাহার প্রতিলিপি রাখিবেন।

২০। আগন্তুকেরা বাহিরের ঘরে বসিয়া যাঁহার সহিত আবশ্যক কথাবার্ত্তাদি কহিবেন।

* এই শেষোক্ত নিয়মগুলি আলমবাজার মঠে নবাগত ব্রহ্মচারিগণের জন্য প্রথম রচিত হয়। পূর্ব্বোক্ত সাধারণ নিয়মগুলি পরে রচিত হয়। মঠ তখন নীলাম্বর বাবুর বাগানে।

তথ্যসূত্র

(১) রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়, মিথমুক্ত বিবেকানন্দ

(২) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্য্যালয়

(৩) অজিত কুমার ঘোষ, প্রধান সম্পাদক, রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী

(৪) স্বামী গম্ভীরানন্দ, উপনিষদ গ্রন্থাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়

(৫) অশ্বিনী কুমার দত্ত, ভক্তিযোগ

(৬) জগদীশচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক-শ্রীমদ্ভগবৎগীতা,

(৭) মাওলানা মোবারক করীম জওহর-কুরআন শরীফ

(৮) যজুর্বেদ, হরফ প্রকাশনী

(৯) অথর্ববেদ, হরফ প্রকাশনী

(১০) দবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, অলকানন্দা প্রকাশনী

(১১) হরিহরানন্দ আরণ্য-*পাতঞ্জল যোগদর্শন*

(১২) দিলীপ কুমার বিশ্বাস-*রামমোহন সমীক্ষা*

(১৩) স্বপন বসু-*বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*

(১৪) প্রসাদ সেন- *ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ*

(১৫) ঝরা বসু- *কেশবচন্দ্র সেন ও তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ*

(১৬) অজিত কুমার চক্রবর্তী-*মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,*

(১৭) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,-*প্রবন্ধ সমগ্র*

(১৮) —*বিষবৃক্ষ*

(১৯) রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়- *রবীন্দ্রচেতনায় হিন্দুমুসলমান*

(২০) —*জ্যোতির্ময় রবি ও একখণ্ড কালো মেঘ*

(২১) —*মহর্ষি হরিনাথ মজুমদার, উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ*

(২২) —সত্যের আলোকে যত মত তত পথ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ মিশন

(২৩) কোরক সাহিত্য পত্রিকা- শারদ ১৪১৬: ১৭৫ জন্মবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ
(২৪) প্রমথনাথ বসু- স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ
(২৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনী কান্ত দাস-সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
(২৬) শ্রীম-শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
(২৭) স্বামী সারদানন্দ-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত
(২৮) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -রাজা রামমোহন রায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা
(২৯) Abdul Hamid Siddiqi-AL JAMI US SAHI
(৩০) James H Charlsworth, *The Bible and the Dead Sea Scrolls,* Baylor University Press, Waco, Texus.
(৩১) Joseph A Fitzmyer, *The Dead Sea Scrolls and Christian Origin*, Willium Eerdmans Publishing House, Grand Rapids, Michigan.
(৩২) Jacob Neusner, *Judaism and Christianity in the Age of Constantine*, Unniversity of Chicago Press.
(৩৩) Bart D Ehrman, *Jesus Interrupted,* Herper Collins e-Book.
(৩৪) Helen Ellerby, *The Dark Side of Christian History,*
(৩৫) A H M Jones, *Constantine and the Conversion of Europe,* Hodder & Stoughton Ltd
(৩৬) Sigmund Freud, *Moses and Monotheism*
(৩৭) Jadunath Sarkar, *India through Ages*
(৩৮) *The Bible*, King James Edition, Internet download,
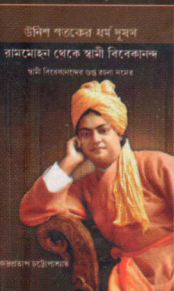
TUHINA PRAKASHANI
12C Bankim Chatterjee Street
Kolkata - 700 073
Ph. 033 2360 4306, 98305 32858
ISBN : 978-81-929236-0-4